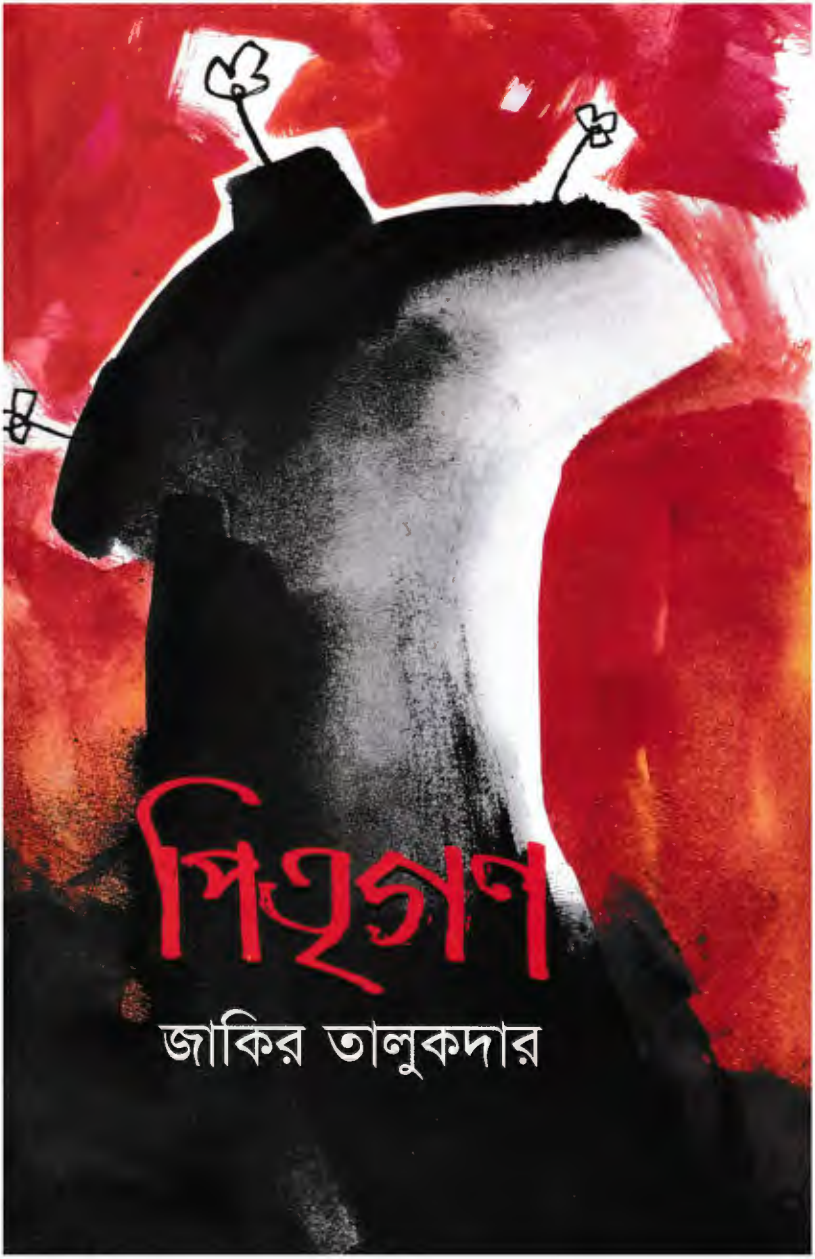
পিতৃগণ
জাকির তালুকদার

পিতৃগণ

জাকির তালুকদার

রোদেলা প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃগণ
জাকির তালুকদার

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
একুশে বইমেলা-২০১৭
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১১

রোদেলা ১৭৫

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
শিবু কুমার শীল

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
সিফাত কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

Pitrigono By Zakir Talukder
First Published Ekushe Baimela 2011
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 350.00 Only US $ 05.00
ISBN: 978-984-8975-04-6 Code: 175

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সত্যেন সেন
রণেশ দাশগুপ্ত
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
আহমদ ছফা
এবং
হাজার বছর ধরে চলমান
বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সকল শহীদের নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিতৃগণ' উপন্যাসের সন্ধানে

পাঁচবিবির বিনয় সরকার কিছুতেই নিজেদের আদিবাসী কোনো কৌম বা ট্রাইব বলে মানতে রাজি নন। তাঁর পরিষ্কার কথা। তাঁরা আদি বাঙালি এবং হিন্দু। ব্রহ্মার পা থেকে সৃষ্ট অর্থাৎ শূদ্র হলেও হিন্দু। একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল রানীনগরের সুজিত-মানিক-বিশ্বেশ্বর, এবং গুরুদাসপুরের বিরাম, জগুদাসের সাথে কথা বলেও। বিনয় সরকারের কথা– আমরা কৈবর্ত। তবে সাঁওতাল-ওঁরাও-মুশহর-মালপাহাড়িদের মতো আদিবাসী নই; বাঙালি। বিএ পাশ বিনয় সরকার এখন মাস্টারি করেন। বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের মাস্টাররা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বড়জোর খবরের কাগজটা পড়েন। বিনয় সরকারের পাঠ তাদের চাইতে একটু বেশি। হয়তো এই প্রশ্নের মুখোমুখি আগেও তাঁদের হতে হয়েছে বলে, কিংবা সত্যিসত্যিই বিনয় সরকারের একটু গভীর পাঠের অভ্যেস আছে বলে তিনি নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস– আদিপর্ব'কে সাক্ষী মানলেন। তাঁর মতে কৈবর্তরা হচ্ছেন হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বাঙালি অংশই। যদিও নমঃশূদ্র। বল্লাল সেনের বর্ণবিন্যাসে তাঁদের 'মাহিষ্য কৈবর্ত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁদের 'জলচল শূদ্র' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জলচল শূদ্ররা আবার শূদ্রদের মধ্যে কিছুটা উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হয়ে থাকেন। অতএব সেই মর্যাদা ছেড়ে নিজেদের কিছুতেই ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নিতে রাজি নন বিনয় সরকার এবং কৈবর্তদের আরও অনেকেই।

যেহেতু সাক্ষী মানা হয়েছে নীহাররঞ্জন রায়কে। তাই বহুবার পড়া থাকলেও আবার খুলে বসতে হয় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস– আদিপর্ব'। দেখা যাচ্ছে বিনয় সরকারের বক্তব্য ঠিক, আবার ঠিক নয়ও। তাঁদের জলচল শূদ্রে উন্নীত হওয়ার ঘটনাটিই আগে বলা যাক। 'বল্লাল-চরিত' নামে দুইখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটির লেখক আনন্দভট্ট। নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বইটি লিখেছিলেন। রচনাকাল ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ। এর অনেক আগে, গোপালভট্ট নামে বল্লাল সেনের একজন শিক্ষক ১৩০০ শকাব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বল্লাল-চরিত' লিখেছিলেন। তবে তিনি নাকি গ্রন্থের শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন। বল্লাল সেনের ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে এমন ভয়ে তিনি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেননি। গোপালভট্টের বইতে বল্লাল সেন কর্তৃক বণিকদের উপর অত্যাচার, সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করা, কৈবর্ত ও আরও কয়েকটি শূদ্র শ্রেণীকে উপরের দিকে জায়গা দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কাহিনীগুলিকে খুব সংক্ষেপে বললে এমন দাঁড়ায়–

বল্লাল সেনের রাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন খুব ধনী ব্যবসায়ী বা বণিক ছিলেন। উদন্তপুরী রাজার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে বল্লাল সেনের রাজকোষ প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা বল্লাল সেনকে তখন বাধ্য হয়ে বণিক বল্লভানন্দের কাছ থেকে এক কোটি নিষ্ক (সুবর্ণমুদ্রা) ঋণ করতে হয়েছিল। বার বার যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছিলেন, আর বল্লাল সেনের জেদ বেড়ে চলছিল। ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে তিনি শেষবারের মতো যুদ্ধযাত্রায় বের হতে চাইছিলেন। সেই জন্য বল্লভানন্দের কাছ থেকে রাজা আরও দেড় কোটি সুবর্ণমুদ্রা ধার চাইলেন। বল্লভানন্দ ধার দিতে রাজি, কিন্তু বিনিময়ে তিনি দাবি করলেন 'হরিকেলি' প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন, বল্লভানন্দসহ আরও অনেক বণিকের কাছ থেকে জোর করে অনেক মুদ্রা কেড়ে তো নিলেনই, সেই সঙ্গে তাদের ওপর শুরু হলো রাজকীয় নানা অত্যাচার। এর মধ্যে আবার রাজবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে বণিকরা সৎশূদ্রদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খেতে অস্বীকার করেন। এই সময়েই বল্লাল সেনের গুপ্তচররা খবর নিয়ে এল যে বল্লভানন্দ পার্শ্ববর্তী মগধের পালরাজার সঙ্গে মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। ঘটনাক্রমে মগধের রাজা আবার বল্লভানন্দের জামাতা। এসব ঘটনা-রটনায় অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন সুবর্ণবণিকদের নামিয়ে দিলেন শূদ্রের স্তরে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও হুঁশিয়ার করলেন এই বলে যে সুবর্ণবণিকদের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলে, তাদের কাছ থেকে দান-দক্ষিণা গ্রহণ করলে, কিংবা তাদের শিক্ষাদান করলে সেই ব্রাহ্মণকেও 'পতিত' করা হবে। বণিকরা তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বেতন দিয়ে নগরের সমস্ত ভৃত্যদের নিজেরা নিয়োগ করে রাখলেন। অন্যত্র কাজের লোক হিসাবে সৎশূদ্রদের পাওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা বিপদে পড়ে গেলেন। বল্লাল সেন তখন বাধ্য হয়ে কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকারদের সৎশূদ্রত্বে উন্নীত করে দিলেন। কৈবর্তদের নেতা মহেশকে দিলেন মহামাণ্ডলিক পদ। সুবর্ণবণিকদের পৈতা পরা একেবারে নিষিদ্ধ হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈবর্তদের সৎশূদ্রে বা জলচল শূদ্রে উন্নীত হওয়ার এই কাহিনীকে ইতিহাসবিদরা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেন।

তবে এর ফলে কিন্তু কৈবর্তদের আলাদা ট্রাইবাল বা কৌম-পরিচয় মিথ্যা হয়ে যায় না। বরং নীহাররঞ্জন রায় কৈবর্তদের উত্তরবঙ্গের একটি আদিবাসী ট্রাইব বলেই প্রমাণ পেয়েছেন এবং বার বার তাদের কৌম বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাঙালির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া গেছে পাল আমলে। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল কৈবর্তদের আবাসস্থল। পালসম্রাট দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও হত্যা করে কৈবর্ত-নেতা দিব্যোক বরেন্দ্রীকে স্বাধীন করেছিলেন। দিব্যোকের মৃত্যুর পর তার ভাই রুদোক, এবং রুদোকের পরে তার ছেলে ভীম একাদিক্রমে সাঁইত্রিশ বছর বরেন্দ্রীকে পাল সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সত্য ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বরেন্দ্রভূমি তথা উত্তরাঞ্চলে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব, আধিপত্য, জনবল এবং পরাক্রম ছিল যথেষ্ট। তবে বৈদিক সূত্রগুলিতে কৈবর্তদের বরাবরই আদিম অসভ্য ট্রাইব হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হয়েছে অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, নিষাদ পিতা ও আয়োগব মাতা থেকে জাত সন্তান হচ্ছে মার্গব বা দাস। এদেরই অন্য নাম কৈবর্ত। এদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য পরিষ্কারভাবেই বলছে যে কৈবর্তরা কোনো আর্যপূর্ব কৌম বা গোষ্ঠী ছিলেন। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। 'অমরকোষে'ও দাস ও জেলেদের বলা হচ্ছে কৈবর্ত। বাংলার আদি বাসিন্দা, যাদের এককথায় নিষাদজাতি বলা হয়, সেই কোল, ভিল, শবর, পুলিন্দা, কোচ, পোদদের পাশাপাশি কৈবর্তরাও একটি কৌম, যারা নিজেরা ছিলেন এদেশের ভূমিপুত্র, এবং তারাই পৃথিবীর ইতিহাসে একটিমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন, যে রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব ছিল কৃষকের হাতে, শ্রমজীবীদের হাতে।

০২.

২০০৩ সালের নভেম্বরে শেষ হলো উপন্যাস 'হাঁটতে থাকা মানুষের গান' লেখার কাজ। এবার শুরু হলো আমার হাঁটা। এক হাজার বছর আগের প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির মানচিত্র ধরে ধরে আমি হাঁটতে থাকি। মাসের পর মাস। কিছুদিন পর পর বিরতি দিয়ে এটি হয়ে গেল বছরের পর বছর ধরে হাঁটার ঘটনা। মানচিত্র খুঁজতে হয় ১৬৬০ সালে ফন ডেন ব্রোক-এর করা বাংলার ভূমি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদ-নদীর নকশায়, ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করে রেনেল সাহেব যে ম্যাপ এঁকেছিলেন সেটিতে, নীহাররঞ্জন রায়ের প্রাচীন বাংলার জনপদ-বিভাগ নামের নকশায়। হাঁটতে হয় কখনো কাউকে সঙ্গে নিয়ে, কখনো একা একা। হাঁটার কারণ ভেতরের এক অদম্য উত্তেজনা। পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র একটাই উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আদি ভূমিপুত্র কৃষক-জেলেরা একটি রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন, এবং ৩৭ বৎসর ধরে সেই রাষ্ট্র নিজেরা পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সময়টি ১০৬৭ থেকে ১১১৪ খ্রিস্টাব্দ। এবং সেই রাষ্ট্র ছিল আমাদের বাংলাদেশে, আমার জন্মএলাকা উত্তরবঙ্গে, আমার নাড়িপোঁতা বরেন্দ্রীতে। আর সেই রাষ্ট্র যাঁরা স্থাপন করেছিলেন, মহান আত্মত্যাগ ও অপরিমেয় বীরত্বের দ্বারা ৩৭ বৎসর ধরে একের পর এক অসম যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, আজকের বাঙালি জাতির তাঁরাই প্রথম প্রজন্ম না হলেও বাঙালিত্বের সূত্রপাতকারী অবশ্যই। আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে ধারণা রয়েছে যে পাল-সম্রাটরা বাঙালি ছিলেন। সেই হিসাব করে বলা হয় যে পালযুগ শেষ হওয়ার পর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত বাঙালির কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। হাজার বছর পরে বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের বাংলাদেশ। সন্দেহ নেই যে পালযুগে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ছিল। বিভিন্ন সমন্বয়-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা নিজস্ব একটি অবয়ব অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছে চর্যাপদের কারণে। বাংলা ভাষার আদিতম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদ যে পালযুগেই লিখিত হয়েছে, এ ব্যাপারে এখন আর পণ্ডিতমহলে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁরা যে বাঙালি ছিলেন, বা বাঙালি জাতির উন্মেষলগ্নের অংশ ছিলেন, এমন দাবি সত্য নয়। সুকুমার সেন দাবি করেছেন যে পালযুগেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল এবং বাঙালি জাতি তার বিশিষ্টতা নিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। হয়তো একথা সঠিক। কিন্তু তাতে পালদের বাঙালি বলা যেমন যায় না, তেমনই যে সব জাতি-কৌম-রক্তধারা মিলে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের তালিকা থেকে কৈবর্তদের বাদ দেওয়া যায় না। বরং আধুনিক নৃতত্ত্ব তো শেষোক্তদের পক্ষেই দাঁড়ায়। তবে আমি বাঙালিত্ব নিয়ে নয়, উদ্বেলিত ছিলাম বহিরাগত আর্যদের পরাজয় ও আমাদের ভূমিপুত্রদের রাষ্ট্রস্থাপন নিয়ে। সেই কারণেই এই অবিরাম অনুসন্ধানী পথচলা।

মানচিত্র ধরে ধরে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল বরেন্দ্রভূমির আরেক নাম খিয়ার অঞ্চল। আরেকটি অপ্রচলিত নাম মধুপুর কাদা। বরেন্দ্র তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনকার কোন কোন অঞ্চলকে বলব? দেখা গেল রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি, তানোর, নাচোল; নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা, ধামুইরহাট, মহাদেবপুর, মান্দা; চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর; নাটোরের সিংড়া, বাগাতিপাড়া থেকে শুরু করে দিনাজপুরের সদর, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর, চিরির বন্দর, বিরল, কাহারোল, খানসামা, পীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, রানীসংকৈল, ঠাকুরগাঁও, আটোয়ারি, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গি; রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, পলাশবাড়ি, তারাগঞ্জ; সৈয়দপুর, নীলফামারি; বগুড়ার গাবতলী, ধুনট, সারিয়াকান্দির সঙ্গে পাবনার তাড়াশ থানার কিছু অঞ্চল, এবং সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার কিছু অঞ্চল নিয়ে আমাদের বরেন্দ্রভূমি। এখনকার হিসাবে সব মিলিয়ে ৩৪,৬৫৪ বর্গ কিলোমিটার। হিউয়েন সাং ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বঙ্গ অঞ্চল ঘুরে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে পুণ্ড্র দেশের আয়তন যা দিয়েছেন, বর্তমানের হিসাব তার কাছাকাছি। বরেন্দ্রভূমির মাটি লাল, পুরোটাই প্রায় সমতলভূমি, কিন্তু বাংলাদেশের অন্য সমভূমি অঞ্চল থেকে কিছুটা উঁচু। ভারতের ছোটনাগপুরের মালভূমি এই বরেন্দ্রভূমিরই বর্ধিতাংশ। বাংলাদেশের বর্তমান ম্যাপের দিকে খেয়াল করলে একটি বিশেষ জিনিস দেখা যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, ময়নামতি-লালমাই অঞ্চল, মধুপুর গড় এবং বরেন্দ্রভূমি একই কৌণিক রেখা দিয়ে সংযুক্ত। বাংলাদেশের অন্য সমভূমি অঞ্চল যে ধরনের পলিমাটি দিয়ে গঠিত, এই অঞ্চল তা নয়। এটি লাল এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি হলেও মরগানের মতে এই লালমাটি অঞ্চলটি অতীতে সংঘটিত ভয়াবহ কোনো ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট। এখন এই বিস্তীর্ণ এলাকা হাঁটতে হবে শুধু এই কারণে নয় যে, এলাকার দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখলে উপন্যাসের ভূগোল-নির্মাণে কাজে লাগবে। এই হাঁটা এই কারণেও যে বরেন্দ্রভূমির যে প্রান্তেই হোক না, যে কোনো লোকের সাথে গল্প-গাছার মাধ্যমে কৈবর্ত-রাজত্ব সম্পর্কে কোনো কিংবদন্তি পাওয়া যায় কি না। মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ না করে উপায় নেই। কারণ লিখিতভাবে আমাদের হাতে যেটুকু উপাদান এসে পৌঁছেছে, তাতে দিব্যোক তথা কৈবর্তদের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। আর যতটুকু লেখা আছে সেটুকুতে বড় নীচু করে আঁকা হয়েছে তাদের চরিত্র ও কৃতিত্ব। নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাঘা বাঘা ইতিহাসবিদরা কৈবর্ত সম্পর্কে যতটুকু লিখেছেন, তার প্রায় সবটুকুই সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিতম' কাব্য থেকে নেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ ও টীকাসহ দুষ্প্রাপ্য 'রামচরিতম' হাতে পেলাম রাজশাহীতে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে তখন গলদঘর্ম বন্ধু গল্পকার নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে। নিজের থিসিসের কাজ ফেলে রেখে জাহাঙ্গীর ভাই বহু ঘুরে ঘুরে 'রামচরিতম' এর একটি ফটোকপি যোগাড় করে দিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে। যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা এই গ্রন্থটির ফটোকপি করে নেবার অনুমতি দান করার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সন্ধ্যাকর নন্দীর ওপর এখান-ওখান থেকে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিলেন অপ্রচলিত ধারার ইতিহাসবিদ সমর পাল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ সন্ধ্যাকর নন্দী কবি হিসাবে উচ্চাঙ্গের ছিলেন বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন। তিনি বাস করতেন পৌণ্ড্রবর্ধনের পার্শ্ববর্তী বৃহদ্বটু গ্রামে। তাঁর পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী, পিতামহ পিনাক নন্দী। পিতামহের সময় থেকেই পাল রাজাদের প্রাসাদে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন নন্দীরা। প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজের সান্ধিবিগ্রহিক। আর সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে ছিলেন পালরাজা রামপালের সভাকবি। রামপাল ছিলেন তাঁর পোষ্টা বা প্রতিপালক। সেই কবি যখন রামপালের শত্রু কৈবর্তদের প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে আনেন, তখন তা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সেটাই ঘটেছে দিব্যোক, রুদোক, ভীম ও সাধারণভাবে কৈবর্তদের ক্ষেত্রে। 'রামচরিতম' একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে রামায়ণের রঘুপতি রামচন্দ্র ও পালরাজা রামপালের কীর্তি-মাহাত্ম একই সাথে তুলে ধরেছেন সন্ধ্যাকর নন্দী। সেখানে রামপাল মহান, অজেয় ও সর্বগুণে গুণান্বিত একজন নৃপতি। অন্যদিকে কৈবর্তনেতা দিব্যোক হচ্ছেন একজন 'কুৎসিত নৃপ'। দিব্যোককে গালি দেওয়া হচ্ছে 'উপধিব্রতিনা' বলে; যার অর্থ খল ও ছলনাময়। কারণ হিসাবে কবি দাবি করছেন যে দিব্যোক রাজা মহীপালকে আপসের কথা বলে ছলনা করে হত্যা করেছিল। নন্দীর বচন– 'মারীচ যেমন রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনই ছলনাময় দিব্যোকের দ্বারা মহীপাল অপহৃত ও নিহত হয়েছিলেন।' সন্ধ্যাকর নন্দী এতেই ক্ষান্ত নন। তিনি দিব্যোককে দস্যু বলছেন, কৈবর্ত-বিদ্রোহকে বলছেন 'অলীক ধর্ম-বিপ্লব', বলছেন 'ভবস্য আপদম'। কৈবর্তদের সবই যদি এত খারাপ, তবে পালসহ চতুঃসীমায় সকল নৃপতি ও সামন্তদের অবিরল আক্রমণ প্রতিহত করে পর পর তিনজন নেতার নেতৃত্বে কৈবর্ত-কৃষক-জেলে-ভূমিপুত্ররা ৩৭ বছর ধরে নিজেদের বরেন্দ্রভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখলেন কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর ভদ্রজনের লেখা ইতিহাসগ্রন্থে থাকার কথা নয়। নেই-ও। থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে পারে লোকশ্রুতিতে, কিংবদন্তিতে, আঞ্চলিক কথা-কাহিনীতে। সেই কারণেই বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের কাছে কাছে যাওয়া। যেমন বাঙালিদের কাছে, তেমনই আদিবাসীদের কাছেও। টুকরো-টাকরা যেসব তথ্য মিলছে, সেগুলিকে একটার সাথে অপরটি জোড়া দিয়ে দিন-রাত চলছে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা। ইতিহাসের অকথিত অধ্যায় নিয়ে কাজ করার অসুবিধা, সে-ও আবার উপন্যাস, হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। কলম চলছে যতটা, থেমে থাকছে তার চেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে হতাশা গ্রাস করছে। মনে হচ্ছে কৈবর্ত-বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস লেখার স্বপ্ন আমার স্বপ্নই থেকে যাবে। শ্রদ্ধেয় সত্যেন সেন 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' নামে বাংলা ১৩৭৬ সালে যে উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন, সেটি, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটি যেমন দুর্বল, তেমনই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে উচ্চবর্গীয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিই। এই উপন্যাসে তিনি কৈবর্তদের স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবকে পাশ কাটিয়ে মহীপালের রাজ্য হারানোকে বলেছেন নিছক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলাফল। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল আমাদের হাজার বছর আগে পূর্বপুরুষরা আমাদের জন্য যে গৌরবের সমাচার রেখে গেছেন, তাকে সঠিকভাবে ও শৈল্পিক একটি উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের জাতির সামনে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা বোধহয় সফল হবে না। তার জন্য অন্য প্রতিকূলতার চাইতে আমার নিজের শক্তির অভাবই বেশি বলে মনে হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল আমি আমার নিজের শক্তির তুলনায় বড় বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি সাহিত্যিক প্রকল্পে হাত দিয়েছি, এমন একটি উপন্যাস লেখার কাজ হাতে নিয়েছি যে উপন্যাস কোনোদিনই আমার সীমিত মেধার পক্ষে লিখে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই মাঝে মাঝে অন্য লেখাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কী এক অমোঘ টানে বার বার ফিরে আসতে হয় বরেন্দ্রীর কাছে, কৈবর্তদের কাছে। যাদের সঙ্গে এই লেখা নিয়ে আলাপ করেছি, যেমন সমর পাল, উৎপল বিশ্বাস, হাসান আজিজুল হক, প্রশান্ত মৃধা, প্রতিনিয়ত উৎসাহ জোগান, দেখা হলেই জিজ্ঞেস করেন উপন্যাসের কাজ কতদূর এগুল। আমি আমতা আমতা করি। সমর পাল নিজে থেকেই আরও তথ্য সংগ্রহ করে দেন। উৎপল বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে দলিত লেখক আন্দোলনের কর্মীদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব তথ্য-সাহায্য এনে দিতে চেষ্টা করেন। সেলিনা হোসেন চর্যাপদের সময়কাল নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। নীল ময়ূরের যৌবন। দ্বারস্থ হই তাঁর। তিনি তথ্য তো দেনই, সেই সাথে পরম স্নেহে হাতে ধরিয়ে দেন তাঁর উপন্যাসের একটি কপিও। ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা থেকে পিতৃপ্রতিম যতীন সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন আসে– কী হে তালুকদার তোমার উপন্যাস কদ্দুর? কবি মাহবুব-উল-করিম লেখায় কোনো তাড়াহুড়ায় বিশ্বাস করেন না। তবে তিনি জানতে চান কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না? শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আকরম হোসেন বরাভয় দেন– উপন্যাসের বিস্তার নিয়ে চিন্তা করো না। তোমার লেখা তুমি লিখে যাও। উপন্যাস যত বড়ই হোক, প্রকাশক খুঁজে দেবার দায়িত্ব আমার। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, এক সময়ের বাম রাজনীতি-কর্মী হুমায়ুন বার বার জিজ্ঞেস করেন উপন্যাসের কাজ কবে শেষ হবে? মামুন হুসাইন খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেন কাজের অগ্রগতি কেমন? সুচন্দন প্রতিনিয়ত তাগাদা পাঠায় কলকাতা থেকে। বন্ধু প্রবালকুমার দাস এবং মকলেসুর রহমান অরুণের নীরব তাড়া উপন্যাসের ব্যাপারে। রফিকুল কাদির রোজই জানতে চায় উপন্যাস কতদূর এগিয়েছে। তখন আর কাজটি আমার একার নেই। ফলে এই কাজ থেকে একা একা পিছিয়ে আসার অধিকারও আমার থাকে না। তখন আবার শুরু হয় লাইব্রেরিগুলিতে ধূলি সরিয়ে সরিয়ে পুরনো বই-পুঁথি ঘাঁটতে থাকা। যেখানে যা পাওয়া যায়, বাংলা ও ইংরেজিতে, সেগুলি কখনো কিনে নেওয়া, কখনো ধার নেওয়া, কখনো ফটোকপি করে নেওয়া। আবার শুরু হয় আমার বরেন্দ্রীর পথে-প্রান্তরে হাঁটা।

০৩.

আর্যরা ভারতবর্ষে এলেও বাংলা অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে পারেনি সহজে। কয়েক শত বৎসর ধরে বারংবার আগ্রাসন চালিয়েও বাংলাকে দখলে নিতে পারেনি তারা। তখন ভারতবর্ষের যে অংশে তাদের দখল পোক্ত হয়েছিল সেই অংশকে আর্যাবর্ত নাম দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হলো তারা। আর সেই সঙ্গে এই প্রচারণাও চালিয়ে গেল যে ভারতবর্ষের যে যে অঞ্চল এখনো আর্যদের দখলে আসেনি, সেগুলি পাপভূমি। আর্যাবর্তের যে চৌহদ্দির কথা লিখে গেছেন পতঞ্জলি, সেখানে বঙ্গ বা বাংলার কোনো অংশের নাম নেই। তাঁর ভাষ্যমতে– 'প্রাগ্ আদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাদ্ দক্ষিণেন হিমবন্তম্ উত্তরেণ পরিযাত্রম।' অর্থাৎ আদর্শের পূর্ব, কালকবনের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ, ও পরিযাত্রের উত্তর– এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূমি আর্যাবর্ত। এর মধ্যে হিমালয় তো সবারই চেনা। পারিযাত্র হচ্ছে পশ্চিমের বিন্ধ্যপর্বত, আদর্শ হচ্ছে আরাবল্লী পর্বত, এবং কজঙ্গল ছিল তৎকালীন কালকবন। বোঝাই যাচ্ছে এই সীমা ভারতের কোন কোন অঞ্চলকে নিয়ে। এখানে বঙ্গ বা বাংলার অন্য কোনো অংশের নাম নেই। অর্থাৎ বঙ্গভূমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিপুত্রেরা আর্যদের আগ্রাসন প্রতিহত করে তখন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। আর আর্যরা, তাদের দখলকৃত উত্তর ভারতকেন্দ্রিক এই আর্যাবর্তের বাইরের জনপদ ও মানুষগুলিকে অসুর, যবন, বয়াংসি, অনাস জাতীয় নীচ সম্বোধনে ভূষিত করে নিজেদের মনের ক্ষোভ মেটাতে চেষ্টা করত। বর্তমানের বাংলাদেশ তাদের হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা এই ভূখণ্ডকে পাপভূমি বলে আখ্যায়িত করে গেছে। আর্যদের কেউ কোনো কারণে বাংলা-অঞ্চলে পদার্পণ করলে আর্যাবর্তে ফিরে তাকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 'পুনষ্টোম যজ্ঞ' করতে হতো। সেই বাংলাদেশ তারা দখল করতে সমর্থ হলো কয়েক শত বৎসর পরে। তাদের দখলের উদ্দেশ্য নাকি ছিল এই অসুরদেশে বেদের বাণী প্রচার করা! অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের ভারত, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা দখলের পেছনের দার্শনিক যুক্তি ছিল অসভ্যদের কাছে সভ্যতা ও খ্রিস্টের বাণী বহণ করে নিয়ে যাওয়া। বর্তমান শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান, ইরাক দখলের পেছনের দার্শনিক যুক্তি হচ্ছে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কয়েক হাজার বছর আগেকার লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী আর্যদের সাথে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় আর বিংশ-একবিংশ শতকের মার্কিনীদের মধ্যে কী অসাধারণ মিল! আর বাংলা দখলের সঙ্গে সঙ্গে করতোয়া হয়ে গেল পুণ্যনদী, পুণ্ড্রবর্ধন হয়ে গেল পুণ্যস্থান। যে বরেন্দ্রীর পূর্ব নাম ছিল কট্টলি, তাকে আর্যরা নাম দিল বরেন্দ্র। ইন্দ্রের বরে প্রাপ্ত বলে তার নাম বরেন্দ্র। আর্যদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র দেবতা তাদের দিয়েছেন এই লালমাটির সমতল মালভূমি। আর এই ভূমির আদি মানুষ, সত্যিকারের ভূমিপুত্র, যারা এই মাটিকে বাসযোগ্য করেছেন, চাষযোগ্য করেছেন, এখানে নিজেদের মতো করে সভ্যতা নির্মাণ করেছেন, আদিম কৌম সাম্যবাদী ভাবধারায় জীবনযাপন করেছেন, জাতিগোত্রবর্ণভেদহীন সমাজ নির্মাণ করেছেন, নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নির্মাণ করেছেন, তারা হয়ে গেলেন 'নিজ ভূমে পরবাসী'। নিজেদের ভিটে-মাটি-ভুঁই-মাচার ওপর অধিকার তো তারা হারালেনই, সেই সাথে হারালেন নিজেদের দেহ ও আত্মার ওপর নিজেদের অধিকারও।

কিন্তু পরাজয় মেনে নেওয়া তো ভূমিপুত্রের রক্তে নিষিদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধ কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হলেও গেরিলা যুদ্ধ কখনোই বন্ধ থাকে না। রাতের আঁধারে আক্রান্ত হতে থাকে তথাকথিত দখলদার আর্যদের শক্তিকেন্দ্রগুলি। ব্রাহ্মণদের ছেলেঘুমানো রূপকথার গল্পগুলিতে যে রাক্ষসের ভয় দেখানো হয় শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য, সেই রাক্ষসরা সর্বদা রাতের অন্ধকারেই আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাদের মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান, মাথায় কখনো একটি কখনো দুইটি খাড়া চোখা শিং। এই রাত্রিচর রাক্ষসদের জায়গায় মুখোশধারী গেরিলা যোদ্ধাদের স্থাপন করলে হুবহু মিলে যায়। রূপকথা আর শুধুমাত্র রূপকথা থাকে না, তা হয়ে যায় ইতিহাসের লুপ্ত দরজায় প্রবেশের একটি চাবিকাঠি।

০৪.

চীনের প্রাচীরের মতো ঐতিহাসিক না হলেও কিংবা জগদ্বিখ্যাত না হলেও বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা একটি মাটির প্রাচীর রয়েছে। তার বয়সও হাজার বছরের কম নয়। বগুড়ার শেরপুর থেকে শুরু হয়ে এই প্রাচীর শেষ হয়েছে বর্তমান গাইবান্ধা জেলার একবারে শেষ সীমায় পৌঁছে। দুই পাড়ের যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞস করলে তারা উত্তর দেয় এর নাম ভীমের জাঙ্গাল। রাজা ভীম এই পাঁচিল তুলেছিল। কেন? এ নিয়ে কোনো কিংবদন্তি আছে কি না জানার জন্য জাঙ্গাল ধরে পুরো চল্লিশ মাইল হাঁটতে হয় তিনদিনে। রাতে বিশ্রাম মাটিডালিতে আর আরেক রাতে রাজাবিরাট গ্রামে। অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে রাজাবিরাটে বাঁশের তৈরি সিনেমা হলে নাইট শোতে সিনেমা দেখাও একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বগুড়া শহরের উত্তর দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়া জাঙ্গালের শুরুর বিন্দু ধরি ফুলবাড়িকে। তারপর একের পর এক গ্রাম। কোনো কোনোটি বাঁধের ওপর ছিন্নমূল মানুষের অস্থায়ী বসতি। সেটাই একসময়ে স্থায়ী হয়ে একটা গ্রামের নাম নিয়ে নেবে নিশ্চিত। ফুলবাড়ির পরে বৃন্দাবন পাড়া, মাটিডালি, বাঘোপাড়া, গড়ের পশ্চিম সীমা হয়ে ঘাগর দুয়ার, চাঁদমুয়া, হরিপুর, ধালমণ, শচীয়ানী, শ্যামপুর, শব্দল দীঘি, বসুবিহার, বগলাবাড়ী। নাগর নদী পার হয়ে আলের হাট, ফেনীগ্রাম, শালদহ। গোবিন্দগঞ্জ থানার দামুকদহ বিলের মধ্য দিয়ে রাজাবিরাট এবং ঘোড়াঘাট। মাঝখানে মহাস্থানের কাছে দৌলতপুর থেকে হাজরা দিঘী পর্যন্ত তিন মাইল এলাকায় বাঁধ নেই। এখন ভেঙে গেছে, নাকি তখনই তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করেননি সে সময়ের মানুষরা, এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কল্পনা করতে কোনো বাধা তো নেই। কিন্তু পাড়ের কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কল্পনা নয়, নিশ্চিত সত্য বলেই দাবি করে কথা বলেন। ইয়াকুব আলি জানালেন এখানে তো রাজধানী। এখনকার মহাস্থান মানে সেই সময়ের পুণ্ড্রনগর। সেই রাজধানীতে তো সৈন্য-সামন্ত মজুদই আছে। রাজধানীর মানুষের তাই প্রাচীরের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন পড়েনি। তাই এই তিন মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচিল ওঠেনি। তাহলে এই ভীমের জাঙ্গাল কি প্রতিরক্ষার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল? উইলিয়াম হান্টার এই প্রাচীর দেখে এটিকে তুলনা করেছিলেন ইতালির রিং ফোর্টগুলির সাথে। এই ধরনের রিং ফোর্টে বা দূর্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষরা বিপদের সময় আশ্রয় নিতে পারত। কোন সমরবিদের পরামর্শে কৈবর্তরাজ ভীম এই জাঙ্গাল নির্মাণ করেছিলেন, তার নাম হয়তো কোনোদিনই ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতিহাসে নিজের নাম খোদাই করার প্রবণতা ভূমিপুত্রদের ছিল না। সবসময়ই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৌমের জন্য কাজ করা। তাইতো দেখা গেছে কোনো ভাস্কর্যস্রষ্টার নাম নেই, কোনো চিত্রকরের নাম নেই, অনেক সুভাষিত বচন-রচয়িতার নাম নেই। কৌমের জন্য নিবেদিত যে কর্মকাণ্ড তাতে ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত করে রাখাকে শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, কখনো কখনো অমার্জনীয় ধৃষ্টতা বলেও গণ্য করতেন কেউ কেউ। সেই কারণেই বাঙালির ইতিহাস কোনো রাজা-মহারাজা কিংবা কোনো আলোকসামান্য প্রতিভাবানের ইতিহাস না হয়ে হয়ে উঠেছে পুরো জাতির ইতিহাস। কোনো ব্যক্তি এককভাবে সেখানে নিজের চিহ্ন রেখে যেতে চাইতেন না। বরং তাঁরা মনে করতেন, যে সৃষ্টি তাঁরা রেখে যাচ্ছেন তা যেন নিজের বা পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত না হয়ে সর্বজনীন কৌমের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই চিন্তার ধারা এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত বহমান ছিল আমাদের সমাজে। নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে কোনো পেটেন্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানপ্রতিভা জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার তিনি করেছেন, তাকে কুক্ষিগত করে রাখার কোনো নৈতিক অধিকার তাঁর নিজের যেমন নেই, কোনো গোষ্ঠীরও তেমনই নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে তাঁর আবিষ্কারগুলি। সমসাময়িক বেনিয়া মানসিকতার মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সাথে তুলনা করলেই বাঙালিমানস ও বেনিয়ামানসের পার্থক্য ধরা পড়ে। সেই কারণেই কেউ জানে না, পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর নকশাবিদ কে, জানে না ঐতিহাসিক জগদ্দল বিহার বা বসুবিহার কোন স্থপতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। সেই রকম ভাবেই কেউ জানে না, ভীমের জাঙ্গাল নামক প্রতিরক্ষা-সম্ভাবনা প্রথম কোন সেনাপতি বা চিন্তাবিদের মনন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

লেখাপড়া যারা জানতেন সেই ক্ষমতাবান আর্যরা, বৌদ্ধ পালসম্রাট ও ব্রাহ্মণ অমাত্যবৃন্দ নিজেদের নাম যেখানে পেরেছেন খোদাই করে রেখে গেছেন। যেন সমাজ মানে তারাই। এখনকার রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রের গরীব মানুষের করের টাকায় কিংবা দেশের মানুষের রক্তকে বন্ধক রেখে বিশ্বব্যাংক থেকে ধার করে আনা টাকায় প্রতিষ্ঠান বানিয়ে পাথরের ফলকে নিজের নাম গেঁথে রাখেন, সেই রকম মানসিক ভিখিরিপনা তৎকালীন আর্য রাজা-অমাত্যদেরও পুরোমাত্রায় ছিল। তার উদাহরণ রয়েছে এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তার মধ্য থেকে দুই-একটা দেখে নিতে তো হয়ই।

তখন আমাকে যেতে হয় ধামইরহাটে। ধামইরহাট ভৌগলিকভাবে নওগাঁ জেলার মধ্যে পড়লেও আমার বাড়ি থেকে সেখানে যেতে গেলে কাছে হয় জয়পুরহাটের রাস্তা ধরলে। আমার শহর অর্থাৎ নাটোর থেকে জয়পুরহাট ট্রেনে। ট্রেনভেদে সময় বাড়ে-কমে। কোনো ট্রেনে গেলে দুই ঘণ্টা, কোনো কোনো ট্রেনে সাড়ে তিন ঘণ্টা, কোনোটিতে আবার সময়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই। ইন্টারসিটি বেছে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দুই ঘণ্টাতেই পৌঁছানোর সাব্যস্ত। জয়পুরহাট থেকে নয় কিলোমিটার পশ্চিমে ধামইরহাট উপজেলার মঙ্গলবাড়ি হাট। হাটের দক্ষিণে জাহানপুর মৌজা। এখানে আছে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের তৈরি একটি গরুড়স্তম্ভ। সম্রাটের নয়– মন্ত্রী বা অমাত্যের তৈরি। বোঝা যায় স্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছিল কোনো বড় জলাশয়ের পাড়ে। হয়তো এর পাশ দিয়ে সেই সময় জলপথ ছিল। নদী এখন হাজার বছর পরে তার পথ বাঁকিয়ে নিয়েছে। তাই এখন এটি এক নিচু জলাভূমির মতো জায়গায়। লম্বায় প্রায় ১২ ফুট ধূসর পাথরের স্তম্ভ। এতে যা লেখা আছে শুনলাম, তাতে বোঝা গেল উপরঅলাকে তৈলমর্দন শুধু এখনকার রাজ-কর্মচারিদের নয়, সেকালের রাজকর্মচারিদেরও অবশ্য-পালনীয় কর্ম ছিল। গুরব মিশ্র তার প্রভু মহারাজ নারায়ণ পালের প্রশস্তি উৎকীর্ণ করে রেখেছেন এটিতে, অথচ বানিয়েছেন গরুড়স্তম্ভ। তো গুরব মিশ্র নাহয় তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য, এবং একই সাথে নিজের নামটিও খোদাই করে রাখার জন্য বারো ফুটি পাথরস্তম্ভ বানালেন, কিন্তু সেই শিলালিপির গায়ে যখন ইংরেজিতে জর্জ উডনি এবং ক্রেটনের নাম দেখা যায়, যা পরবর্তীতে লেখানো, তখন ইংরেজ আমলাদের আদেখলেপনারও চিহ্ন বেশরমভাবে প্রকট হয়ে থাকে। পণ্ডিতরা বলেন গরুড়স্তম্ভ, কিন্তু স্থানীয় মানুষরা বলে এর নাম ভীমের পান্টি। আঞ্চলিক ভাষায় পান্টি হচ্ছে এক ধরনের লাঠি। যেমন গরু খেদানোর জন্য হাইল্যা পান্টি। তবে প্রকৃতপক্ষে কৈবর্তরাজ ভীমের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভীমের পান্টি মানে মহাভারতের বীর ভীমের হাতের গদার কথা বোধহয় বোঝানো হয়ে থাকে। বর্তমানে সমর পাল এই স্তম্ভের গায়ে লেখা ২৮ টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করেছেন। তা থেকে জানা যাচ্ছে, পালসম্রাটের প্রশস্তির নামে মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরব মিশ্র মূলত নিজের বাপ-দাদার মহান সব কীর্তির কথা বর্ণনা করে গেছেন এই স্তম্ভে। এই শ্লোকগুলি পড়লে মনে হবে, পালসম্রাটরা শুধুমাত্র সিংহাসনেই বসে থাকতেন, আর তাদের হয়ে যাবতীয় কাজ, বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে বের করা থেকে রাজ্যজয় পর্যন্ত সবই করে দিতেন গুরব মিশ্র ও তার পিতা-পিতামহরা। এমনকি সেকাজে রাজাকে পর্যন্ত সাক্ষী মানা হয়েছে একটি শ্লোকে। কুড়ি নং শ্লোকে বলা হচ্ছে– 'তার (গুরব মিশ্রের) বাগ্মিতার কথা, শাস্ত্রসমূহে জ্ঞানের কথা, নীতিশাস্ত্রে পরম নিষ্ঠার কথা, বেদার্থ মীমাংসায় তার বংশের অসীম সামর্থের কথা, মহতের গুণকীর্তনে অনুরাগের কথা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তার অপরিমেয় খ্যাতির কথা ধর্মাবতার (পালসম্রাট) বলে গেছেন।'

তাহলে কৈবর্তরা কি নিজেদের বিজয়ের বা স্বাধীনতা অর্জনের বা দীর্ঘ সংগ্রামের কোনো চিহ্নই রেখে যাননি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে-ও একটা আছে। আছে একটি দিব্যোক স্তম্ভ। সেটি এখান থেকে আরও প্রায় দুইশো কিলোমিটার দূরে। এখানে আরেকটি যা আছে, তার কথা আগে বলে নেওয়াই ভালো। তা হলো জগদ্দল বিহার। বিহার নাম হলেও আসলে মহাবিহারই। জয়পুরহাট শহর থেকে ধরলে দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। গ্রামের নাম এখনো জগদল। এখান থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার। যা তখন ছিল সোমপুর বিহার। সবগুলিই খাস বরেন্দ্রভূমিতে। জগদ্দল বিহারের বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে রামপাল ভীমকে পরাজিত ও হত্যা করার পরে এই বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আসলে এই বিহার তার চাইতে বেশ আগের। রামপাল হয়তো এর কিছুটা শোভাবৃদ্ধি করেছিলেন। বৌদ্ধবিহার বা মহাবিহার আমাদের ইতিহাসের অন্যতম গর্বের উপাদান। এক-একটি বিহার আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ ধারণ করে রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তথ্য পেয়েছিলেন যে এই জগদ্দল বিহার থেকেই প্রায় দশ হাজার বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রেরিত হয়েছিল। ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল বিহার ধ্বংস হবার পরেও অনেক বছর যাবত জগদ্দল বিহারের অস্তিত্ব ছিল। এই বিহারের বিভিন্ন কক্ষে বসেই বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর, ধর্মাকর প্রভৃতি হীনযান ও মহাযানপন্থি বৌদ্ধ পণ্ডিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সারা পৃথিবী থেকে বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের পাঠ নিতে শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন। কাশ্মীরের ভিক্ষু শাক্য শ্রীভদ্র এখানে এসেছিলেন ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জবানীতে জানা যাচ্ছে তিনি তিন বৎসর এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় প্রচুর ছাত্র ও শিক্ষক এই মহাবিহারচত্বরকে মুখরিত করে রেখেছিলেন। এখানে তন্ত্র, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্রসহ হিন্দু, জৈন ও লোকায়ত বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা, আলোচনা ও গবেষণার কাজ অব্যাহত ছিল। মনে রাখা দরকার সেই সময় বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চায় বৌদ্ধ মতের পণ্ডিতরাই অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো তাঁরা ঘরে বসে বা কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে বসে বিদ্যাচর্চা করতেন না। তাঁরা থাকতেন বিহারে একত্রে। সংঘারাম-বিহারে পণ্ডিতরা একত্রে বসবাস ও বিদ্যাচর্চা করায় সেখানে একটি প্রাতিষ্ঠানিক আবহ বিরাজ করে। সেখানে পরস্পরের সাথে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়। ফলে প্রত্যেকের জ্ঞানভাণ্ডারই বেড়ে যেতে থাকে অনেকটা জ্যামিতিক হারে। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই সুবিধাটি পেয়েছিলেন। তাঁরা সংঘারাম-বিহারে বসে একত্রে বিদ্যাবর্ধন ও বিদ্যাবিতরণ করতেন। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁরা শুধু বৌদ্ধধর্মমত ও দর্শন নিয়েই আলোচনা করতেন না, বরং তাঁদের চর্চার মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণদের বিদ্যাও। সেই সঙ্গে সমকালীন সকল প্রসঙ্গও।

এই বিহারের আরেক আচার্য ছিলেন শুভাকরগুপ্ত। তিনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিরাট ধর্মীয় সংস্কারের জন্য। তা হচ্ছে, তিনিই প্রথম বৌদ্ধের শরণ নেওয়া বা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সহজ পথ ও প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়া বা সংঘে যোগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা ছিল অনেক। অনেক সময়ই সেগুলি সাধারণ মানুষের জন্য পালন করা ছিল কষ্টকর। শুভাকরই প্রথম এইসব আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করলেন মানুষের দীক্ষাগ্রহণের পথকে। তিনি বিধান দিলেন কোনো বৌদ্ধ পুরোহিতের সামনে কেউ ত্রিশরণ গমন করলেই সে বৌদ্ধধর্মে অন্তর্ভুক্ত হবে। ত্রিশরণ মানে শুধুমাত্র তিনবার 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' বলা। এই নিয়ে বিতর্ক অবশ্য দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। এত সহজে কাউকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন অনেক বৌদ্ধধর্মনেতা। বিশেষ করে হীনযানপন্থিরা।

এগুলি সবই আমাদের গৌরবের কথা। আমাদের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যময়তার চিহ্ন। কিন্তু দেশের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো বড় কাজে যেমন সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকে, তেমনই এইসব বিহার, মহাবিহার, সংঘারাম, ধর্মমন্দির, মঠ, দেবকুল– সবকিছুর জন্য মূল্য চুকাতে হয়েছিল সাধারণ মানুষদেরই। বরেন্দ্রভূমির প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নিজেদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে কৈবর্তদেরই। অথচ ঐসব মন্দির-বিহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোটির সাথেই তাদের কোনো সংস্রব ছিল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেমন করে এইসব মহান প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছিল কৈবর্তদের গলার ফাঁস?

কারণ ঐসব বিহার-মঠ-মন্দিরের সকল ব্যয়ভার পরোক্ষভাবে পড়ত কৈবর্তদের কাঁধেই।

জগদ্দল বিহারের কথাই ধরা যাক। সুকুমার সেন এই বিহারের বিভিন্ন শিক্ষক-ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজ ও ভাতার একটি তালিকা তুলে দিয়েছিলেন তাঁর 'বঙ্গ ভূমিকা' গ্রন্থে। সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে বিহারের সাংবৎসরিক ব্যয়ের একটি হিসাবও। সেখানে দেখা যাচ্ছে মঠে বা বিহারে অধ্যাপক ছাড়াও নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র থাকতেন। আর থাকত একজন গণক, একজন কায়স্থ (হিসাবরক্ষক), চারজন মালাকার, দুইজন তৈলিক, দুইজন কুম্ভকার, পাঁচজন কাহলিক (কাহল বা ঢোলবাদক), দুইজন শঙ্খবাদক, দুইজন ঢক্কাবাদক, চারজন দ্রাগড়িক (দ্রগড়– সময়জ্ঞাপক ঘণ্টা), কর্মকর ও চর্মকার মিলে বাইশজন, একজন নট, দুইজন সূত্রধর, দুইজন স্থপতি, দুইজন কর্মকার, আটজন বেট্টিক (মজুর বা বেগারদার), সেই সঙ্গে আরও কিছু কর্মচারি।

বিহারের অধ্যাপকরা প্রত্যেকে বৃত্তি হিসাবে পেতেন দশ দ্রোণ দশ পাটক জমির আয়। তখনকার জমি মাপের একক ছিল দ্রোণ বা দ্রোণবাপ, কুল্যবাপ, পাটক, নল ইত্যাদি। ১ কুল্যবাপ= ৮ দ্রোনবাপ; ৪০ দ্রোণবাপ= ১ পাটক। প্রত্যেক ছাত্রকে দেওয়া হতো ১ পাটক করে জমির আয়। এই অর্থ তারা ব্যয় করতেন 'উদরভরণ' অর্থাৎ খাদ্যের জন্য বা 'পালিফুট্টাকার্থং' (পালি অর্থ গুরুগৃহে বাসকালে ছাত্রের ভাতা ও ফুট্টা অর্থ ফোটানো বা রন্ধন) এর জন্য। অতিথিদের জন্য বরাদ্দ ছিল পাঁচ পাটক ভূমির আয়। ভাণ্ডারি ব্রাহ্মণের জন্য এক পাটক, গণকের জন্য এক পাটক, কায়স্থের জন্য আড়াই পাটক, মালাকার তৈলিক কুম্ভকার কাহলিক শঙ্খবাদক ঢক্কাবাদক দ্রাগড়িক কর্মকর চর্মকার প্রত্যেকের জন্য অর্ধ পাটক, সূত্রধর স্থপতি কর্মকার প্রত্যেকের জন্য দুই পাটক, প্রত্যেক বেট্টিকের জন্য পৌণে এক পাটক ভূমির আয় বরাদ্দ ছিল। এছাড়া বিহারের বার্ষিক 'নবকর্ম' অর্থাৎ নতুন নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল সাতচল্লিশ পাটক জমির আয়, এবং চালার ভাঙা ফুটো সারানোর জন্য বরাদ্দ ছিল দশ পাটক ভূমির আয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে এই বিপুল পরিমাণ চাষের জমির আয় যদি কৃষকদের হাতে না পৌঁছে চলে যায় বিহারের হাতে, তার জন্য কৈবর্ত চাষীদের দৈনন্দিন জীবনে কত মূল্যই না দিতে হয়েছে। সচরাচর এভাবেই অধ্যাপক-ছাত্র-কর্মচারিদের মধ্যে জমির আয় ভাগ করে দিতেন বিহারের পরিচালকমণ্ডলী। রাজা বা সম্রাটের পক্ষে এত খুঁটি-নাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিস দেখা তো সম্ভব নয়। তারা থোক আকারে বিহারের নামে পাঁচটি বা দশটি গ্রাম দান করে দিতেন। মূল অসুবিধা ছিল এখানেই। কারণ কৃষক যখন রাজার অধীনে, তখন তাকে বার্ষিক খাজনা হিসাবে ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজকোষে জমা দিলেই চলত। বাকি সবকিছু, যেমন, নদী-বন-প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ছিল করমুক্ত, সাধারণের সম্পত্তি। কিন্তু গ্রামগুলি বিহারের আচার্য বা পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করার সাথে সাথে সেইসব গ্রামের প্রজারাও হয়ে যেত দ্বৈত শাসনের অধীন। রাজার কর ছাড়াও তখন নানা উপলক্ষ্যে তাদের উপর বসানো হতো বিভিন্ন ধরনের কর। যে সব জিনিস ব্যবহারের জন্য কোনোদিন কর প্রদানের কথা ভাবেইনি গ্রামের মানুষ, সেসবের জন্যও বসে যেত কর। যেমন জঙ্গলে শিকারে ঢুকলে বন-কর, নদীতে মাছ ধরতে নামলে জল-কর ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে নানা নামে নানরকম করের বোঝা চাপানো হতো কৈবর্তদের কাঁধে। যেখানে বৌদ্ধ পুরোহিত সমাজে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক থাকতেন, সেখানে 'জীবহত্যা মহাপাপ' বলে কৈবর্তদের মাছধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করা হতো। এসব থেকেই বোঝা যায়, কৈবর্ত বিদ্রোহের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ নেহায়েৎ কম ছিল না। জাতীয়তাবাদী চেতনা তো এই সেদিন ইউরোপ থেকে আমদানি হলো ভারতবর্ষে। নিজেদের কৌমপ্রীতি থাকলেও আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনা নিশ্চয়ই ছিল না কৈবর্তদের মধ্যে। তারা বিদেশী আর্যদের বিরুদ্ধে প্রথমে লড়াই করেছে নিজেদের ভূমির জন্য, নিজেদের নিয়ম-কানুন বা কৌমরীতিগুলিকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য। যখন অধিকতর উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী আর্যদের কাছে পরাজিত হয়েছে, তখন অন্যান্য কৌমের মতো কৈবর্তরাও রাজাকে প্রদেয় করের দাবি মেনে নিয়ে নিজেদের মতো জীবন যাপন করতে চেয়েছে। কিন্তু বার বার যখন আঘাত এসেছে অর্থনৈতিকভাবে-সামজিকভাবে-ধর্মীয়ভাবে, তখন আর বিদ্রোহে না নেমে উপায় থাকেনি তাদের। সেই সঙ্গে বিদ্রোহের জন্য যোগ্য নেতা পাওয়ার অপেক্ষা তো ছিলই। দিব্যোকের মধ্যেই কৈবর্তরা প্রথম খুঁজে পেয়েছিল যোগ্য নেতার প্রতিকৃতি। তাই দিব্যোকই পৃথিবীর প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র স্বাধীন কৃষক-রাষ্ট্রের জনক।

০৫.

এক হাজার আগের মানুষদের নিয়ে উপন্যাস লেখার পরবর্তী ধাপে যে চিন্তা আসে তা হলো কেমন ছিল সেই সময়ের জীবনযাপন? মানুষ যখন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় বছরের পর বছর বসবাস করে, তখন তারা নিজেদের মতো করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে নেয়, যে ভূগোলে বাস করে সেই ভূগোলের সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো খাদ্যাভ্যাস-বস্ত্রাবরণাভ্যাস-বাসগৃহ নির্মাণ-শিক্ষালয় পত্তন-বিনোদনকেন্দ্র সবকিছুই গড়ে নেয়। নিশ্চয়ই হাজার বছর আগেও কৈবর্তদের নিজস্ব সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পরিচ্ছদ, শিক্ষা, বিনোদন, বাসগৃহানর্মাণসহ জীবনযাপনের সকল উপাদান ও বিন্যাস ছিল। কী ছিল সেই সব বিন্যাসের ভিত্তি, কেমনভাবে জীবনযাপন করত আমাদের সেই পূর্বপুরুষরা, কেমনভাবে গৃহনির্মাণ করত, কেমনভাবে নিজেদের লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি নিজেদের সাজাত পরিচ্ছদে-প্রসাধনে-অলংকারে, কেমনভাবে বিনোদনের উপায় খুঁজে নিত, কেমনভাবে শিক্ষিত করে তুলত নিজেদের উত্তরপুরুষদের– এই সব প্রশ্নের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজে না পেলে উপন্যাসের একটি অক্ষরও তো লেখা সম্ভব নয়। তখন আবার খুঁজতে হয়, পড়তে হয়, হাঁটতে হয়। জানা গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একসময়ের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক শাহানারা হোসেন গবেষণা করেছিলেন পাল আমলের বরেন্দ্রভূমির মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি নিয়ে। ইংরেজিতে লেখা সেই বিশাল গবেষণাপত্রটি পাওয়া গেল বিভিন্ন বন্ধুর সাহায্যে। অগ্রজ কথাসাহিত্যিক হরিপদ দত্ত কিছু বাংলা লেখাও যোগাড় করে দিলেন। সেই সঙ্গে রয়েছেন সর্ববিপদের সমাধান নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস– আদিপর্ব' নিয়ে। আছেন দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কুমার শরৎকুমার রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রী হরগোপাল দাশকুণ্ডু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শম্ভুনাথ কুণ্ডু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, আবদুল মমিন চৌধুরী তাঁদের অমূল্য রচনাবলী ও গবেষণাসম্ভার নিয়ে; আছে মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ, হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণকাহিনী, ই সিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত, অন্যান্য বিদেশীদের প্রাচীন বাংলা ভ্রমণের বৃত্তান্ত, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনচরিত। আর সর্বোপরি রয়েছে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' এবং কাহ্নপা-লুইপা-সরহপাদের 'চর্যাপদ'। আর সেই সঙ্গে আছে কৈবর্ত-বিদ্রোহের সমসাময়িক আদিবাসী যেমন কোচ, রাজবংশী, শবরদের বিষয়ক লেখাজোখা। পাশাপাশি সমকালীন বরেন্দ্র-গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধনের সকল প্রচলিত কিংবদন্তি ও কাহিনী।

সেসব থেকে জানা গেল, পাল আমলে বরেন্দ্রীর গ্রামবাসী ও শহরবাসীর জীবনাচারের মধ্যে ফারাক এখনকার মতো তখনো যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আবার ফারাক ছিল ধনী-দরিদ্রের মধ্যেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছে-ভাতে এখনকার বাঙালিই শুধু নয়, বাঙালির পূর্বপুরুষরাও ছিল মৎস্যাহারী। এমনকি এখানে বসবাস করতে এসেছিল যে ব্রাহ্মণরা, তারাও মাছ খাওয়া শিখে নিয়েছিল অচিরেই। সর্বানন্দের টীকাভাষ্য থেকে বার বার পাওয়া যাচ্ছে উৎকৃষ্ট মৎস্য হিসাবে ইলিশের নাম। আর সাধারণ 'বঙ্গালবাসীরা' যে সোরা মাছ ও শুটকি মাছ খুব আনন্দের সঙ্গে খেত, তারও উল্লেখ করা হচ্ছে। যেহেতু প্রধান খাদ্য ভাত, তাই প্রধান কৃষিপণ্য ছিল ধান। যবের চাষ হতো। যব খাওয়া হতো মণ্ড করে। সাত রকম ব্রীহির মধ্যে যব, দেধান, শামাধান, কঙ্গুর সঙ্গে গোধূমের উল্লেখ আছে। কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহারের মাটি খুঁড়ে গম পাওয়া গেছে, সুতরাং গম অপরিচিত ছিল না, তবে এখনকার মতোই অপ্রধান খাদ্য হিসাবেই বিবেচিত হতো। কলাইয়ের মধ্যে খাওয়া হতো মুগ, মাষকলাই ও মশুর। সর্ষে ঘানিতে পিষে তেল তৈরি করা হতো। তরকারির মধ্যে প্রচলিত ছিল অলাবু (লাউ), কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া), করবেল (করলা), ইচ্ছড় (এঁচড়), বাতিঙ্গন (বেগুন), পটল, কর্করী (কাঁকুড়), মূলক (মূলা), তিন্তি লি (তেঁতুল) ও কব্বক (কোঁড়)। সমুদ্রের লোনা পানি শুকিয়ে লবণ তৈরি হতো। সেই লবণের নাম ছিল কড়কচ্চ। ভুট্টা পুড়িয়ে খেত মানুষ। তার নাম ছিল ভাদুস। পেঁয়াজ, রসুন, সলুপ, ধনেপাতার বর্ণনা রয়েছে অনেক জায়গায়। শহর ও গ্রামে যে জিনিসপত্রের দামে এখনকার মতো তখনো যথেষ্ট তারতম্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শ্লোকে। শহুরে মেয়েকে বিয়ে করে গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য বউকে এই বলে গ্রামবাসের সুবিধার কথা বোঝাচ্ছে স্বামী– 'কচি সর্ষেশাক, নতুন চালের ভাত, প্রচুর হড়হড়ে দই। সুন্দরী, গাঁয়ের মানুষ অল্প খরচে ভালো খায়।' আরেক শ্লোকে বলা হচ্ছে– 'ওগরা ভাত (ফেনা ভাত), কলার পাত, গাওয়া ঘি, দুধের সংযোগে, ময়না মাছ, নালতা শাক পরিবেশন করে প্রেয়সী, আর খায় পুণ্যবান।'

অন্যদিকে বড়লোকদের খাদ্য তালিকায় এসবের পাশাপাশি যোগ হতো নানান মিষ্টান্ন। সেগুলি বড়লোকের খাদ্য বলেই বোধহয় সবগুলির নামই ছিল সংস্কৃত ভাষায়। রাবড়িকে বলা হতো 'খিরিস', চিনি-দই-ঘি মিশিয়ে তৈরি হতো 'রসালা', দুধের সঙ্গে দই মিশিয়ে তৈরি হতো 'দধিকূর্চিকা'। ঘন ক্ষীরকে বলা হতো 'কূর্চিকা'। সেই ক্ষীরকে ঘোলের সঙ্গে মেশালে তার নাম হয়ে যেত 'তক্রকূর্চিকা'।

খাওয়ার পরে পরা। পোশাকের ব্যাপারে সাদাসিধে ধরন আমাদের সমাজে সর্বকালেই প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষ কিংবা ধনী মানুষরা পরতেন ধুতি। উর্ধ্বাঙ্গ সচরাচর থাকত অনাবৃত। তবে শীতে চাদর এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ উপলক্ষ্যে উত্তরীয় পরার প্রচলন ছিল। আদিবাসী কৌমের মানুষজন খুব বেশি হলে পরত খাটো ধুতি। বেশিরভাগই ল্যাঙোট। যা মৌখিক ভাষাতে– কপনি। মেয়েরা পরত দুই টুকরো কাপড়। একটা সায়ার মতো, আর বক্ষবন্ধনী হিসাবে আরেকটি কাপড়ের টুকরা। সাধারণ গৃহস্থ ও নাগরিক পরিবারের মেয়েরা সম্ভবত শাড়িই পরত। মেয়েদের ঘোমটার প্রচলন তখনো ছিল। সেকালের কবি লক্ষ্মীধরের লেখা একটি কবিতা পাওয়া গেছে। সেখানে ভদ্র নারীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়– 'এই যে ঘোমটা দেওয়া মাথা স্বাভাবিক লজ্জায় আনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের আঙুলে নিবদ্ধ, কথা অল্পস্বল্প ধীর মধুরভাষে– এতেই যেন মেয়েটি উচ্চরবে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছে।'

এইভাবে ধাপে ধাপে খুঁজতে হয় মানুষের জীবনচর্যার প্রতিটি অনুষঙ্গকে। জানা যায় এক সময় বাংলায় গ্রাম ও নগর বলে আলাদা কিছু ছিল না। সবই জনপদ। যে জনপদের চারপাশে পরিখা বা প্রাচীর-পাকার, সেটি এক সময় হয়ে উঠল নগর। হাজার বছর আগের বরেন্দ্রী-গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধনের নগরগুলির নাম খুঁজে বের করতে হয়। একেক ইতিহাসবিদ আলাদা আলাদা নাম লিখেছেন। কারো সংগ্রহে বেশি নাম, কারো সংগ্রহে কম নাম। সবগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জড়ো করতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয় প্রাচীন বাংলার জনপদের মানচিত্রের সাথে। সেই ম্যাপও নীহাররঞ্জন রায়ের সৌজন্যেই পাওয়া।

মানুষ যেখানে বাস করে, সেখানেই চাষ করে, সেখানে ফুল ফোটায়, সমাজ-পরিচালনার নিয়ম-নীতি তৈরি করে নেয়– লিখিত বা অলিখিত। তাই মানুষকে তুলে আনতে হলে তার পরিপ্রেক্ষিতসমেত আনতে হবে। পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিলে নিরবলম্ব মানুষের কোনো পরিচয় থাকে না। সে তখন হয়ে যায় কেবলমাত্র প্রাণীকুলের একজন। তাই খোঁজ চলে নগর-গ্রাম-রাজধানীর, বের করতে হয় সেকালের শাসনপদ্ধতির খোঁজখবর, শ্রেণীভেদ-বর্ণভেদ, শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি, প্রচলিত মুদ্রার নাম, জিনিস-পত্রের দরদাম, জমি মাপার পদ্ধতি, চাষাবাদের পদ্ধতি, বিবাহ ও অন্যান্য পারিবারিক সম্পর্কের আচার-অনুষ্ঠান, বাণিজ্যযাত্রা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসভবন ও গৃহস্থালি, নিজেকে সাজানোর অলংকার, সাজের পদ্ধতি, যানবাহন, বিনোদন, ধর্মভাবনা-ঈশ্বরভাবনা, কবিতা, গান, চিত্রকলা– এককথায় মানুষের জীবনসংশ্লিষ্ট সবকিছু। অনুসন্ধানী পাঠের পরিমাণ শত শত পৃষ্ঠা ছেড়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠায় পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে চলছে নোট নেওয়া। মাসের পর মাস ধরে। এক দুই তিন করতে করতে চার বছরও পেরিয়ে যায়। পেশাগত সময়টি বাদ দিলে বাকি পুরোটা সময় মনের চোখে শুধু দেখার চেষ্টা করি হাজার বছর আগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরেন্দ্রীকে। পারিবারিক সদস্যরা প্রশ্নের চেহারায় ঠাট্টাও করে– কোনো বিষয়ে পিএইচডি বা ডক্টরেট করছি কি না! ডক্টরেট আমি করিনি। জানি না তার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু আমার এই কাজের সঙ্গে পিএইচডি-র পরিশ্রমের একটা ব্যাপক ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। থিসিস জমা দিলে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে একটি ডিগ্রি নিশ্চিত পাওয়া যায়। কিন্তু আমার সব পরিশ্রমের শেষ ফল যে উপন্যাস, সেটি একটি সার্থক উপন্যাস হবে কি না তার কোনো নিশ্চয়তা আমার নেই। হয়তো দেখা যাবে আমি একটি বাজে তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লিখেছি। মাল-মশলা প্রচুর জোগার করেছি হয়তো, কিন্তু রন্ধন আদৌ পাঠকের পাতে পরিবেশনযোগ্য নয়। এমন উদাহরণ তো রয়েছে ভুরি ভুরি। এই কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, আর আমি নিজের ভেতরে রিখটার স্কেলে অপরিমাপযোগ্য ভূমিকম্পের আলোড়ন টের পাই। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠি। কিন্তু কাজ থেকে পিছিয়ে আসার কথা ভাবতেও পারি না। নিজেকে সান্ত্বনা দেই এই বলে যে পৃথিবীতে কত লেখককেই তো কত ধরনের পণ্ডশ্রমের মধ্য দিয়েই পথ করে নিতে হয়েছে। আমিও নিশ্চয়ই এই একটি উপন্যাসে ব্যর্থ হলে লেখা ছেড়ে দেব না। কিছুদিন হয়তো মুষড়ে থাকব। তারপরে তো ফের আরেকটি লেখাতে ঠিকঠিকই হাত দেব। অযথা হিসাব করার দরকার কী? কিন্তু হিসাব পিছু ছাড়ে না। পারিবারিক একটি সংকটে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। টাকা নেই বলায় চোখা প্রশ্ন আসে, তাহলে এই যে এক উপন্যাসের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে তার চাইতে কি পরিবারের গুরুত্ব কম? পাঁজা করা বইগুলির গায়ের দাম হিসাব করে ফেলেছে পরিবারের সদস্যরা। তিরিশ হাজার টাকার চাইতে বেশি। তার সঙ্গে এতগুলি বছরের শ্রমঘণ্টা, উত্তেজনা, আবেগ, দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তার অনুষঙ্গ হিসাবে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়া, ১৩০০০ বর্গ কিলোমিটার ছুটে বেড়ানোর ব্যয়– সব মিলিয়ে কত হিসাব হয়েছে খরচের খাতায়! পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করি, উপন্যাস লেখা হলে সব পুষিয়ে যাবে। আসলে তো আশ্বস্ত করি নিজেকে। এদেশে কোনো প্রকাশক তো আমাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেবে না। কিন্তু উপন্যাসটি লিখে উঠতে পারলেই হলো। টাকার হিসাব কে করে!

০৬.

আবার লেখার দিকে ফেরা। নিজের মনের চোখে দেখতে পাই কৈবর্তনেতা ভীমকে। নিজের মাটির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একরোখা অশ্বের তেজ নিয়ে লড়ে যাচ্ছে এক কৌমযুবক। এই সেদিনের চে গুয়েভারা যে মন্ত্র বুকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা পৃথিবীতে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন–'মাতৃভূমি, বিজয় অথবা মৃত্যু'–সেই মন্ত্র কি তিনি ভীমের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন? কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রচর্চার অভিজ্ঞতা নেই, নেই কৌটিল্য-স্বভাবের কোনো মন্ত্রণাদাতা, নেই কোনো যুদ্ধ পরিচালনার কূটকৌশলসমৃদ্ধ সেনাধ্যক্ষ তবু ভীম বার বার প্রতিহত করে চলেছেন রামপালের আক্রমণ। এই বরেন্দ্রীর আদিবাসী মানুষের স্বাধীনতা মেনে নিতে রাজি নয় কেউ। তাই রামপালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আঠারো রাজ্যের রাজা, সামন্ত ও মহাসামন্ত। অঙ্গদেশের অধিপতি মথন দেব, মহাপ্রতিহার শিবরাজদেব, কাহ্নুর দেব, সুবর্ণদেব, পীঠির রাজা দেবরক্ষিত, মগধ ও কান্যকুব্জের রাজা ভীমযশা, কোটাটবীর রাজচক্রবর্তী বীরগুণ, উৎকলের রাজা জয়সিংহ, বাগড়ী বা বালবল্লভীর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের লক্ষীশূর, কুজবটীর রাজা হস্তিযুদ্ধবিশারদ শূলপাল, মানভূমের বা তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখর, উচ্ছালের ময়গলসীহ, কজঙ্গলমণ্ডলের রাজা নরসিংহার্জুন, উত্তর রাঢ়বঙ্গের ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসীহ, সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বির রাজা দ্বোরপবর্ধন। ভীমের সাথে তাদের কারো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। তবু তারা ভীমের বিরুদ্ধে একজোট। কারণ ভীম হচ্ছেন এদেশের আদি ভূমিপুত্রদের শৌর্যের প্রতীক। তাকে টিকে থাকতে দেওয়া মানে এই মাটির আসল দাবিদার ও আসল উত্তরাধিকারী ভূমিপুত্রদের অধিকার মেনে নেওয়া। তাহলে তো নিজেদেরকে বহিরাগত বলতে হয়। নিজেদের আগ্রাসনের বৈধতাকে অবৈধ বলে মেনে নিতে হয়। তাই এই সর্বাত্মক আক্রমণ। এই সর্বব্যাপী আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিচল ভীম। প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে চল্লিশ মাইলব্যাপী প্রাচীর। বরেন্দ্রীর সকল কৈবর্তের পাশাপাশি অন্য ভূমিপুত্ররাও স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে। যুদ্ধে ঘোড়া অপরিহার্য। অশ্বারোহী বাহিনী না থাকলে কোনোক্রমেই যুদ্ধজয়ের আশা করা যায় না। কিন্তু অশ্ব ক্রয়ের টাকা কোথায়? পীঠি থেকে এক পর্যায়ে কিছু অশ্ব পাওয়ার আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু পীঠির রাজা নিজেই এখন সসৈন্যে রামপালের সহযোগী। ভীমের ভুঁরু একবারও কাঁপেনি। জঙ্গল থেকে ধরা হলো শত শত বুনো মহিষ। তাদের নিয়ে মহিষারোহী বাহিনী। কিন্তু অসম যুদ্ধ কতদিন চালানো যায়। তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ তো কৌটিল্যের অনুসারীদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যও বটে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঘটলও সেটাই। ৩৭ বছরের স্বাধীন কৃষকরাষ্ট্র আবার ফিরে গেল বহিরাগত উচ্চবর্ণের শাসনে।

আর পপীপের কথা। কবি, প্রেমিক, যোদ্ধা পপীপ। ক্রীতদাস থেকে কবি। চারণ কবি নয়। সংস্কৃত জানা, সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতিমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া পপীপ। সদুক্তিকর্ণামৃত বা সুভাষিত রত্নকোষ নামের প্রাচীনতম কবিতা সংকলনে পঞ্চম শতকের কালিদাস, পরবর্তী যুগের ধারাবাহিক কবি অমরু, রাজশেখর, ভবভূতি, অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারী নন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীপাশ বর্মা, সংঘশ্রী, মধুশীল, বীর্য মিত্র, শ্রী ধর্মাকর, রতিপাল, বৈদ্যধন্য, লক্ষ্মীধর, সুবর্ণরেখ, জয়িক, শুভঙ্কর, মহিলা কবি নারায়ণলক্ষ্মী ও ভাবদেবীর পাশাপাশি একজন মাত্র কৈবর্ত কবির কবিতা ঠাঁই পেয়েছে পরম যোগ্যতাগুণে। সেই কবি হলেন পপীপ। সেই পপীপেরও আত্মাহুতি হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। অভিজাত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, পপীপকে নিজ কৌমের চিন্তা বাদ দিয়ে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করার উপদেশ দিয়েছিলেন স্নেহের ছলে। বলেছিলেন, রামপাল যে রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করছে তা ন্যায়যুদ্ধ। কারণ বরেন্দ্রী হচ্ছে পালসম্রাটদের জনক-ভূ। তিনি পপীপকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে রামপালের রাজসভায় পপীপেরও যাতে ঠাঁই হয় সেই চেষ্টা তিনি করবেন। উত্তরে পপীপ বলেছিলেন–

মৎসহিত অম্বু কীদৃক পৃচ্ছতি
অবিসামভমিরেণ।
(মাছের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জলাশয় কী?
অবি অর্থাৎ বকহীন।)

তেমনই বহিরাগতহীন বরেন্দ্রীই হচ্ছে একমাত্র বাসযোগ্য বরেন্দ্রী। বরেন্দ্রী ততদিনই শাপমুক্ত থাকবে যতদিন তা থাকবে ভূমিপুত্রদের নিজেদের দেশ।

উপন্যাসের সন্ধান প্রকৃতপক্ষে এইসব ভূমিপুত্রদেরই সন্ধান। তাঁদের গৌরবের সমাচার, তাঁদের ন্যায়নীতির প্রতি নিষ্ঠা, তাঁদের মাটিলগ্ন জীবন নিয়েই আমার স্বপ্নের উপন্যাস 'পিতৃগণ'। উপন্যাসের সন্ধানের আখ্যান তাই নিজের শেকড়-সন্ধানেরই আখ্যান।

জাকির তালুকদার
ফেব্রুয়ারি ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ম পর্ব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০১. ক্রীতদাসের যাত্রাপথ

এটাও সেরকমই এক প্রাক-প্রত্যুষকালের কথা যখন রাত-তাড়ানিয়া সূর্যের আলোরও আগের একটা আলোর আভা মশারির জালের মতো নেমে আসে আকাশ থেকে, যখন কপাটে এসে আলতো বাড়ি খায় বরেন্দির থাক থাক লালমাটির সোপান বেয়ে নেমে আসা শেষরাতের বাতাস আর তারই দোলনা-দোলায় ফাট্ ফাট্ শব্দ তুলে শিমুল ফলগুলো ফেটে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বুড়ির সুতার মতো মিহি তুলোর দলাগুলো, যখন গাড়া-বাঘডাসের দল ঝোপের আড়ালে চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো দেখে নেয় মুরগির খোয়াড়ে ঢোকার কোনো সুযোগ আছে কি না, যখন পাতলা ঘুমের মধ্যে শিশুরা হাতের আন্দাজে বুঝে নেয় পাশে মায়ের উপস্থিতির নির্ভরতা এখনো নিশ্চিত রয়েছে কিনা এবং তারপরে পাশ ফিরে নিজেকে সমর্পণ করে আবার আরেক চুমুক গাঢ় ঘুমের মধ্যে, যখন বন-কৈতর আর অন্য আরও সব ভোরের পাখালির দল ঘরের পাতাবিছানো চালার ওপর অহেতুক নেচে বেড়ানোর শব্দ তোলে খসর খসর, আর আরও কত রকমের শব্দ ওঠে যেগুলোর নাম রাত পোহানোর শব্দ। সেই রকম এক লগ্নে সেদিন এইসব চেনা শব্দের বদলে পুরো গ্রাম জেগে ওঠে নিদ্রার মধ্যে গা-কাঁপানো দুঃস্বপ্ন বুনে দেওয়ার মতো ভীতিকর ঢ্যাঁড়ার শব্দে।

দ্রিগ্ দ্রিগ্ দ্রিগ্ শব্দ উঠছে বিশাল আকারের ঢাক থেকে। সেই শব্দ বাড়ি খাচ্ছে দূরের বনের গায়ে, দূরের দিগন্তের গায়ে, ভোরের সাথে সাথে অনেকটা নিচে নেমে আসা আকাশের গায়ে। মূল ঢাকের শব্দের চাইতে তাই অনেক বেশি বুক-কাঁপানো শব্দ হচ্ছে প্রতিধ্বনির। শব্দ এবং শব্দের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা শব্দ মিলে কাঁপন উঠছে গুচ্ছগ্রামের ছোট ছোট ঝুপড়িগুলোতে।

সূর্যোদয়কে ঠিক পেছনে রেখে গাঁওদেবের পাথর আর গাঁওদেবীর জলের ঘটটিকে দুই পাশে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই রাজপুরুষ (রাজার শান্ত্রি)। যখন আসে, যখনই দাঁড়ায়, এভাবেই দাঁড়ায় রাজপুরুষরা। কৈবর্তদের সব গাঁয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকার মুখে দাঁড় করানো থাকে একটা লম্বা আর একটা চ্যাপ্টা পাথর। গাঁওদেবতা আর গাঁওদেবী। ওরা দিনরাত রক্ষা করে গাঁয়ের মানুষকে। আশীর্বাদ আর অভয় দান করে। কিন্তু যখনই কোনো রাজপুরুষ আসে রাজার আদেশ নিয়ে, তারা সবসময়ই সেই দুই দেব-দেবী পাথরের পাশে সূর্যকে পেছনে রেখে দাঁড়ায়। তখন ওদেরকে মনে হয় দেব-দেবীর চাইতেও উঁচু, আর তাদের ছায়ারা দেব-দেবীর ছায়ার চেয়েও দীর্ঘতর। ওখানে দাঁড়িয়ে একজন শব্দ তোলে ট্যাঁড়ায়। কৈবর্তগ্রামে যে যেখানে থাকুক, ছুটে আসতে হয় ট্যাঁড়ার শব্দ শোনামাত্র। পলমাত্র দেরি করা চলবে না। যদি প্রদোষে বেজে ওঠে রাজার ঢোল তাহলে ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর কাজটাও অসমাপ্ত ফেলে রেখে ছুটে আসতে হবে। যদি সকালের কাজের সময় বাজে ঢোল তাহলে ছুটে আসতে হবে পুরুষদের ক্ষেতের কর্ম ফেলে আর নারীদের চুলার ওপরে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি ফেলে। যদি সূর্যাস্তের পরেও বাজে ঢোল, তাহলে এমনকি বাসররাত্রির সঙ্গমানন্দ ফেলেও ছুটে আসতে হবে কৈবর্ত নারী-পুরুষকে। না আসা অপরাধ। রাজার আদেশ নিজকানে তুলে না নেওয়ার অপরাধ। সেই অপরাধে কেটে নেওয়া হয়েছে কত কৈবর্তের কান! কেটে ফেলা হয়েছে কত কৈবর্তের হাত-পা। যদি রাজার আদেশ নিজকানে তুলে নিতে না-ই পারিস তাহলে কী হবে তোর কান দিয়ে! যদি রাজার ঢোলের শব্দ কানে প্রবেশমাত্র ছুটে আসতে না-ই পারিস তাহলে কী হবে তোর পা দিয়ে! যদি ঢোলের দ্রিগ্ দ্রিগ্ শোনামাত্র ছুটে এসে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে না-ই পারিস তাহলে কী দরকার তোর হাতের!

কৈবর্তদের এই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার দৃশ্য রাজপুরুষদের বড়ই প্রিয়। তাদের চোখ এমন দৃশ্য দেখে চৈত্রমাসের মধ্যাহ্নে হঠাৎ আকাশে মোষরঙা মেঘ দেখার মতো উপশমানন্দ লাভ করে। পিলপিল করে ঝুপড়িঘর থেকে, উঠোন থেকে, পাতার বিছানা থেকে, ঝোপের আড়াল থেকে পড়িমড়ি করে ছুটে আসছে কৈবর্ত নারী-পুরুষ। চোখে-মুখে সাঁটা যেন আতঙ্কের মুখোশ। আর তাদের প্রথম সারি এসে দাঁড়াবে যখন, তাদের হাঁটুতে হাঁটু এত জোরে বাড়ি খাবে যেমন মাদল বাজে যুদ্ধযাত্রায়। কৈবর্ত পুরুষদের পরনে শুধু নেংটি। কেউ কেউ নেংটি বাঁধবার অবকাশটুকুও না পেয়ে নিম্নাঙ্গে কেবলমাত্র এক ফালি কাপড় পেঁচিয়ে ছুটে এসেছে। তাদের মাটি এবং রোদমাখা শরীরের রং পোড়াকাঠের মতো মলিন-কালো। রুক্ষ কর্কশ ত্বক বোধহয় ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে কোনোদিনও তৈলস্পর্শ পায়নি। রৌদ্র তাদের পোড়াকাঠ-ত্বকে দরদরিয়ে ঘাম ছোটায়, সেই ঘামকে শুকিয়েও দেয়। তখন সেই ঘামের লবণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেপ্টে থাকে চামড়ায়। তাই তাদের চামড়াকে এতদূর থেকেও, এই প্রাক-প্রত্যুষেও ফাটা-ফাটা দেখায়। নারীরা সহজাতভাবেই কিছুটা শরীরের যত্ন নিতে শিখে ফেলে বলেই বোধকরি তাদের ত্বক কিছুটা মিহি দেখায়। উজ্জ্বলও কখনো কখনো। কারো কারো চুলে করঞ্জের তেলের ছোঁয়া থাকে। কিন্তু এই সময়টাতে তাদেরও আলু-থালু এবং চূড়ান্ত অবিন্যস্ত দেখা যায়। এই সময়টাতে রাজপুরুষরা নিজেদের, ঐ কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৈবর্তদের তুলনায় অনেক উন্নততর মানুষ বলে ভাবার অবকাশ পায়। তাদের বিশ্বাস এই মর্মে আরও দৃঢ়তর হয় যে তারা নিজেরা দেবকুলোদ্ভব। বাকি তাদের সামনে দাঁড়ানো যারা, তারা সবাই উৎপন্ন অসুরযোনী থেকে। কাজেই কৈবর্তদের প্রতি সকল যথেচ্ছাচার, তাদের প্রতি জিঘাংসা, তাদের প্রতি অত্যাচার– সবকিছুই রাজপুরুষদের পক্ষে সিদ্ধ। তবু যে তারা কৈবর্তদের প্রতি তেমন যথেচ্ছাচার করে না, এ তাদের দেবকুলোদ্ভূত জাতিগত শ্রেয়াচারের বৈশিষ্ট। এই শ্রেয়াচার আর সভ্যতা শেখানোর জন্যই তো তাদের পূর্বপুরুষ আর্যরা দেবতা ইন্দ্রের নেতৃত্বে এই অসুর-রাক্ষস-বয়াংসিদের দেশে এসেছে স্বর্গীয় আলোকশিখা নিয়ে। ইন্দ্রের নাম মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরুষের মনে পড়ে যায় যে আগামী পূর্ণিমাতেই ইন্দ্রের পূজা উপলক্ষে রয়েছে মহান ইন্দ্রোৎসব। আহা কী আনন্দ! ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর এখন ইন্দ্রের প্রদত্ত দায়িত্বই তারা পালন করছে এমন অনুভূতিতে গর্বে ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে তার বুক। সে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে নিজের কর্তব্যের প্রতি। সে তো এখন এখানে কেবল রাজঅমাত্যের নির্দেশ বয়ে আনেনি! সে বয়ে এনেছে স্বয়ং ইন্দ্রের নির্দেশাবলি। তাই সে যখন কথা বলে তখন স্বর্গ থেকে ইন্দ্র যেন ভর করেন তার কণ্ঠে। প্রত্যুষের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে তার গমগমে কণ্ঠস্বরের অভিঘাতে।

এই কৈবর্তরা দেবভাষা বোঝে না। তাদেরকে দেবভাষা শেখানোও যাবে না। শাস্ত্রের নির্দেশ। তাই শাসনকর্ম পরিচালনার জন্য রাজপুরুষদেরই বাধ্য হয়ে কৈবর্তদের কুৎসিত ভাষা, অন্তত কাজ চালানোর মতো করে, শিখতে হয়। ঢ্যাঁড়াবাদক তার বাদন শেষ করার পরে অপরজন উচ্চকণ্ঠে জানতে চায়– শুন হে গাঁওবাসী! সকলে কি এসে পঁউছেছে এইঠাঁই?

থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে থাকা কৈবর্ত নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকায় অনুসন্ধানী চোখে। সবাই সবাইকে চেনে। সেই চেনামুখ সকল উপস্থিত হতে পেরেছে কি না পরখ করে। তারপর জানায়, হ্যাঁ সকলে এসেছে বটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে শুন হে অসুরের বংশধররা! তোমাদের মাঝে এক জুয়ান মরদ ছিল। নাম তার বট্যপ। ছিল কি না?

হ্যাঁ ছিল।

সে এখন কামরূপে। সেথায় সে এখন দেবর্ষি রামশর্মার দাস। আত্মবিক্রয় করা দাস। মনে আছে?

হ্যাঁ মনে আছে বটি। সাত বছর আগে সে নিজেকে বিক্রি করে চলে গেছে সেথায়। সেই বট্যপ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বট্যপই।

একটু গুঞ্জন ওঠে কৈবর্ত সম্মিলনে নিজেদের মধ্যে– তার কথা এতদিন পরে কেন ওঠে আবার? কী করেছে সে? সে তো চলে গেছে সমুদ্রের মতো সদানীরা নদী পার হয়ে রামশর্মার খামারে নিজের ঋণের বোঝা নিজেই শোধ করার জন্য।

হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বট্যপই। সাত বছর আগে সে নিজেকে বিক্রি করে চলে গিয়েছে কামরূপে। কর্মও করছে সেথায়। কিন্তু তার ঋণ তেমন একটা শোধ হচ্ছে না। ধরো প্রতিদিনের পরিশ্রমের জন্য তার নামে যে কয়টা কড়ি যোগ হয় পারিশ্রমিক হিসাবে, প্রায় সমপরিমাণ যোগ হয় তস্য সুদের খাতায়। পুরো ১০ দ্রম্ম আর ১৯ কার্ষাপণ তো মুখের কথা লয়। সে অনেক কড়ি বটি। একজীবনে গায়ে খেটে একজনের পক্ষে তা কী পরিশোধ করা সম্ভব!

সম্ভব লয়?

একেবারেই লয়।

সমবেত জনতার মধ্যে হঠাৎ হাউমাউ কেঁদে ওঠে শীর্ণা এক যুবতী। হাতে ধরা বছর সাতেকের এক ছেলের হাত– তাহলে কী হবে গো! এ জীবনে মানুষটা কি ঘরে ফিরবে না? আমার এই ছেলেটা কি বাবার মুখ জীবনেও দেখবে না একবারটি?

তৎক্ষণাৎ পুরো ঘটনা মনে পড়ে যায় সবার।

সাত বছর আগে বট্যপের স্ত্রী তখন ভরা পোয়াতি। বিয়োনিব্যথা উঠেছে সেদিন সাঁঝের আগে। কিন্তু মায়ের পেট থেকে সন্তান নেমে আসছে না ধরতির বুকে। মায়ের জঠরে থাকার মেয়াদ তার শেষ হয়েছে বটে। কিন্তু সেই সন্তান নামে না বরিন্দের মাটিতে। সেই ব্যথা নিয়েই কেটে যায় সেই রাত, তার পরের দিন, পরের রাত, এমনকি তার পরের দিনও। কৈবর্তগ্রামের দিনগুলো আর রাতগুলো ভারি হয়ে থাকে বট্যপের স্ত্রী বিবানি-র যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে আর গোঙানিতে। গাঁওবুড়িদের জড়িবুটি, জংলা ঔষধির শিকড় বেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়ানো, ওলান ঠাকুরের চরণধোয়া জল, কৈবর্ত-পুরুতের তন্ত্র-মন্ত্রকে পর্যন্ত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিবানির জঠরের শিশু বসে থাকে জঠরেই। নেমে আসে না বিবানির কোলে। বউয়ের কষ্ট সইতে না পেরে বট্যপ ছুটে যায় আধাদিনের পথ উজিয়ে সোজা দেবগ্রামে। সেখানে সবচেয়ে সুখ্যাতা অম্বষ্ঠ (প্রসবকারিণী ধাত্রী) বিল্ববালা। তার দরজায় গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে বট্যপ। বিল্ববালার দায় ঠেকেছে বট্যপের কথা শোনার! হোক না বিল্ববালার নিজের বৃত্তি নীচুস্তরের। দেবগ্রামের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা তো বটেই, বৈশ্য এবং জলচল শূদ্ররা পর্যন্ত তার ছোঁয়া এড়িয়ে চলে। তার ছায়া গায়ে পড়লে নিজেদের অশুচি ভাবে। আবার বিল্ববালা তাদের ছায়াকে পায়ে মাড়ালেও তাদের স্নান করতে হয়। সঙ্কটমোচনে তার ডাক পড়ে বটে দেবগ্রামের ঘরে ঘরে, কিন্তু সে বিদায় নেবার পরে শুদ্ধিযজ্ঞ না করে কেউ কোলে তোলে না নবজাতককে। দেবগ্রামের নীচু অস্পৃশ্যপ্রায় সেই বিল্ববালার চোখেও কিন্তু কৈবর্তরা কৈবর্তই; মানুষ নয়। তাই বট্যপের কাকুতি-মিনতি তাকে স্পর্শই করে না। কিন্তু বট্যপও তার দরজা ছেড়ে নড়ে না। বউকে তার বাঁচাতে হবেই। বিল্ববালাকে সঙ্গে না নিয়ে সে তার ঘরের পৈঠা থেকে নড়বে না। তখন তাকে এড়ানোর জন্যই বিল্ববালা শর্ত দেয়, সে যেতে রাজি আছে, তবে তার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হবে নগদে ১০ দ্রম্ম। দেবগ্রামের সবচেয়ে ধনীর বাড়ির মেয়েদের প্রসব করিয়ে বিল্ববালা পায় আধা দ্রম্ম। অথচ বট্যপের কাছে দাবি করে তার কুড়ি গুণ। এত দ্রম্ম দাবি করার কারণ কৈবর্তনারীকে স্পর্শ না করার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিল্ববালা ভেবেছিল ১০ দ্রম্ম পারিশ্রমিকের কথা শুনে পালিয়ে বাঁচবে বট্যপ। কিন্তু বট্যপের তখন অগ্র-পশ্চাৎ ভাবার অবকাশও নেই, সেই হুঁশ-জ্ঞানও নেই। তার দরকার বউকে বাঁচানো। আর যে নবজাতক আসছে সে তো শুধু তার একার সন্তান নয়, সেই নবজাতক তাদের গোত্রের সম্পদ। তাকে তার বাঁচাতেই হবে। ১০ দ্রম্মের কথাতেও সে পেছপা নয়। বরং এককথায়-ই সম্মত। কিন্তু তাতেই কী শেষ হয়! বিল্ববালার ঝুলি থেকে মুখ বের করতে থাকে আরও আরও দাবি। না, সে অস্পৃশ্য ছোটজাতের নারীদের মতো পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না এত দূরের পথ। তাকে নিয়ে যেতে হবে ঢল্লরিকায় (বস্ত্র আচ্ছাদিত ডুলি) তুলে। এবং ফিরিয়েও নিয়ে আসতে হবে ঢল্লরিকায়। তার খরচ ১৯ কার্ষাপণ।

এত বিশাল অংকের পারিশ্রমিক প্রদানের সামর্থ তার বা তার মতো কোনো কৈবর্তের আছে কি নেই তা ভেবে দেখার অবকাশটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করে না বট্যপ। বিল্ববালা যা-ই দাবি করে, সে একবাক্যে তাতেই সম্মতি জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢল্লরিকাতে দোল খেতে খেতে বিল্ববালা আসে কৈবর্তগ্রামে বট্যপের ঝুপড়িতে।

তার হাতে জাদু আছে। চরক, শুশ্রুত আর স্বয়ং দুই আয়ুর্বেদ দেবতা অশ্বিনীকুমার যেন তার প্রশিক্ষক। এমন নির্বিঘ্নে সে বট্যপ এবং বিবানির সন্তানকে মাতৃজঠর থেকে বরেন্দির মাটিতে নামিয়ে আনে যেন সেই সন্তান শুধু অপেক্ষা করছিল বিল্ববালার হাতের স্পর্শ আর আহ্বান শোনার জন্যই। গোধন যেমন ব্যাগ্র-আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দেয় প্রভুপালকের হাতের জাবনার দিকে, তেমনই দ্রুত এবং মসৃণ গতিতে বিবানির সন্তান নেমে আসে জঠর ছেড়ে বিল্ববালার হাতের মৃদু-আকর্ষণে। সন্তান মাতৃজঠর থেকে নেমে এল মাতৃক্রোড়ে। বিবানির তে-রাত্তিরের যন্ত্রণা মুহূর্তে উধাও।

এবার বিল্ববালাকে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দিয়ে প্রণাম জানানোর পালা।

স্ত্রী এবং সন্তানকে সুস্থ ও জীবিত পেয়ে বট্যপ আনন্দে আত্মহারা। বিল্ববালা তার চোখে এখন সাক্ষাৎ দেবী। সে বার বার প্রণিপাত করে বিল্ববালার সামনে। কিন্তু বিল্ববালার তো ভক্তির দরকার নেই, তার দরকার নগদ কড়ির। সে চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলে, তাকে এবার নিজ আলয়ে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

অর্থাৎ তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু বট্যপের তো নেই-ই, পুরো কৈবর্তগ্রামের সবগুলো ঘর থেকে এক কড়ি-দুই কড়ি জমা করেও বিল্ববালার দাবিকৃত দক্ষিণা পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিল্ববালা ক্রোধে অস্থির। সে চিৎকার করে বলতে থাকে যে এই মুহূর্তে প্রাপ্য দক্ষিণা না পেলে সে রাজপুরুষদের কাছে অভিযোগ করবে। আর রাজপুরুষরা একবার যদি কোনো কৈবর্তকে তুলে নিয়ে যায়, তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তার চাইতেও বড় কথা বট্যপ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ঐ পরিমাণ দক্ষিণা প্রদানের। এই মাটির সন্তানদের মুখের কথাই সব। মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে কোনোকালেই সরে আসে না কোনো কৈবর্ত। কথা সে রাখবেই।

কিন্তু এখন বট্যপ কী করে?

তখন তাকে যেতে হয় মাধ্যমদের কাছে।

গৌড়-কামরূপ-দেবকোট-কর্ণসুবর্ণের ভূমিপতিরা গড়ে তুলেছে বড় বড় ইক্ষুক্ষেত্র। এক-একটা ইক্ষুক্ষেতের বিস্তার অন্তত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি গ্রামের সমান। সেখানে তাদের প্রয়োজন শত শত ভূমিদাস। কৈবর্তদের ভূমিদাস হিসাবে পেতে খুবই আগ্রহী এইসব ইক্ষুগ্রামের অধীশ্বররা। কৈবর্তরা মাটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেনে নিজের নিশ্বাসের মতো। মাটি তাদের সাথে কথোপকথন করে অহর্নিশি। তারাও প্রতিমুহূর্তে মাটিকে মা ডেকে চলে। তাই মাটিও তাদের কাছে মায়ের রূপ ধরে উজাড় করে নিজের জঠর থেকে ফসল দেয়। ধান, আখ, তিল, রবিশস্য, সবজি ফলানোর কাজে কৈবর্তরা প্রকৃতির মতোই পটু। প্রকৃতি নিজে নিজে যেমন লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের জন্ম দেয়, কৈবর্তদের হাতেও ফসল বেড়ে ওঠে যেন নিজের মতো করেই। আর কাজ এড়িয়ে চলা বা কাজে ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে তা এখনো শেখেনি কোনো ভূমিপুত্র।

কিন্তু দাস হতে চায় কে? ভূমিদাস হতে চায় কে? আর্যদের চোখে বুদ্ধি-জ্ঞানহীন কৈবর্তরা পর্যন্ত বোঝে যে আত্মবিক্রয় করার অর্থ আর কোনোদিন মুক্তি না পাওয়া। কিন্তু হাল ছাড়ে না ভূমিপতিরা। তারা কৈবর্ত গ্রামগুলিতে নিয়োগ করেছে একাধিক ব্যক্তিকে মাধ্যম হিসাবে। মাধ্যমদের কাজ হচ্ছে ফুসলে-ফাসলে, কিংবা ক্রান্তিকালে বিপত্তারণের ভূমিকা গ্রহণ করে ব্যাধ যেভাবে হরিণকে ফাঁদে আটকায় সেভাবে ফাঁদে ফেলে কৈবর্তদের আত্মবিক্রয় করানো। বট্যপ এখন সেইরকম পরিস্থিতিতে। কে বাঁচাবে তাকে? হয় এখন মাধ্যমদের কাছে হাত পেতে আত্মবিক্রয় করতে হবে, নইলে বিল্ববালার দক্ষিণা না দেওয়ায় তাকে ধর্মচ্যুত হতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটা পালন না করাকে কোনোদিন ক্ষমা করে না কোনো ভূমিপুত্র। এমন কাজ করলে তার আর ঠাঁই হবে না কোনো কৈবর্তগোত্রে। প্রাপ্য দক্ষিণা না দেবার অপরাধে বিল্ববালা তাকে রাজপুরুষদের দিয়ে যতই অত্যাচার করাক না কেন, সেটা মেনে নিতে বট্যপের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেকে এবং নিজের গোত্রের মানুষকে কোনোমতেই ছোট করতে পারবে না বট্যপ। তাই সে চলে যায় গাঁয়ের উপান্তে ঘর বেঁধে বসে থাকা মাধ্যমের কাছে। কামরূপের ভূমিপতি রামশর্মার লোকের কাছ থেকে ঠিক ঠিক ১০ দ্রম্ম ১৯ কার্ষাপণ নিয়ে বিল্ববালার প্রাপ্য দক্ষিণা মিটিয়ে দেয় সে। বিনিময়ে রাজি হয় আত্মবিক্রয় করতে। ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে। কিন্তু নিজেকে কিংবা নিজের জাতিকে কোনোমতেই খাটো করবে না বট্যপ। দেখা যায় রামশর্মার লোকের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তার আত্মবিক্রয়পত্রে নিজের হাতের ভূষাকালির ছাপ দেবার সময় একবিন্দুও কাঁপে না বট্যপের হাত।

তারপর মাত্র এক প্রহর আগে ভূমিষ্ঠ শিশুপুত্রের কপালে একটিমাত্র চুম্বনতিলক এঁকে দিয়ে বট্যপ চলে গেল কামরূপে রামশর্মার নীবিক্ষেত্রে ভূমিদাস হিসাবে কাজ করতে। পেছনে পড়ে রইল সদ্যপ্রসূতি বিবানি, যে এখনো পর্যন্ত সুস্থ ও জীবিত পুত্রসন্তানের মা হবার গর্বটুকু পর্যন্ত অনুভব করার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। পড়ে রইল সদ্যোজাত পুত্র। পড়ে রইল কৈবর্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপদ। বরেন্দির লালমাটি। শিশুর মুখে তুলে দেবার মতো এক ফোঁটা মধু পর্যন্ত নেই যে ঘরে, প্রসবক্লান্ত স্ত্রী-র মুখে জাউ তুলে দেবার মতো এক মুঠো খুদ পর্যন্ত নেই যে ঘরে, সেই দুঃখের আঁধারে নিমজ্জিত ঘরটিকে শূন্যতায় আরও অন্ধকার করে দিয়ে বট্যপ চলে গেল কামরূপে রামশর্মার নীবিক্ষেত্রে ভূমিদাসের কাজ করতে।

আর তার স্ত্রী-পুত্র কীভাবে কীভাবে যেন, যেভাবে কৈবর্তরা বেঁচে-বর্তে থাকতে শিখে যায় খেয়ে না খেয়ে, আধা মানুষ আধা জানোয়ারের জীবন টেনে-বয়ে, সেভাবেই বেঁচে রইল।

আজ আবার বট্যপকে স্মরণ করা কেন? না জানি কোন নির্দেশ আসে!

বজ্রপাতের মতো আঘাত ধেয়ে আসে আবার।

বট্যপের একার জীবনভর শ্রমে নাকি শোধ হবে না তার ঋণ। তাই রাজপুরুষরা আজ নিতে এসেছে তার সাত বছরের সন্তানকে।

না!

দয়া করো প্রভু! এই ছেলেকে ছেড়ে মা কীভাবে বাঁচবে! এই কচি ছেলেই বা মাকে ছেড়ে বাঁচবে কীভাবে? আর এতটুকুন এই ছেলে কাজটাই বা কী করতে পারবে? ও যে মরে যাবে প্রভু!

বললেই তো আর হয় না। দুই রাজপুরুষও তো নিতান্ত নির্দেশ পালনকারী বই নয়! কৈবর্ত নারী-পুরুষের আবেদন-নিবেদনে তাদের মন যদি গলেও যায়, তবু তারা পারবে না বট্যপের ছেলেকে না নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে। অশিক্ষিত কৈবর্তের দল তো জানে না যে কত হাত ঘুরে রাজপুরুষদের কাছে এসে পৌঁছেছে এই নির্দেশ। কামরূপের ভূমিপতি দেবর্ষি রামশর্মা এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন কামরূপের রাজার কাছে। রাজা তার আবেদনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপরে দূত পাঠিয়েছেন মহারাজাধিরাজ মহীপালের কাছে। মহারাজ মহীপাল কূটনৈতিক শিষ্টাচারের কারণে, দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তির কারণে সম্মতি জানিয়েছেন কামরূপের মহারাজার অনুরোধে। তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছেন বরেন্দ্রীতে অমাত্যের কাছে। অমাত্যের নির্দেশ এসেছে দণ্ডিকের (স্বরাষ্ট্র বিভাগ) কাছে। দণ্ডিক থেকে প্রেরিত এই দুই রাজপুরুষ। তারা তো চাইলেও সেই আদেশের কোনো অন্যথা করতে পারে না। আর তারা অন্যথা করতে চাইবেই বা কেন? এই কৈবর্তরা তাদের চোখেও তো অর্ধেক পশু বৈ কিছু নয়। অর্ধপশুদের আবার পুত্রশোকই বা কী মাতৃশোকই বা কী আর সন্তানশোকই বা কী!

কাজেই ছেলেকে আগলে রাখা মায়ের বাহুডোর শিথিল হতেই হয় একসময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত বছরের বাচ্চা ছেলে, মা আদর করে যার নাম রেখেছে পপীপ, এত কিছু বুঝতে পারে না। মাকে মাঝেমাঝেই বুক থাপড়ে কাঁদতে দেখেছে সে। বিশেষ করে তার বাবা নামের একটা অচেনা লোকের নাম মুখে নিয়ে মা বেশ ঘন ঘন কাঁদে। তার খিদের সময় খাবার দিতে না পারলেও কাঁদে। তাদের ধানের ক্ষেত বুনো শুয়োর এসে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলেও এভাবেই কাঁদে। কিন্তু আগের দিনগুলোর কান্নার চেয়ে আজকের এই কান্না যে অনেক বেশি আর্তনাদময়, অনেক বেশি ভেতর থেকে উঠে আসা, তা অবশ্য বুঝতে পারে না পপীপ। রাজপুরুষদের একজন যখন তার হাতকে মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে, তখনো সে বিমূঢ়ের মতো একবার রাজপুরুষটির দিকে, একবার ক্রন্দনরতা মায়ের দিকে তাকায় বটে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার ঠিক কী করা উচিত তা বুঝে উঠতে পারে না। মা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে আছড়ে পড়ে, বার বার স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা নিজগ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা করার আকুল আবেদন জানিয়েও তাদের স্থানুবৎ-ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আক্ষেপে বারংবার মাটিতে নিজের হাত আছড়ায়, বসন সরে যাওয়া নিজের পলিরঙা বুকে বার বার চাপড় দেয়, তখনো এমনকি গাঁয়ের কোনো মেয়েমানুষও সান্ত্বনা দিতে কাছে আসছে না দেখে পপীপ নিজেই তার মাকে শান্ত করার জন্য এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু রাজপুরুষের গেরো দেওয়া দড়ির মতো শক্ত মুষ্টি তাকে ছাড়ে না। বরং তীব্র বিরক্তির সাথে রাজপুরুষ তাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করায় গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পথের দিকে। মুখে বলে– চল্। পপীপ তারপরেও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে থাকা মায়ের মুখের দিকে তাকাতে চায়। তার মায়ের এত কান্নার কারণ সে বুঝতে পারে না। কিন্তু এটুকু বোঝে যে মায়ের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের উঠোনে একবার বেজিতে ধরা একটা কমবয়সী মুরগির দেহের আছড়াআছড়ি আর ডানার এলোপাতাড়ি ঝাপটানি দেখেছিল পপীপ। আজ মনে হচ্ছে মা সেই মুরগির মতো মাটিতে ঝাপটে পড়ে আছড়াআছড়ি করছে। মুরগি বাঁচাতে তেড়ে গিয়েছিল মা। পাশের উঠোন থেকে ছুটে এসেছিল আরেক কাকিমা, আরেক জেঠিমাও। কিন্তু আজ গোটা গাঁয়ের সবগুলো নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কেউ তার মায়ের কষ্ট লাঘবের জন্য হাত বাড়াচ্ছে না, দাঁড়াচ্ছে না মায়ের পাশে গিয়ে, এই রকম ব্যাপার তো তাদের কৈবর্ত গাঁয়ে কোনোদিন দেখেনি পপীপ। তাই সে বরেন্দির সরলতা নিয়েই আবার মায়ের দিকে এগুতে চায়। মা উঠোন থেকে ডাকলেই যেমন সে বনের কিনারে খেলতে খেলতেও সাড়া দিয়ে ছুটে আসে, সেই রকমই সহজাত সাড়া দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় মায়ের কান্নায়। কিন্তু রাজপুরুষের মুঠি তার লিকলিকে বাহুকে এত জোরে চেপে ধরে রেখেছে যে মায়ের দিকে তার বিন্দুমাত্রও এগুনো সম্ভব হয় না। রাজপুরুষ তাকে মায়ের দিক থেকে ফের ফিরিয়ে নেয় গ্রামত্যাগী পথরেখার দিকে। তারপরেই তাকে হিড়হিড় করে এত দ্রুত টেনে নিয়ে হাঁটতে থাকে যে পপীপ নামের সাত বছরের কালোকেষ্ট, হাড় জিরজিরে, নিম্নাঙ্গে নেংটি পরা, উর্ধ্বাঙ্গ খালি বালকটিকে, যে কিনা সকালেরও আগে আচমকা ট্যাঁড়ার শব্দে ঘুম ভাঙার পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে খালিপেটে, দাঁতে সুতাটি পর্যন্ত কাটার সুযোগ পায়নি, এদিকে কিনা মা তার জন্যে ঘরে মাটির হাড়িতে পান্তাভাত রেখে দিয়েছে, সেই পান্তাভাত কিংবা মায়ের কথাও বিন্দুমাত্র ভাবার সুযোগ না পেয়ে রাজপুরুষের হাতের টানে নিজের পা মেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। রাজপরুষদের হাতের টানে আর তাদের দুলকি চালের চলনের সাথে তাল মেলাতে তাকেও এত জোরে হাঁটতে হয় যে মাত্র যখন সে তীব্র হাঁপিয়ে উঠে হাপড়টানা বুক নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রাজপুরুষদেরও থামতে বাধ্য করে ফেলে, তখন বুকে বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতেও সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে যে চেনা জগতটিকে সে এরই মধ্যে ফেলে এসেছে অনেকখানি পেছনে। তার এখনকার সঙ্গীরা, তার পায়ের তলার প্রতি পদক্ষেপে পিছু হটে যাওয়া মাটি, তার চারপাশের বুনো অড়হর-বাবলাকাঁটা-জারুল-শিমুল গাছ, ধারালো নালিঘাসের ঝোপের মধ্য থেকে মাথা তুলে উঁকি দেওয়া খয়ের গাছ, এমনকি তার মাথার ওপরের তেতে ওঠা আকাশ– সবকিছুই তার অচেনা মনে হয়। আর এই বয়সের বালকের কাছে অচেনা সবকিছুই ভীতিকর এবং নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক। তাই ভয় পেয়ে পপীপ একবার হয়তো কেঁদে ওঠারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাজপুরুষদের রুক্ষ কর্কশ ধমক, কড়াপরা হাতের তালু দিয়ে ঘাড়ের চামড়া ঘষ্টে দেয়ার কষ্টদায়ক স্পর্শ অবিলম্বেই তাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল যে তাদের কাছে তার কান্নার কোনো মূল্য নেই। ফলে এই অনুভূতি তার কান্না থামিয়ে দিয়েছিল প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে। এবং ফলে সেই কান্না অনেকদিন তার বুকে অচেনা এক পাথর হয়ে চেপে বসে থেকে গিয়েছিল। অনেকদিন।

০২. অচেনা মাটির গন্ধ

দেবগ্রামে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দেখা গেল সূর্য প্রায় পাটে বসেছে। দুই রাজপুরুষ ভীষণ বিরক্ত। এত দেরি হওয়ার কথা নয় তাদের। তাদের রাগ পপীপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর। তার জন্যেই জোরে হাঁটতে পারেনি তারা। পথে দুজনে পপীপকে তাড়া দিয়ে গেছে অবিরাম। কিন্তু তাদের শত টানা-হ্যাঁচড়া, ধমক-ধামক, তাদের মুগুরভাঁজা কড়াপরা হাতের চড়-চাপাটি খেয়েও সাত বছরের পপীপ তার হাঁটার গতি এর চেয়ে দ্রুত করতে পারেনি। একসময় ওরাও বাধ্য হয়েই বুঝে গিয়েছিল যে এরচেয়ে বেশি গতি পাওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তাদের মাঝে মাঝে বিরতিও দিতে হবে ছেলেটিকে জিরিয়ে নেবার সুযোগ দেবার জন্যে। মুশকিল হচ্ছে একে ফেলে রেখে চলে যাওয়াও যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয় মেরে ফেলাও। আবার একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে বালক যেন কোনোরকম পঙ্গুত্বেও আক্রান্ত না হয়। কেননা পঙ্গুকে দিয়ে তো আর প্রভুর কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া পপীপ এখন পালসম্রাট মহীপালের সন্ধিবান্ধব কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার পুরোহিত দেবর্ষি রামশর্মার সম্পত্তি। তারা দুজন বাহকমাত্র। তাদের দায়িত্ব এই বালককে জীবিত, সুস্থ ও কর্মক্ষম অবস্থায় নির্দিষ্ট একটা গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। কাজেই পপীপের ধীরগতির হাঁটার কারণে তাদের বিরক্তি বারংবার ক্রোধের পর্যায়ে উপনীত হলেও মুখের অশ্রাব্য গালাগালি ছাড়া আর কোনো উপায়ে সেই ক্রোধ প্রকাশ করার সুযোগ তাদের ছিল না। বালকের পিঠে বেত্রাঘাত কিংবা মুখে মুষ্ট্যাঘাত করার তীব্র ইচ্ছা তাদের নিজেদেরই দমন করতে হয়েছে। তারাও বাধ্য হয়েছে ঘন ঘন পথবিরতি নিতে। খইনি খেয়ে শীতল করেছে ক্রোধান্বিত মস্তিষ্ক, পথে রাজার দিঘী থেকে জল খাইয়েছে বালককে। নিজেদের থলি থেকে গুড়-মুড়ির অংশও দিয়েছে তাকে। তারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত অবাকই হয়েছে বালকের সহ্যশক্তি দেখে। ছোট্ট পেটে তার আর কতটুকুই বা খাদ্যবস্তু আঁটে। তার ওপরে একটানা পথশ্রম। তার শুকনো মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় পেটের ক্ষুধার তীব্রতা। কিন্তু সে মুখ ফুটে কখনো খাবার চায় না। এমনকি তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নিজে থেকে চেয়ে খায় না। তার ছোট্ট হৃদয়ও ইতোমধ্যেই বুঝে নিয়েছে যে যারা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তাদের অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা তো দূরের কথা, দয়া-মায়া-করুণারও চিহ্নমাত্র নেই। তার জন্ম থেকে চেনা মানুষদের সাথে এই মানুষগুলোর কোনো মিল নেই। আর একথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে শামুকের মতো। হাজার হাজার ঝিনুক-গুগলি-জলকেন্নোর মধ্যে একলা একটা শামুক সে। সে নিজে যে এইসব মানুষদের থেকে আলাদা তা তাকে ভেতর থেকে জানিয়ে দিয়েছে তার কৈবর্ত রক্ত। মুখ ফুটে নিজের কোনো কষ্টের কথা বলছে তো না-ই, আচরণেও কোনো করুণা-প্রত্যাশার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মধ্যে। কৈবর্তগ্রাম ছাড়ার পরপরই কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করেছিল সে। প্রথমে কান্না ছিল চিৎকারে ভরা। রাজপুরুষদের ধমক এবং চড়-চাপাটি খাওয়ার পরে সেটি পরিণত হয়েছে নিঃশব্দ কান্নায়। কিছুক্ষণ পরে পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে তার কান্না। বরং একধরনের নির্বিকারত্ব এসে গেছে তার অবয়বে এবং আচরণে। এই বয়সের পক্ষে এমনটি হওয়া প্রায় নিতান্তই অসম্ভব। সেই নির্বিকারত্বের সামনে দুই রাজপুরুষও মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করেছে। জিড়িয়ে নেবার সময় ওরাই আগবাড়িয়ে কথা বলতে গেছে বালকের সঙ্গে।

তোর নাম কী রে?

পপীপ।

তোর ভাগ্য বড় ভালো রে বুঝলি! যেথায় যাচ্ছিস সেথায় তিন বেলা খেতে পাওয়া যায়। ওরা তোকেও তিন বেলাতেই খেতে দিবে। তোরা কি কোনোদিন তিন বেলাতে খেতে পাস?

বালক কোনো উত্তর করে না।

কথা বলিস না কেনে?

অপর রাজপুরুষ যোগ দেয়– তোমার যেমন কথা! ওরা তিন বেলা খেতে পাবে কুথেকে? ওরা কৈবর্ত লয়?

তিন বেলা খেতে পাবে এমন ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে আর যে-ই হোক কৈবর্ত জন্মাতে পারে না।

তাহলেই বুঝে দ্যাখ। কত ভাগ্য তোর । সেথায় তিন-তিন বেলা খাওয়া। আর শুনেছি কামরূপ দেশটা ভারি সুন্দর! সেখানে সক্কলেই জাদু-টোনা জানে। জাদু দিয়ে ভাত-মাছ, মণ্ডা-মেঠাই বানায়। যত খুশি খাও।

আর তাছাড়া তোর ভয় কিসের। তোর বাপই তো সেথায় রয়েছে, লয়? দেবগ্রামে পৌঁছুতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে দুই রাজপুরুষ। ছেলেটিকে ভালোয় ভালোয় এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছে তারা। দণ্ডিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের ছুটি।

দণ্ডিক কার্যালয়ের করণীক নাম-ধাম লিখে নেয় পপীপের।

সেই প্রথম কাউকে লিখতে দেখল পপীপ। খাগের ছোট ডালের মতো একটা দণ্ডের মাথা কালো আরকের মধ্যে চুবিয়ে চুবিয়ে সাদাটে একটা কাপড়ের মতো জিনিসের ওপর দাগ দিয়ে চলল অবিরাম। ছবি আঁকতে দেখেছে পপীপ। তাদের গাঁয়ের ওঝাই তো কত জীবজন্তুর ছবি আঁকে। ভূত তাড়াতে এসে উঠোনের মাটিতে গাছের ডাল দিয়ে কত ভয় পাওয়া চেহারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতের ছবিও আঁকে। কিন্তু এই লোকের আঁকার সাথে সেগুলোর কোনো মিল নেই। মনে হচ্ছে ইচ্ছেমতো হিজিবিজি আঁকছে লোকটা, কিন্তু সেই আঁকার একটা সুন্দর ছাঁদ ফুটে উঠছে ঠিকই। দুই রাজপুরুষের বজ্রমুঠির হ্যাঁচকা টানে জন্মগ্রাম ছাড়ার সময়ের প্রথম কান্না ছাড়া এতক্ষণ পপীপের স্বরযন্ত্রে নিজ থেকে কোনোই ধ্বনি ফোটেনি। কিন্তু এবার এই অদ্ভুত কাজটি দেখে সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারে না– কী আঁকা করছ তুমি?

পপীপের প্রশ্ন আর আঁকার কথা শুনে হেসে ফেলে করণীক। তারপর বোধহয় তার মনে পড়ে এ তো অর্ধপশু এক কৈবর্তবালক। সে কীভাবে জানবে লেখাপড়ার কথা। তবে খুব রূঢ় হয় না তার উত্তর। বলে– লেখা আঁকছি।

লেখা আঁকা!

অক্ষর আঁকছি। মানুষের মুখের কথা অক্ষর দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা যায় বুঝলি! তাহলে আর কথারা হারিয়ে যেতে পারে না।

তারপরেই মুখঝামটা আসে– এসব তুই বুঝবি না। বুঝে কাজও নেই। তোর মতো কৈবর্তসন্তানের কাজ তো মাটির সাথে হামাগুড়ি দিয়ে কেঁচোর মতো খালি চাষবাস করা।

কাগজ-লেখনি গুছিয়ে নিয়ে উঠে গেল করণীক।

আর পপীপকে সেখানেই রেখে দেওয়া হলো তিন দিন।

তিন বেলা খাবার পায় পপীপ। তাকে শুতে দেওয়া হয় মেঝেতে খড় বিছিয়ে কার্যালয়ের এক কোণে। কিন্তু কারো সাথে কোনো কথা বলতে পারে না পপীপ। এখানে যারা আসে-যায়, তাদের ভাষা ভিন্ন। সে ভাষার বিন্দুবিসর্গ বোঝে না পপীপ।

তিনদিন পরে তাকে তুলে দেওয়া হলো গো-শকটে। এবার তার সঙ্গী রাজপুরুষ ছাড়াও আরও তিনজন কৈবর্ত। অন্য কোনো গ্রামের কৈবর্ত। তাদের আগে কোনোদিন দেখেনি পপীপ। ঐ তিনজন লোকও বোধহয় পরস্পরের কাছে অচেনা! তবু তো তারা কৈবর্তই। পুরো তিনটি দিন অন্য ভাষার কারাগারে বিদেশবাসের পর এই প্রথম যেন সে নিজেদের ভিটে-গাঁয়ের এক ঝলক সুবাস পায়। লোক তিনজন নিজেরাও খুব বিমর্ষ, ম্রিয়মান। ওরাও নিজেদের বিক্রি করেছে কামরূপের ভূস্বামীদের কাছে। নিজের দেশ-গ্রাম পরিজন-আত্মীয় ছেড়ে হয়তো চিরদিনের জন্য চলে যেতে হচ্ছে অন্য ভূখণ্ডে। নিজেদের কষ্টে বিভোর থেকেও ছোট্ট পপীপকে দেখে তাদের দৃষ্টিতে মায়া ফুটে উঠতে বিলম্ব হয় না।

তুই কেনে বাপ? তুই কেনে বিক্রি হলি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপ উত্তর দিতে পারে না। সে আসলে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি কেন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর কোথায়-ই বা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত তিনদিন দণ্ডিক কার্যালয়ে বন্দি থেকে দিনমান ভয়তরাসে চোখ নিয়ে অচেনা জাতির মানুষের আনাগোণা দেখেছে। আর রাতে ঘুমের ঘোরে বারবার অভ্যাসমতো মায়ের বুকের ওম খুঁজতে গিয়ে না পেয়ে জেগে উঠে কেঁদেছে অসহায়ভাবে। কখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে, কখনো হাউমাউ করে। চিৎকার করেছে মা মা বলে। কিন্তু মা আসেনি। বরং অচেনা অন্ধকার আরও বেশি করে চেপে বসেছে ওর চারপাশে এবং বুকের মধ্যে। কান্নার ক্লান্তিতে একসময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে আবার।

তিন বয়স্ক কৈবর্ত নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেউ বেশি দূর যেতে পারে না চিন্তায়। বোধহয় বেশিদূর ভাবার মতো চিন্তাশক্তিও নেই। একটু পর পর কেঁদে ফেলে অনুচ্চ শব্দে। কিন্তু কাঁদার সময়েও তারা সচেতন। নিজেদের মধ্যে কাঁদবে ঠিক আছে। কিন্তু কোনো রাজপুরুষ তাদের কান্না দেখতে পাওয়ার আগেই চোখ মুছে ফেলে। কেউ যেন কৈবর্তদের দুর্বল আর করুণাভিখারি ভাবতে না পারে সে ব্যাপারে শতভাগ সচেতন তারা। তবে সবসময়ই ওরা কেউ না কেউ নিজের গায়ের সাথে লেপ্‌টে রাখে পপীপকে। সংস্পর্শের সংবেদনা বোঝাতে চায়। কাছের মানুষটির গাল গড়িয়ে নেমে আসা চোখের জল দু-এক ফোঁটা পড়ে পপীপের মাথাতেও।

গো-শকট এগিয়ে চলে দিনভর। মাঝদুপুরে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিল একটা বিথীর (বাজারের) সামনে। খুবই ছোট্ট বিথী। অল্প কয়েকজন দোকানি। এক দোকানে শুটকি আর সোরা মাছ। কয়েক দোকানে শস্য। যব, দেধান, শামা ধান, কঙ্গু, মুগ, মসুর।

এখানেও দণ্ডিকের একটা কার্যালয় রয়েছে। সেখান থেকে বদলে নেয়া হলো শকটের বলদ। খেয়ে নিল শকটচালক এবং প্রহরারত রাজপুরুষরা। পপীপদেরও খেতে দেওয়া হলো। যবের মণ্ড আর ভাদুস (পোড়ানো ভুট্টা)।

রাজপুরুষ ও চালকরা খইনি খেতে খেতে বিশ্রাম সেরে নেয়। তারপর আবারও চলার শুরু।

এখনো ওরা বরেন্দিতেই রয়েছে। মাটির বর্ণ দেখে বোঝা যায়। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতো কালচে হয়ে ওঠা লাল মাটি। ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো থাকে-থাকে উঁচু হতে হতে দূরে চলে গিয়ে ফের থাকে-থাকে নিচু হতে থাকা মাটি। এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ঝোপ-জঙ্গল। সূর্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোষ থেকে মাটিকে রক্ষার জন্য ওলান ঠাকুর জন্ম দিলেন গাছ-পাতার। সেই গাছ-পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি কৈবর্তদের ঝুপড়ি। সারাদিন কড়া রোদের রোষে পুড়লেও ঝুপড়ির মধ্যে আধা-অন্ধকার শীতল ছায়া। পথের পাশে সমতল ভূমি থাকলেই সেখানে চাষবাসের চিহ্ন। কৈবর্তদের ধানক্ষেত, আখক্ষেত। বলদের টানে তাদের নিচ দিয়ে পেছনদিকে সরে যেতে থাকে বরেন্দির মাটি। আর তারা সতৃষ্ণ নয়নে দ্রুত পেছনের দিকে অতীতের মতো অপসৃয়মান বরেন্দিকে দেখে। বরেন্দিকে দেখে তার রূপ-রস-রুক্ষতাসহ।

শবর কিংবা পুলিন্দদের মতো যাযাবর নয় কৈবর্তরা। নিজেদের গ্রাম, হাট-বাট-গোবাট, বনঝোপ-খাল-নদী নিয়ে তাদের জীবন। তাদের জীবনের চৌহদ্দি বড় বেশি সীমায়িত। তাদের তো বড় চৌহদ্দির কোনো প্রয়োজনও নেই। ওলান ঠাকুর তাদের জন্য দিয়েছে এই বরেন্দি। দিয়েছে শস্যবিয়ানো চাষের জমি, খাল-নদীর মাছ, দিয়েছে গাঁওদেবী আর গ্রামঠাকুরের থান, দিয়েছে পার্বনের নাচগান, তাদের গীতের সুর আকাশের কাছে বয়ে নেবার মতো বাতাস, মাটি আর বৃষ্টির আলিঙ্গনের মতো নারী-পুরুষের মিলনের সঙ্গমানন্দ, ময়ূর-গোসাপ-বনমোরগের সাথে ছুটাপুটি খেলার আনন্দ। দিয়েছে কার্পাসের বস্ত্র। দিয়েছে পাখিদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গীত গাওয়ার উচ্ছ্বাস। তাদের তাই বরেন্দির বাইরে পা রাখার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। বরেন্দির বাইরের পৃথিবীতে পা ফেলার কথা তাদের মনেই আসে না। কেন পড়বে? তাদের তো সব আছে। বরেন্দি তাদের সব দিয়েছে। যাদের নিজেদের মাটি তাদের সবটা প্রয়োজন মেটাতে পারে না, তারাই তো অন্য ভূমির সন্ধানে আকাশ-মাটি-নদী-সাগর চষে ফেলে। সেই রকম মানুষদের জন্য তাচ্ছিল্যের পাশাপাশি করুণাতেও ভিজে থাকে কৈবর্তদের মন। সেই কারণেই ভিন্ন জাতির কেউ এসে হাত পাতলে তাকে কোনোদিনই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়নি বরেন্দির ভূমিপুত্ররা। তাছাড়া ভগবান যখন সব প্রাণীকেই থাকার জায়গা দিয়েছেন, খুঁটে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেখানে কোনো মানুষ থাকার জায়গা পাবে না, নিজের অন্নের সংস্থান করতে পারবে না, এমন ভাবনা কৈবর্তদের বড় বিচলিত করে ফেলে। তারা তাই কাউকে কোনোদিন জোর করে তাড়িয়ে দেয়নি নিজেদের ভূমিখণ্ড থেকে। চাষের ক্ষেত্র দিয়েছে, পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছে গ্রামের প্রান্তসীমায়। ভিনদেশ থেকে আসা মানুষের কাছে শুনেছে অচেনা পৃথিবীর কথা। কিন্তু তাদের কোনো ইচ্ছা হয়নি কোনোদিন বরেন্দি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে। এই তিন কৈবর্তেরও একই রকম জীবনধারা। নিজেদের জীবন আর নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁও-বরেন্দির চৌহদ্দি নিয়েই তাদের জীবনের বিচরণ। তাই এখন এই অজানা যাত্রায় তারা অস্বস্তি বোধ করতেই থাকে। নিজের জীবনের চৌহদ্দির বাইরে পা দিতে বাধ্য হয়ে এখন চলার পথে যা-ই চোখে পড়ে, তাদের কাছে নতুন মনে হয়, অচেনা মনে হয়, ভীতিকরও মনে হয় একটু একটু। আবার চলতে চলতে ওদের মনের কোণে বোধহয় পর্যটকের কৌতূহলও জন্ম নেয় কিছুটা। তাই তারা তাদের চারপাশকে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মনে মনে তুলনা করতে থাকে নিজেদের গ্রাম-জনপদের সাথে এইসব জনপদের মিল আর অমিলগুলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে ওঠে আগামী জীবনের অনিশ্চয়তা এবং অচেনা কষ্টকর জীবনের ভীতি। সেই ভীতিই একসময় মনের মধ্যে নিয়তির মতো চেপে বসে ভোঁতা করে দেয় তাদের অন্য অনুভূতিগুলো। তখন তাদের থাকে শুধু কৌতূহলবিহীন পথচলা। তারা রাজপুরুষ ও শকটচালকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে অন্তহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

সূর্যাস্তের লগ্নে রাজপুরুষদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পরবর্তী দণ্ডিকের কার্যালয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বোধকরি অন্ধকার হয়ে যাবে। বরেন্দি অঞ্চলে সূর্যাস্তের পরে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলের বাইরে থাকতে তাদের বড় ভয়। কেননা বন-জঙ্গলে ছাওয়া পথে রাত্রিকালে রাক্ষসদের বড় উৎপাত। রাক্ষসরা কিন্তু ভিন্ন ধরনের কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণী নয়। মানুষই। কিন্তু বিদ্রোহী মানুষ। আদি ভূমিপুত্র। সভ্য আর্যরা এদেশে এসেছে সেই কত হাজার বছর আগে। অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করেছে তাদের। তাদের ভূমি কেড়ে নিয়েছে। তাদের নাম দিয়েছে অসুর বয়াংসি রাক্ষস অনাস। কিন্তু ভূমিসন্তানদের কয়েকটি গোষ্ঠী কোনোদিনই পরাজয় মেনে নেয়নি। তারা আর্যসভ্যতার আহ্বান ও প্রলোভনকে উপেক্ষা করে শতাব্দীর পর শতাব্দী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে দেবকুলের মানুষ ও তাদের অনুগতজনদের ওপর। এই অঞ্চলের ভিল, শবর, পুলিন্দারা বরাবরই এই যুদ্ধে লিপ্ত। বেশ কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে বরেন্দির বিভিন্ন গ্রামের কৈবর্তরাও হাত মিলিয়েছে তাদের সাথে। অনেক আত্মবিক্রিত কৈবর্ত দাস পালিয়ে এসেছে ভূস্বামীর কৃষিক্ষেত্র থেকে। আশ্রয় নিয়েছে বনে-জঙ্গলে-গুপ্তস্থানে। তারা সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে মহাবলী পালসম্রাটের রাজপুরুষদের ওপর। জঙ্গলাকীর্ণ পথের মধ্যে আক্রমণ তো হচ্ছেই, মাঝে মাঝে আক্রান্ত হচ্ছে এমনকি দণ্ডিক কার্যালয় এবং বিথীসমূহও। রাজপুরুষদের অন্তরের শংকা পরস্পরের প্রতি বিরক্তির দ্বারা প্রকাশিত হতে থাকে। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে পথের মধ্যে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য, খইনির নেশায় পথচলাতে বার বার বিরাম দেবার জন্য। শেষে তাদের সম্মিলিত ক্রোধ বর্ষিত হয় শকটচালকদের ওপর– সব শ্যালক অসুরদের বংশধর। ওরা বলদ তো খেদাচ্ছে না, এমন গতিতে শকট চালিয়েছে যেন বায়ুসেবনে বেরিয়েছেন মহাঅমাত্য!

আতঙ্ক নিয়েই পথ চলতে হয় তাদের। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোনো বিপত্তি ছাড়াই পরবর্তী দণ্ডিকের কার্যালয়ে পৌঁছুতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তারা। আজ রাতের মতো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

পরের সারাদিনও পথচলা একই নিয়মে। এইভাবে একনাগাড়ে শকটে বসে থাকতে অভ্যস্ত নয় কৈবর্তরা। তারা তো চিরকাল পথচলা বলতে বোঝে হাঁটা। শুধু বিবাহ-উৎসবকালে বর-কনের জন্য তৈরি করা হয় বাঁশের ঢল্লরিকা। জীবনে ঐ একদিনই তারা নিজেদের পা-ভিন্ন অন্য কোনো বাহনে উঠতে পারে। তাই মন্থর গো-শকটে প্রহরের পর প্রহর বসে থাকা তাদের জন্য নিরন্তর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা রাজপুরুষদের কাছে শকটে চলার বদলে হাঁটার অনুমতি চায়। রাজপুরুষরা একটু দ্বিধা করে। তারপরে মেনে নেয় তাদের অনুরোধ। শকটের ওজন কম হলে বলদগুলো জোরে হাঁটতে পারবে। তারা কৈবর্তদের হাঁটার অনুমতি দেয় বটে। তবে হাঁটতে দেয় একজন-একজন করে। পালাক্রমে। একজন কিছুক্ষণ হাঁটে। সে এসে শকটে বসে। তারপর আরেকজন হাঁটার সুযোগ পায়। তবে যতক্ষণ একজন কৈবর্ত হাঁটে, তার কোমরে ও হাতে বাঁধা থাকে দড়ি। দড়ির একপ্রান্ত কোনো এক রাজপুরুষের সতর্ক হাতে। যাতে কৈবর্ত পালাতে না পারে।

রাজপুরুষদের এই আচরণের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না কৈবর্তরা। তারা পালাবে কেন! আর তাদের প্রহরা দিয়ে নিয়ে যেতে হবেই বা কেন! তারা তো আত্মবিক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ক্রেতা ভূস্বামীর কাছে তারা তো যাবেই। কাজও করবে। কেননা কাজ না করলে ঋণ শোধ হবে কী করে! আর ঋণ শোধ না করে মরলেও তো ওলান ঠাকুর তাদের ক্ষমা করবে না। ক্রেতার লোক আবার তাদের হাতের ভূষাকালির ছাপ নিয়েছে ফলকে। এই হাতের ছাপ নেওয়া ফলকেরই বা কী প্রয়োজন তা বুঝে উঠতে পারে না কৈবর্তরা। মুখের কথার চেয়ে মূল্য বেশি ঐ ভূষাকালির ছাপের! মানুষ মুখ দিয়ে খায়, মাকে মা বলে ডাকে, সন্তানকে আদর করে। সেই মুখের কথাই তো সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা যখন মুখে একবার বলেছে ভূস্বামীর ক্ষেতে কাজ করতে যাবে, তখন যাবেই।

তুই কেনে বিক্রি হলি ভাই?

তিনজনেরই উত্তর প্রায় কাছাকাছি। সেই নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র হারানো, জঙ্গলে শিকার করতে গেলে বনরক্ষীদের তাড়া খেয়ে ফিরে আসা, অনাহার। অত্মবিক্রয়ের অর্থ স্ত্রী-সন্তানদের হাতে দিয়ে এলে তারা রাজকর পরিশোধ করে কৃষিক্ষেত্র ফেরত পাবে। অন্নদায়িনী বরেন্দি মা হয়তো অন্তত পরিজনদের বাঁচিয়ে রাখবে অন্ন যুগিয়ে।

তারা এইসব ভাবে আর দিনের পর দিন পথ চলে।

একদিন রাজপুরুষদের বেশ নির্ভার দেখা যায়। সেদিন পথিমধ্যে সূর্যাস্ত ঘটে গেলেও রাজপুরুষদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা যায় না। কারণ রাস্তায় তখনো অনেক মানুষের চলাচল চোখে পড়ে। আর একটু পরেই তিন কৈবর্ত ও বালক পপীপ যা দেখতে পায়, তাতে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিরাট দরজা পেরিয়ে তাদের শকট প্রবেশ করে প্রাচীরঘেরা এক গ্রামে। কিন্তু এ কেমন গ্রাম! রাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিন্তু এই গ্রামে তা বোঝার উপায় নেই। সমস্ত গ্রাম আলোতে ভেসে যাচ্ছে যেন। বিশাল বিশাল বাড়ি। সেসব বাড়ি তাদের কৈবর্ত-ঝুপড়ির মতো মাটি বা পাতার তৈরি নয়। সেগুলো ইষ্টকের অট্টালিকা। কী তাদের শোভা! বড় বড় মশাল জ্বলছে চারপাশে। কয়েকটা বাড়ির চূড়া আবার মশালের আলো পড়ে এমন ঠিকরানো রূপ নিয়ে চকচক করছে! ওগুলো কি সোনা? চূড়াগুলো কি সোনা দিয়ে মোড়ানো? আবার পথের দিকে তাকিয়ে তারা আরও অবাক। তাদের কাছে পথ মানে তো ভূমিরই একটা অংশ। উঠোনের মতো, কৃষিক্ষেত্রের মতো, পথও তো মাটিরই আরেক রূপ ছাড়া কিছু নয়। লোকের অব্যাহত চলাচলে একটা রেখা পড়ে গেছে শুধু। অথচ এই গ্রামের পথ মাটির পথ নয়। ইটবাঁধানো পথ। বিহ্বল পপীপ প্রশ্ন করে তিন স্বজাতিকে– জ্যাঠা, ইটো কি স্বরগ?

তারাই বা কী উত্তর দেবে বালককে! নিজেরা জানলে তো!

শকটচালক হাসে তাদের দিকে তাকিয়ে। একজন রাজপুরুষ বলে– স্বর্গই বটে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গভূমি। মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজধানী। গৌড়।

এ কেমন জায়গা! রাত নামলে নিঝুম হয়ে যায় সব কৈবর্তগ্রাম। পুরো বরেন্দি। কোনো ঘরে অত করঞ্জের তেল নেই যে আলো জ্বলবে। সাঁঝের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরপরই অন্ধকার এতই চেপে বসে যে অনেক সময় বনবিহারি পশুরা ভুল করে বন থেকে এসে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে কৈবর্তপল্লীতে। আর এখানে! আলোয় আলোয় দিন-রাত সমান হয়ে গেছে। রাতের বেলাতেও এত আলো যে মাটিতে সুঁই পড়লেও খুঁজে পাওয়া যাবে।

মানুষগুলোর চেহারাও সব অন্যরকম। মনে হয় মাটির ওপর হাঁটলেও তারা যেন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। মাটি যেন তাদের ছুঁতে পারে না। তাদের গায়ে-পায়ে-কাপড়ে কোথাও মাটির মিহি কণাটি পর্যন্ত লেগে নেই। তাদের পরনের ধুতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বড় সুন্দর ঢঙে পরা। গায়ে উড়নি। এখানে পুরুষদেরও উর্ধ্বাঙ্গে কাপড়। তাদের বরেন্দিতে কৈবর্ত-মেয়েরাই শুধু কাপড় পরে উর্ধ্বাঙ্গে। সেই কাপড়ও তো আর এদের মতো সুন্দর নয়। খালি কোনোরকমে গা ঢেকে রাখার মতো কাপড়। ক্ষেত থেকে কার্পাস তুলে এনে নিজেদের হাতে আর নিজেদের তাঁতে বোনা কাপড়। নিজেদের গাঁয়ে কোনোদিন বিপণী দেখেনি কোনো কৈবর্ত। কারণ বিক্রির জিনিসের জন্য হাট রয়েছে। দূরে দূরে হাট বসে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে। গ্রামের মধ্যে তাই কোনো দোকানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কৈবর্তরা। গাঁয়ের মধ্যে এক মানুষ পণ্য বিক্রি করবে আরেক মানুষের কাছে! এতো নীচ কর্মের কথা কোনো কৈবর্তের চিন্তাতেই আসবে না কোনোদিন। কিন্তু এখানে পথের দুই ধারে থরে থরে পণ্য সাজানো পণ্যবিথী। সবার কুলুঙ্গিতে নিজস্ব আলো। মানুষ অক্লেশে ক্রয়-বিক্রয়ে মত্ত। নিজেদের এই দুরবস্থার মধ্যেও তা দেখে ঘৃণা হয় বন্দি তিন কৈবর্তের। নগরীর পথগুলো অসম্ভব চওড়া। এর নামই বোধহয় রাজপথ। এই রাত্রিকালেও দেখা যাচ্ছে পথ কাঁপিয়ে ছুটছে ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য রথ। সে যেন স্বর্গের বাহন।

কৈবর্তদের অভিভূত দশা দেখে রাজপুরুষরা হাসে। হয়। এরকমই হয়। পৃথিবীর স্বর্গ, নগরকুলশিরোমণি গৌড় নগরীতে পা দিলে কত ভিনদেশী সভ্য পর্যটক পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। আর এরা তো বর্বর কৈবর্ত। এরা কীভাবে বর্ণনা করতে পারবে বরেন্দ্রী-রাজধানীর সৌন্দর্য! যে রাজধানীকে কবিশ্রেষ্ঠ সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণনা করেছেন– 'হেত্বাশ্বর, ক্ষেমেশ্বর, লোকেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্তি দ্বারা পবিত্রীকৃত, অবিরত শাস্ত্রপাঠমন্দ্রিত নানা মন্দির-বিহার ভূষিত, গঙ্গা করতোয়া অপূর্ণভবাবিধৌত "অরবিন্দেন্দীবরময় সলিল সুরভি শীতল" এই পুণ্যভূমি সাঙ্গবেদে বিচক্ষণ ভগবদ্ভবত বিপ্রবর ও সজ্জন অধিবাসীতে পূর্ণ নগরী' বলে, তার মর্মসৌন্দর্য কীভাবে অনুভব করবে পাষণ্ড কৈবর্তরা। তারা শুধুমাত্র অভিভূতই হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর তাদের চারজনকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি বড় প্রকোষ্ঠে। এটি প্রথম সার্থবাহর (প্রধান বহির্বাণিজ্য কর্মকর্তা) কার্যালয়। রাতে তাদের খেতে দেওয়া হলো পিষ্টক (পিঠা), ভাত, অলাবুর (লাউ) তরকারি, আর সবশেষে কূর্চিকা (ক্ষীর)। এত স্বাদের খাদ্য আগে কোনোদিন খায়নি পপীপ। সম্ভবত বয়স্ক তিন কৈবর্তও।

সকালে এলেন কায়স্থ (প্রধান করণিক) এবং কামরূপের ভূস্বামীর প্রতিনিধি। তারা মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে পাল সাম্রাজ্য থেকে। তাই শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। জনপ্রতি শুল্ক দুই দ্রম্ম। কামরূপের প্রতিনিধি অর্থ পরিশোধ করে ছাড়পত্র নিল কায়স্থের কাছ থেকে। তারপরে আবার যাত্রা শুরু।

এবার সঙ্গে কোনো রাজপুরুষ নেই। চারটি ঘোড়ার পিঠে চারজনকে তুলে নিল কামরূপের লোকেরা। নগরপ্রাকারে আবার দেখাতে হলো ছাড়পত্র।

তারপর বাতাসের বেগে ছুটল অশ্ব। পপীপ আতঙ্কে বিমূঢ়। এমন গতির সঙ্গে সে পরিচিত নয়। তার ভয়, কখন পড়ে যায় ঘোড়ার পিঠ থেকে। কিন্তু তাদের সঙ্গী অশ্বচালকরা অসাধারণ দক্ষ। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই বায়ুবেগে ছুটে চলল অশ্ব। সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে পুণ্ড্রনগর। নগরে প্রবেশ করল না তারা। নগর উপকণ্ঠের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করে প্রত্যূষে আবার যাত্রা শুরু। মধ্যাহ্নে তারা এসে পৌঁছাল কূল না দেখতে পাওয়া একটা নদীর সামনে। লোকেরা বলাবলি করছে এই নদীর নাম ত্রিস্রোতা। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। তাই এদেশের মানুষের কাছে পৃথিবীর শেষ সীমা এই নদী। বরেন্দির কৈবর্তরা এই নদীর নাম শুনেছে। কিন্তু চোখে দেখেছে এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারা জানে এই নদী তাদের কাছে এক নিষেধের প্রতীক। নদীর ঐ পার ওলান ঠাকুরের রাজ্য নয়। তাই নদী পার হওয়া মানে কৈবর্তজীবন থেকে বিদায় নেওয়া। কিন্তু এখন এই নদী পেরিয়েই কামরূপে যেতে হয় আত্মবিক্রিত মানুষগুলোকে। রাজপুরুষদের কাছে এই নদী কেবল একটা নদীই। এটাই দুই রাজ্যের সীমান্তরেখা।

ঘোড়া থেকে নেমে নৌকায় ওঠার সময় আরও বেশি কুঁকড়ে যায় পপীপসহ চার কৈবর্ত। তারা শেষবারের মতো ফিরে ফিরে তাকায় নিজেদের লালমাটির দিকে, নিজেদের জাতির মানুষদের দিকে, নিজেদের সত্তার অংশগুলোর দিকে। যেন চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো চোখ দিয়ে ছেঁকে আত্মায় গেঁথে নিচ্ছে নিজের জল-ভূমি-আকাশকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর ছলাচ্ছল জল এসে বাড়ি খাচ্ছে নৌকার খোলে। বৈঠা ঝপাৎ করে নামছে-উঠছে একই ছন্দে নদীর জলে। সেই ছন্দোবদ্ধ শব্দ, নিয়মিত দুলুনি এবং নদীর বুক থেকে উঠে আসা বাতাসের স্পর্শে মুদে আসে ক্লান্ত পপীপের চোখ।

যখন চোখ মেলে, নিজেকে সে দেখতে পায় তাদের গাঁয়ের ঝুপড়ির মতোই এক ঝুপড়িতে। এক কৃশ কৈবর্তপুরুষের কোলে তার মাথা। তার চোখ থেকে ঝরছে অবিরল জল। প্রথমে পপীপের মনে হয়েছিল সে নিজেদের গ্রামে নিজেদের ঝুপড়িতেই শুয়ে আছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে সে আকুল হয়ে ডাকে– মা!

কৈবর্তপুরুষের কান্না আরও বেড়ে যায়। সে আরও কোমল হাতে বুকে টানে পপীপকে। তার মুখটিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে পপীপ– তুমি কে বটি?

পুরুষের নিঃশব্দ কান্না এবার বুকফাটা আর্তনাদে পরিণত হয়। সেই আর্তনাদের মধ্যেই সেই কণ্ঠে জমা হয়ে যায় পৃথিবীর সকল সুধা, সকল মমতা এবং সকল বেদনা। সেই কণ্ঠ বলে– বাপরে, আমি তোর বাবা!

০৩. রাজার বাড়ির ভিতরবাড়ি

মহা অমাত্য ভট্টবামনের দীর্ঘ দীঘল শরীরটা আরও উঁচু হতে হতে এতই উঁচুতে উঠে যায় যে তখন সম্রাটের প্রাসাদের আকাশস্পর্শী চূড়াকেও তার কাছে নিতান্তই অপর্যাপ্ত মনে হতে থাকে। এমনটি ঘটে মাঝেমাঝেই। বিশেষ করে সেই সময়টাতে, যখন ভট্টবামন থাকেন একাকী, যখন তিনি নিজের সাথে নিজে কথা বলার মতো পর্যাপ্ত অবকাশ হাতে পেয়ে যান, অথবা বড় কোনো নীতিনির্ধারণী সভায় নিজের মতামতকে সর্বদাই জয়যুক্ত হতে দেখেন, তখনই ভট্টবামন অনুভব করতে থাকেন যে তার নিজের শরীরটা বেড়ে উঠছে তড়তড় করে। আর তার মাথা উঁচু হয়ে চলেছে অন্য সকলের মাথা তো বটেই, চোখের দৃষ্টিসীমারও ওপরে। নিজের কাছে তখন ভট্টবামন নিজের মনটাকে উন্মুক্ত করে দেন। সেই উন্মুক্ত মন বলে যে এখানে, তার চারপাশে যারা আছে, তারা সবাই চক্ষুষ্মান অন্ধ। তা নাহলে ঠিকই দেখতে পেত পাল সাম্রাজ্যের সত্যিকারের অধীশ্বর কে। বর্তমানেই বা কে, আর অতীতেই বা কে ছিল, আবার ভবিষ্যতেই বা কে হবে! লোকে জানে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের উত্তরপুরুষরা হচ্ছেন এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কিন্তু পালরাজারা আসলে নামমাত্র রাজা। পাল সাম্রাজ্য গঠন করা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকিয়ে রাখা এবং বিকশিত করার ক্ষেত্রে ভট্টবামনের বংশীয় ব্রাহ্মণরাই সবসময় প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছেন। মহত্তম সম্রাট গোপালদেবের বংশের সবচেয়ে উজ্জ্বল উত্তরপুরুষ যেমন পাল সাম্রাজ্যের অধিকর্তা হয়ে থাকেন, তেমনই ভট্টবামনদের বংশের প্রত্যেক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে থাকেন এই সাম্রাজ্যের মহাঅমাত্য। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালের মহামাত্য ছিলেন ভট্টবামনের বংশের পূর্বপুরুষ গর্গদেব। দেবপালের সময় গর্গদেবপুত্র দর্ভপানি। দর্ভপানির মৃত্যু হলে তৎপুত্র সোমেশ্বর এবং পৌত্র কেদার মিশ্র। বিগ্রহ পালের সময় মহামাত্যের দায়িত্ব পালন করেছেন কেদার মিশ্রর পুত্র গুরব মিশ্র। আর বর্তমান মহারাজার সময় আমি, এই ভট্টবামন। লোকে মনে করে, পাল সম্রাটরা নিয়োগ দেন তাদের মহাঅমাত্যকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে? সেকথা মনে করে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে যায় ভট্টবামনের। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে মহামাত্য ভট্টবামনের দয়া এবং অবদানেই আজকে সিংহাসনে আসীন হতে পেরেছেন মহারাজ মহীপাল। চেদীরাজকন্যা যৌবনশ্রী-র গর্ভজাতপুত্র মহীপালকে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন ভট্টবামন। তার দুই বৈমাত্রেয় ভাই রাষ্ট্রকূটবংশীয় রানী শঙ্খদেবীর দুই পুত্র শূরপাল এবং রামপাল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে মহীপালকে সরিয়ে নিজেরা সিংহাসনে আসীন হতে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিলেন যে মহীপালের পাশে ছিলেন স্বয়ং ভট্টবামন। আর ভট্টবামন যে পক্ষে থাকবেন, সেই পক্ষই যে জয়লাভ করবে, সেকথা অন্ধ কিংবা খঞ্জ কিংবা গণ্ডমূর্খেরও জানার কথা। কিন্তু জানা ছিল না শঙ্খদেবীর দুই পুত্র শূরপাল-রামপালের। সে কারণেই আজ তারা অন্ধকার কারাগারে, আর সিংহাসনে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো শোভমান মহীপাল। শূরপাল-রামপালের মন্ত্রণাগুরু শঙ্খদেবীর ভাই মথন দেবের উদ্দেশ্যে মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন ভট্টবামন– একপুরুষের মেধা দিয়ে সিংহাসন জয় করা যায় না মথন দেব! কোথায় পাবে তুমি আমার মতো পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ আর বংশগত মেধা!

সেই বংশানুক্রমিক মেধার গুণেই এখন পাল সাম্রাজ্যে কথা যা বলার, বলেন ভট্টবামন। রাজা কেবল সায় দেবার কর্তা।

ভট্টবামনের সব কথায় সায় না দিয়ে মহারাজ মহীপালেরও উপায় নেই। তার পিতা সম্রাট বিগ্রহ পাল বেঁচে থাকতেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল সিংহাসন নিয়ে। তার বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না মহীপাল। তার ধারণা ছিল বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে তিনিই হতে যাচ্ছেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। চিরকাল সেটাই হয়ে এসেছে পাল বংশে। যদি কোনো সম্রাট অপুত্রক অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা যান, তাহলে সেক্ষেত্রে রাজা হবেন সম্রাটের ভ্রাতা। তিনি হবেন কুমার রাজা। আর্যনীতি এটাই। কিন্তু বিগ্রহ পালের ওপর তার ছোট পত্নী রাষ্ট্রকূটবংশীয়া শঙ্খদেবীর প্রভাব ছিল খুব বেশি। এতই বেশি, যে মহারাজ বিগ্রহ পাল তার কনিষ্ঠা মহিষী শঙ্খদেবীর কথায় উত্তরাধিকারী হিসাবে মহীপালের পরিবর্তে শূরপালের নাম ঘোষণা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খদেবীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চলছিলেন তার ভাই মথন দেব। সেই সময় তৎপর হয়ে উঠলেন ভট্টবামন। রাজার অন্তিম ইচ্ছাপত্র চুরি করে ধ্বংস করতে না পারলে আজ মহীপাল রাজা হতে পারতেন না। সময়মতো ভট্টবামনের চাণক্যবুদ্ধি না পেলে মহীপালকে আজ সিংহাসনের পরিবর্তে হয়তো শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রহর গুণতে হতো অন্ধকার কারাগারে, কিংবা কপর্দকশূন্য অবস্থায় নির্বাসিত হতে হতো পাল সাম্রাজ্য থেকে। তাই ভট্টবামনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই মহীপালের। সেই কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি আস্থার কারণে ভট্টবামনের পরামর্শ ছাড়া একধাপও ফেলতে রাজি নন মহীপাল। ভট্টবামনের পরামর্শেই মহাসান্ধিবিগ্রহিক (পররাষ্ট্র ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠাবিষয়ক মন্ত্রী) হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পদ্মনাভকে। মহাপ্রতিহার (প্রধান সেনাপতি) হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন কীর্তিবর্মা। পদ্মনাভ যথার্থই বিদ্বান এবং সজ্জন মানুষ। পার্শ্ববর্তী অন্য দেশ, অন্য রাজ্য এবং গৌড়ের সামন্তরাজ্যগুলির অধিপতিদের কাছে সকল ধরনের আলোচনার জন্য খুবই গ্রহণযোগ্য মানুষ। এমনকি মহীপাল এবং ভট্টবামনের বিরোধীরা পর্যন্ত ব্যক্তি পদ্মনাভকে পছন্দ করে। যথার্থ বিবেচক ব্যক্তি বলে শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে পদ্মনাভকে যতটা কাজ করতে দেওয়া হয়, নিজের দেশের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দূর করার কাজে পদ্মনাভকে তেমন কাজ করতে দিতে আগ্রহী নন ভট্টবামন। পাল সাম্রাজ্যে তো শুধু হিন্দু আর বৌদ্ধদের বাস নয়। এই রাজ্যে আছে কত শত জাতির মানুষ। কোল আছে ভীল আছে শবর আছে পুলিন্দ আছে। আছে কৈবর্ত, কোচ, রাজবংশী, মেচ, হাড়ি– আরও কত বিচিত্র জাতি আর ধর্মের মানুষ। কোনো-না-কোনোভাবে তারাও এখন এই রাজ্যেরই প্রজা। উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধদের যেসব অধিকার দেওয়া হয়, সবটুকু না হলেও পদ্মনাভ চান, তাদেরও কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দান করতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ছাড় দিতে সম্মত নন ভট্টবামন। তিনি যেটা বোঝেন, পদ্মনাভ তা বোঝেন না। আর্যরা তো এই অঞ্চলে এসেছে এইসব জাতিগোষ্ঠীগুলির ওপর আধিপত্য চালাতেই। এই ভূমির প্রাকৃত অধিবাসীদের দায়িত্বই তো হচ্ছে আর্যদের দ্বারা শাসিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া আর তাদের সেবা করা। আর্যদের সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের সকল দুর্দশা মেনে নেওয়া। কারণ আর্যরা এই দেশে না এলে এখনো ওরা থাকত আদিম জীবনের মধ্যে। জানতেই পারত না সভ্যতা কাকে বলে। ওদের অনেকেই এখনো আদিম জীবনেই রয়ে গেছে। কিন্তু অনেকেই তো আর্যসভ্যতার পবিত্র ছায়াতলে এসে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছে। ধীরে ধীরে একসময় সবাই আর্যসভ্যতার বোধিবৃক্ষের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবে। তাদের শরীর-মন-চিন্তা থেকে মুছে যাবে নিজেদের অনার্য জন্মচিহ্ন। ততদিন পর্যন্ত তাদের নিয়তি হচ্ছে শাসিত হওয়া। যতদিন তারা নিজেদের দেব-দেবী নামক পুত্তলিকাগুলি ছেড়ে, বৃক্ষ-পশু-সর্প-সূর্য-কুম্ভীর সবাইকে পূজা করা ছেড়ে আর্য দেবতাদের শরণ না নেবে, ততদিন তাদের কোনো অধিকার প্রদান করা যাবে না।

ভট্টবামনের কথার ওপরে কোনো কথা চলে না। তাই পদ্মনাভকে, তার সকল শুভচিন্তা এবং মানবিকতার ধারণাগুলো নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। কীর্তিবর্মার এধরনের কোনো সমস্যা নেই। তার কাছে ভট্টবামনই শেষ কথা। তার পূর্বপুরুষ আদতে কামরূপ থেকে এদেশে এসেছেন। বিশালদেহী মানুষ। কেউ কেউ বলে তার বুদ্ধি-শুদ্ধিও তার দেহের মতোই মোটা। তবে লোকটার একটা গুণ আছে। কথা কম বলেন। কীর্তিবর্মা মহাপ্রতিহার হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে কোনো বড় যুদ্ধে জড়িত হতে হয়নি পালসৈন্যদের। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রচালনা এবং সৈন্য পরিচালনায় তার দক্ষতা কেমন, সেই বিষয়টি অদ্যাবধি পরীক্ষিত হতে পারেনি। কেউ কেউ তার এই যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু ভট্টবামন তাদের কথায় কান দেন না। কারণ লোকটা সম্রাটের প্রতি কতখানি অনুগত তা জানা না গেলেও ভট্টবামনকেই যে তিনি দেবতা বলে মানেন তা অন্তত ভট্টবামন জানেন। তাছাড়া তার আরেকটি গুণ দৃষ্টি কেড়েছে ভট্টবামনের। তা হচ্ছে লোকটার নিষ্ঠুরতা। শত্রু ও বন্দিদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন কীর্তিবর্মা যে তা দেখে যে কোনো সংবেদনশীল মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এমন লোককে কে কাছছাড়া করতে চায়! তাই কীর্তিবর্মার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও ভট্টবামনের আশীর্বাদে কীর্তিবর্মাই এখন পাল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতিহার।

মহারাজা মহীপালের সাথে এই তিনজনকে মিলিয়ে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিষদ। তবে আসল সত্য কেউ কেউ অন্তত জানে। মহীপাল হচ্ছেন সিংহাসনে বসার রাজা। আর দেশ চালানোর আসল রাজা ভট্টবামন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রপরিচালনার সবটুকু ক্ষমতাই মহামাত্য ভট্টবামনের হাতে। মহীপাল সিংহাসনে আরওহণের এক বছরের মধ্যেই কেন্দ্র এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে ভট্টবামনের নিজের লোক নিযুক্ত হয়েছে। যেখানে পেরেছেন সেখানে প্রথমে নিয়োগ দিয়েছেন নিজের পরিবারের সদস্যদের। আত্মীয় না পেলে নিজস্ব একান্ত বাধ্যানুগত লোক। ভাণ্ডারিক (রাজকোষাধ্যক্ষ) তাঁর ভাইপো, পুস্তপাল (প্রধান ভূমি অধিকর্তা) তাঁর আরেক ভাইপো। তাঁর ছোটভাই এখন পালসাম্রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণিক (প্রধান বিচারপতি)। এছাড়া ছোট-বড় সকল মণ্ডল (জেলা), ভুক্তি (প্রদেশ)– সব জায়গার প্রধান পদগুলিতে তাঁর নিজের লোক। পাল সম্রাটের সামন্ত রাজ্য এগারোটি। তার মধ্যে কোটাটবী, বালবলভী, অপরমন্দার, কুজবটি, তৈলকম্প, উচ্ছাল– এই ছয়টি অঙ্গরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত রাজা অর্থাৎ করদ রাজা, ভট্টবামনের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ। অন্য পাঁচটির শাসক তার সতীর্থ। একই গুরুর কাছে শৈশবে-কৈশোরে এবং যৌবনে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা। সেই অর্থে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই তার নিজের লোক। অবস্থা এখন এমন যে মহামাত্য একবার শুধু আঙুল নাড়াবেন, সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠবে পালসাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত। আঙুল থামাবেন তো থমকে যাবে সবকিছু।

ভট্টবামনের অশান্তির জায়গা শুধু একটাই। বরেন্দ্রী। কৈবর্তদের সাথে তিনি ঠিক মনের মতো করে এঁটে উঠতে পারেননি। আসলে কৈবর্ত জাতিটিকে তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন না। এমনকি তাঁর পিতা-পিতামহ, যাদের কূটবুদ্ধির খ্যাতি জগৎজোড়া, তারা কেউ-ই কৈবর্তদের ব্যাপারে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৈবর্তদের এমনিতে মনে হয় খুবই শান্তিপ্রিয়। নিজেদের জীবন, নিজেদের ধর্ম, নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের আনন্দ-বেদনা নিয়ে নিজেরাই মগ্ন থাকে। বরেন্দি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। এমনকি নিজেদের প্রতিবেশী অন্যান্য আদিবাসী কৌম যেমন কোল, ভিল, শবরদের সঙ্গেও ওদের তেমন একটা মাখামাখি নেই। চাষ-বাস করে, মাছ ধরে, বনে বনে শিকার করে, যা জোটে খায়, না জুটলে না খায়। তারা যেমন অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায় না, তেমনই অন্য কেউ তাদের মধ্যে নাক গলাবে, এটাও সহ্য করে না। সচরাচর রাজার নামে যেসব নির্দেশ পাঠানো হয়, তারা সেগুলি ঠিকমতোই মেনে চলে। কোনো নির্দেশ বা রীতি তাদের মনমতো না হলে সে ব্যাপারে মোড়লদের পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তাদের যদি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মেনেও নেয়। আর একবার মেনে নিলে তা পালন করে আমৃত্যু। কিন্তু কী কারণে যে হঠাৎ হঠাৎ তারা ফুঁসে ওঠে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। অতীতের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘেঁটে ভট্টবামন দেখেছেন, মহারাজ ধর্মপালের সময় একবার কৈবর্তরা বিদ্রোহ করেছিল। সেই ধর্মপাল, যার শৌর্য-বীর্যের কাছে নতি স্বীকার করেছিল আর্যাবর্তেরও শত শত রাজা। কিন্তু সেই মহাবলী মহারাজ ধর্মপালের দুর্ধর্ষ জগৎজয়ী সৈন্যদলও টিকতে পরেনি কৈবর্তদের সামনে। বরেন্দি থেকে কৈবর্তরা তাড়িয়ে দিয়েছিল রাজ-নিয়োজিত সকল কর্মচারিকে। সোজা জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের বরেন্দিতে যদি কোনো রাজকর্মচারি রাখতে হয়, তাহলে তাদের প্রধান হিসাবে রাখতে হবে একজন কৈবর্তকে। অর্থাৎ বরেন্দির প্রাদেশিক প্রধান অমাত্য হবে একজন কৈবর্ত। একমাত্র তার আদেশই মানবে কৈবর্তরা। অনেকদিন ধরে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে কৈবর্তদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পালসম্রাটের জগৎজয়ী সৈন্যদল এই কাজে নেমে নিজেদের লোক হারানো এবং সুনাম হারানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। তাদের বারংবার নাকানিচুবানি খাইয়েছে কৈবর্তরা। যুদ্ধে নেমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে রাজকীয় সৈন্য আর সেনাপতিরা। কৈবর্ত-যোদ্ধাদের সাহসের কোনো তুলনা নেই। সাহস তো সকল আদিম জাতির মানুষের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু তারা তো বার বার পরাজিত হয়েছে উন্নত অস্ত্র আর প্রশিক্ষিত সেনাদলের কাছে। আদিবাসীদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সম্পদ চিরকালই সীমিত। যুদ্ধ চালাতে চালাতে একসময় অস্ত্রের সরবরাহ নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের। তখন তারা মেনে নিতে বাধ্য হয় পরাজয়কে। কিন্তু কৈবর্তরা বছরের পর বছর বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে পারে। আর তাদের অস্ত্রেরও কোনো শেষ নেই। কোত্থেকে পায় তারা এত অস্ত্রশস্ত্র! গুপ্তচর পাঠিয়ে পরে জানা গেছে যে বরেন্দিতে লৌহখনি আছে বনের মধ্যে। সেসব লৌহখনির সন্ধান কৈবর্তরা জানায় না অন্য কাউকে। তারা খনি থেকে লৌহ নিষ্কাসনের পদ্ধতিও জানে। এবং আকরিক গলিয়ে নিজেদের অস্ত্র নিজেরাই তৈরি করতে পারে। তাই যুদ্ধের সময় তাদের অস্ত্রের কোনো ঘাটতি পড়ে না। রাজার সৈন্যদল আর কতদিন নিজেদের মানুষের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে! নিজেদের রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে বাইরের শত্রুর সাথে লড়তে যাবে কে! শেষ পর্যন্ত তাই ধর্মপালের মৃত্যুর পরে মহারাজাধিরাজ দেবপালকে কৈবর্তদের শর্ত মেনেই যুদ্ধবিরতি করতে হয়েছিল। সেই শর্ত অনুসারে তখন থেকে বরেন্দির প্রাদেশিক অমাত্য পদে বসাতে হয় একজন কৈবর্তকে। তাকে আবার গৌড়ের প্রাসাদ থেকে ইচ্ছামতো নিয়োগ দেওয়া যায় না। সেই অমাত্যকে মনোনীত করে কৈবর্তরাই। কৈবর্তদের মোড়ল-মণ্ডলরা দশ বছর পর পর সভা করে যাকে মনোনীত করবে, মহারাজা তাকেই নিয়োগ দেবেন প্রাদেশিক অমাত্য হিসাবে। সেই প্রক্রিয়ায় এখন বরেন্দির প্রাদেশিক অমাত্য দিব্যোক। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা আবার আগের সবগুলি কৈবর্ত অমাত্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। শিক্ষাদীক্ষাও বেশি। দেবভাষা সংস্কৃত অবশ্য সে জানে না। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ সংস্কৃতভাষা লিখতে-পড়তে শিখে ফেলবে এমন অরাজকতার আশংকা এখনো পালসাম্রাজ্যে দেখা দেয়নি। তবে দিব্যোকের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন এক আর্য-ব্রাহ্মণ দেবভাষার সকল নীতি-রীতি ভালোভাবে পাঠ করে জানিয়ে দেয় দিব্যোককে। ফলে যে কোনো রাজকীয় আদেশের মর্মার্থ সে বুঝতে পারে পরিষ্কার। পদ্মনাভ আবার সেই দিব্যোকের গুণমুগ্ধ। শোনা যায় পদ্মনাভের আনুকূল্যে সে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও নাকি পাঠ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু আয়ত্ত করে ফেলেছে। ভট্টবামন প্রচণ্ড ঘৃণা করেন দিব্যোককে। প্রথম কারণ, দিব্যোককে নিয়োগ করা বা অব্যাহতি দানের ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকটিকে তিনি ক্রয় করতে পারেননি। ভট্টবামন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, কৈবর্তদের কেউ কোনো পদ লাভ করে রাজঅমাত্যদের সংস্পর্শে এসে আর্যদের জীবনযাপন দেখলে তাদের মতো হয়ে উঠতে চায়। তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় আর্যসভ্যদের অনুকরণ করা। তারা নিজেদের গোত্রের কথা ভুলে শাসকদের মতো হয়ে উঠতে চায়। তারা কথা বলতে চায় শাসকদের মতো, ভাবতে চায় শাসকদের মতো, এমনকি স্বপ্নও দেখতে চায় শাসকদের অনুকরণে। তারা তাদের গোত্র-জীবনের কথা ভুলে যেতে চায়। এমনকি ঘৃণাও করতে শুরু করে নিজ জাতির অসভ্যদের। তারা সবসময় যেন লজ্জিত হয়ে থাকে নিজেদের জন্মগত কৈবর্ত পরিচয় নিয়ে। আগের প্রায় সবগুলি কৈবর্ত অমাত্যের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটতে দেখা গেছে। সেই সঙ্গে কিছু স্বর্ণমুদ্রার ঝলকানি দেখামাত্র তারা ক্রীতদাস হয়ে যেত আর্যদের। তাদের বিলাসীজীবনে ডুবিয়ে রাখার জন্য গৌড় থেকে সরবরাহ করা হতো উৎকৃষ্ট মদ আর উদ্ভিন্নযৌবনা বারাঙ্গনা। যেসব মদ পাঠানো হয়, সেগুলি ঝোলাগুড়ের তৈরি মদ নয়। এগুলি নৌপথে আসে অনেক দূরের দেশ থেকে। উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষার মদ। আর যেসব বারাঙ্গনা তরুণীদের বেছে বেছে পাঠানো হয়, তারা তো উর্বশী-মেনকা-রম্ভার প্রতিযোগিনী। কাঁচা হলুদের সঙ্গে সোনার জল মেশালে যেমন হয়, সেইরকম গাত্রবর্ণ তাদের। সেই বারনারীদের সংস্পর্শে আসামাত্র তাদের পদলেহী কুকুর হয়ে উঠত অসভ্য কৈবর্তদের প্রতিনিধি। সেই মেয়েদের মুখ থেকে শুধু কথা পড়ার অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্ত-অমাত্য নির্দ্বিধায় স্বজাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পালসম্রাটের পক্ষে কাজ করে যেত। কিন্তু দিব্যোক! শোনা যায় অন্য কৈবর্তদের মতো সে-ও সোমরসে আসক্ত। কিন্তু দেশী ধেনো ছাড়া সাগরপারের দ্রাক্ষারসসুধা কোনোদিন ছুঁয়েও দেখেনি। আর অপ্সরাদের দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই প্রণাম জানিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাজকীয় অতিথিভবনে সূর্যাস্তের পরে বসে সঙ্গীত-নৃত্য-দ্রাক্ষা-সুন্দরীদের উৎসব। কিন্তু দিব্যোক একদিনও পা রাখেনি অতিথিভবনের উৎসবে। প্রাদেশিক প্রধান অমাত্য না এলে আর কার জন্য পেতে রাখা হবে এই ব্যয়বহুল কূট-উৎসবের জাল! সুন্দরীরা নিজেদের সৌন্দর্যের অবমাননায় ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে এই পাণ্ডববর্জিত বরেন্দি ছেড়ে চলে গেছে আর্য-বসতিগুলিতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল উৎসব-ঘরে বাতি জ্বালানোর লোক পর্যন্ত নেই। দিব্যোক নিজে তো জালে পা দেয়-ই নি, কোনো কৈবর্ত-মোড়লকেও পা দিতে দেয়নি রাজকীয় ফাঁদে। তার ফলে যা হয়েছে, বরেন্দি এখন নামেমাত্র পালসাম্রাজ্যের অংশ। প্রকৃতপক্ষে সেখানকার শাসনক্ষমতার প্রায় পুরোটাই এখন কৈবর্তদের হাতেই। বিভিন্নভাবে জাল বিছিয়ে কৈবর্তদের যে নানাভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভট্টবামনের ধারণা, এটিও দিব্যোক বেশ পরিষ্কারই বুঝতে পারছে। যেমন বরেন্দিতে দাদন-ব্যবসায়ী পাঠিয়ে কৈবর্তদের যে ঋণভারে জর্জরিত করা হচ্ছে, তা বেশ পরিষ্কার দিব্যোকের কাছে। সাম্রাজ্যের রীতি অনুযায়ী সে দাদন ব্যবসায়ীদের কাজে বাধা দিতে পারে না। কারণ তারা রাজকীয় অনুমোদন নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে। তাই দিব্যোক পরোক্ষ পথ ধরেছে। সে কৈবর্তদের সবসময় ঋণগ্রহণে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। অন্য দেশের ব্যবসায়ী-ভূস্বামীদের কাছে আত্মবিক্রয় করে কৈবর্তদের অনেকেই দেশান্তরী হচ্ছে, এটিও তার ভীষণ অপছন্দের। বিশেষ করে এর ফলে কৈবর্ত জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে বরেন্দিতে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকরা কৈবর্তদের ধর্মান্তর করার চেষ্টা করে থাকে। এই কাজটিও দিব্যোকের পছন্দ নয়। এদের কাজ মহারাজার অনুমোদিত। তাই দিব্যোক সরাসরি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টিতে তার চেষ্টার কমতি নেই। কৈবর্তদের মধ্যে নিজের লোক দিয়ে যতদূর সম্ভব, সচেতনামূলক প্রচারণা চালায় দিব্যোক। তাদের নিজেদের ভালো-মন্দ বোঝানোর চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত।

এমন লোককে পছন্দ করার উপায় কোথায় ভট্টবামনের! বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে দিব্যোকের চেষ্টা ধীরে ধীরে হলেও ফলবতী হয়ে উঠছে।

কৈবর্তরা এখন দাদন নেওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আত্মবিক্রয়ের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে আগের তুলনায়। বরং কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে বরেন্দিতে। গো-শকট বোঝাই করে বরেন্দি থেকে ধান আনার সময় বনপথে লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে সেই ধান। বরেন্দিতে যেসব সৈন্য ও রাজকর্মচারি পাঠানো হতো, আগে তারা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারত কৈবর্তদের সাথে। বিষ্টি (বাধ্যতামূলক শ্রমদান, বেগার)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য ইচ্ছামতো কৈবর্ত পুরুষ ও বালকদের ধরে আনা যেত। রাজপুরুষদের দৃষ্টির লালসা কোনো কৈবর্তযুবতীর প্রতি একবার নিক্ষেপিত হলে তার আর নিজেকে রক্ষার কোনো উপায় ছিল না। এইসব কারণে চাকুরিস্থল হিসাবে বরেন্দি রাজকর্মচারিদের কাছে পূর্বে ছিল লোভনীয় স্থান। কিন্তু এখন খবর আসছে, কৈবর্তরমণীর প্রতি কুদৃষ্টি প্রদানের অপরাধে পিটুনি দেওয়া হচ্ছে, কোনো কোনো লোকের চোখ গেলেও দেওয়া হয়েছে, এবং হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে কয়েকজন রাজপুরুষকে। যদিও দিব্যোকের লোকেরা বাইরে বাইরে বলছে যে এগুলো গুপ্তহত্যা। দোষী ব্যক্তি অর্থাৎ খুনী ধৃত হলে তাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদান করা হবে। কিন্তু কেউ ধরা পড়ে না। কাউকে ধরলেও সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। ফলে এখন বরেন্দিতে নিয়োগ পেতে রাজপুরুষ ও কর্মচারিদের প্রচণ্ড অনীহা। এসবের সঙ্গে দিব্যোক নতুনভাবে আবার কৈবর্তদের আদি পূজা-পার্বন-উৎসবগুলি ধুমধামের সঙ্গে চালু করে দিয়েছে। বিশেষ করে বছরে দুইবার শিকারের উৎসবে এখন সব কৈবর্ত নারী-পুরুষ এমনকি শিশুদেরও যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক অমাত্যের জন্য দেহরক্ষীরূপে কাজ করার জন্য একশত জন সুদক্ষ সৈনিক পাঠানো হয়ে থাকে। দিব্যোকের জন্যও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে মহাবলী আর্য সৈন্যদের ফেরত পাঠিয়েছে। উল্টো তাদের জন্য যে রাজকীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়, সেই অর্থ দিয়ে দিব্যোক নিজের জাতির মধ্য থেকে সুদেহী সুঠাম একশত জন যুবককে নিযোগ করেছে। শিকার উৎসবের সময় এরাই কৈবর্তদের নেতৃত্ব দান করে। এ যে আসলে কৈবর্তদের যুদ্ধ-মহড়া আর অস্ত্রগুলিকে শান দিয়ে রাখা, একথা বুঝতে ভট্টবামনের বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। সব মিলিয়ে বরেন্দি এখন মহারাজ, বিশেষ করে মহামাত্যের কাছে, দুশ্চিন্তারই আরেক নাম। বরেন্দি নিয়ে মাসের পর মাস একাধিক মন্ত্রণা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে গোপনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কৈবর্তদের অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে রাখতে হবে সবসময়। এই কাজে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে ধর্মসহ সকল অস্ত্র।

০৪. রাজার আদেশ এসেছে...

রানীমা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। বরেন্দির দেদ্দাপুরে মন্দির নির্মাণের জন্য স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তাকে আদেশ করছেন। ভগবান যখন দেখা দেন– তা সেই দেখা স্বপ্নেই হোক আর বাস্তবেই হোক– তখন বুঝতে হবে যে দেখা দিয়েছেন সাক্ষাৎ ভগবানই। কেননা কোনো অসুর ছলনা করে স্বপ্নে বা বাস্তবে, কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েই, ভগবান বিষ্ণুর রূপ ধারণ করতে পারে না। কাজেই স্বপ্নের আদেশ আর বাস্তবের আদেশ একই কথা। দেদ্দাপুরের কৈবর্তদের আবার একটা প্রত্যুষ শুরু হয় রাজপুরুষের ট্যাঁড়া শুনে।

শুন হে কৈবর্ত জাতির মানুষেরা! পরমসুগত গৌড়াধিপতি মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের প্রধানা মহিষী স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণের। দেদ্দাপুরে নির্মিত হবে সেই মন্দির। সেই প্রস্তাবিত মন্দিরের সেবায়েত ও পুরোহিত হয়েছেন ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি শ্রীবৎসপালস্বামী মহাশয়। সেই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তোমাদের এই গ্রাম এবং সন্নিহিত অমুক অমুক গ্রাম প্রদান করা হয়েছে মহান সেবায়েতকে। তিনি এইসব গ্রামের অধিকারী হবেন 'শাশ্বতকালেলাপভোগ্যক্ষয়নীবি সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর' হিসাবে।

রানীমার স্বপ্নদর্শন আর রাজার পুণ্য অভিপ্রায় শুনে কৈবর্তদের মাথায় হাত। মন্দির হচ্ছে হোক। তা নিয়ে কৈবর্তদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মন্দিরের সেবায়েতের হাতে গ্রামগুলিকে তুলে দেওয়ার ফলাফল কৈবর্তদের জন্য ভয়ংকর। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে যে এই গ্রাম হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গ্রামের মানুষেরও হস্তান্তর। রাজাকে কর দিতে হয় বছরে একবার। যে ফসল তারা পায় তার ছয়ভাগের একভাগ। আর এখন কর দিতে হবে শ্রীবৎসপালস্বামীকে। সেই কর যে কত হবে কেউ জানে না। তাছাড়া জলাধার-অরণ্য-পশুচারণভূমি-গোবাটের জন্য রাজাকে কোনো কর দিতে হয় না। কিন্তু শ্রীবৎসপালস্বামী হয়তো এগুলো ওপরেও কর বসাবে।

তাছাড়া সেবায়েত শুধু কর আদায়ের অধিকারই পাননি, পেয়েছেন দণ্ডদানের অধিকারও। 'সহ্যদশাপরাধা'। দশটি অপরাধের জন্য দণ্ডদান এবং অর্থদণ্ড করার অধিকার এখন শ্রীবৎসপালস্বামীর হাতে। কী কী সেই অপরাধ? তিনটি অপরাধ কায়িক– চুরি, হত্যা এবং পরস্ত্রীগমন। চারটি অপরাধ বাচনিক– কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানমূলক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ। আর তিনটি মানসিক অপরাধ– পরধনে লোভ, অধর্মচিন্তা এবং অসত্যানুরাগ।

এইসব অপরাধে ইচ্ছামতো যাকে খুশি অপরাধী বানানো যায়। বিশেষ করে বাচনিক এবং মানসিক অপরাধের নামে যাকে-তাকে যখন খুশি অপরাধী সাজানো যায়। এখন থেকে মন্দিরের দোহাই দিয়ে শ্রীবৎসপালস্বামী এই চারটি গ্রামের অধীশ্বর। রাজার শাসন এখানে আর প্রত্যক্ষ নয়। ফলে সুবিচারের জন্য দিব্যোকের কাছে ধরনা দেওয়ার পথও এখন থেকে বন্ধ এই চারটি গ্রামের কৈবর্তদের জন্য। রানীমা দেখল স্বপ্ন, আর এই চারটি গ্রামের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে গেল শ্রী বৎসপালস্বামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০৫. ভূমি কাহার? রাজ্য কাহার?

সংঘারামে আজকের সন্ধ্যাটি আপাতদৃষ্টিতে অন্য যে কোনো সন্ধ্যার মতোই। কোনো ভিন্নতাই চোখে পড়ে না। ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়ায় আকাশের অনেকদূর পর্যন্ত আচ্ছন্ন। তার সাথে ঋতুজাত ফুলের সৌরভের মিশ্রণ।

ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোরণ পেরিয়ে সুশৃঙ্খল সারি তৈরি করে বাহিরে এলেন বিহারের সকল ভিক্ষু। তিনবার সশ্রদ্ধ প্রদক্ষিণ করলেন বুদ্ধস্তূপকে। ধূপের সুগন্ধি বিছিয়ে ফুলের অঞ্জলি অর্পণ করলেন পবিত্র স্তূপে। তারপর সকলে বিহারের চত্বরে বসলেন নতজানু হয়ে। সবচেয়ে সুকণ্ঠি ভিক্ষু মহাপ্রভু বুদ্ধের স্তবগান করলেন মধুর সুরে। দশ বা কুড়ি শ্লোকের স্তবগান। গান শেষ হলে আবার সবাই ফিরে যাবেন বিহারের মধ্যে যে যার সাধনপিঠে।

এই বিহারটি বেশ বড়। বিশালই বলা চলে। ঠিক কেন্দ্রস্থলে মহাবোধিসত্ত বুদ্ধের মানবাকার মূর্তি। মূল মন্দিরকে মৌচাকের বিন্যাসে ঘিরে আছে একশত সাতটি ছোট ছোট মন্দির। এগুলোর মধ্যে চুয়ান্নটি মন্দির বৌদ্ধ দেবতাদের পূজার জন্য। আর বাকি তিপ্পান্নটি গুহ্য তান্ত্রিক উপাসনার জন্য। এখানে আছেন একশত আটজন ভিক্ষুপণ্ডিত, যারা সবাই মহাযানপন্থী আচার্য। অন্যেরা বলী-আচার্য, প্রতিষ্ঠান-আচার্য, হোম-আচার্য।

এই বিহারের প্রধান আচার্য হরিভদ্র। আজ এই সূর্যাস্তের স্তবলগ্নে তার কক্ষে বসেছে মন্ত্রণাসভা। তবে খুব গোপনে। কারো মনে যাতে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেই কারণে বাহিরে নিয়মিত সান্ধ্যপ্রার্থনা চলছে নিখুঁত নিয়ম মেনে, সুচারুভাবে।

সার বেঁধে ভিক্ষুরা ফিরে এলেন বিহারে। তাদের একজন সূত্রপাঠক সিংহাসনে বসে সূত্রপাঠ শুরু করলেন। একটি সূত্রপাঠ শেষ হতেই শ্রোতারা একযোগে বলে উঠছেন– সাধু সাধু! সুভাষিত সুভাষিত!

আচার্য হরিভদ্র তার গবাক্ষপথে একবার তাকালেন সূত্রপাঠ ও সূত্রশ্রবণে মগ্ন ভিক্ষুদের দিকে। তারপর বন্ধ করে দিলেন গবাক্ষের কপাট। হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত করলেন ঘরে বসে থাকা বাকি মন্ত্রণাসঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ আলোচনা শুরু করা যেতে পারে এবার। পালসাম্রাজ্যের প্রধান পাঁচ বৌদ্ধবিহারের আচার্য আজ একত্রিত। হরিভদ্র, উপগুপ্ত, প্রিয়রক্ষিত, সুভদ্র, বিনয়পালিত। তারা প্রত্যেকেই চিন্তিত, বিষণ্ন এবং ক্রুদ্ধও। হরিভদ্র বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– ভ্রাতৃগণ, আপনাদের কি মনে আছে এই মাটিতে পা পড়েছিল স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের? আপনাদের কি মনে আছে অবদানকল্পলতার পৌণ্ড্রবর্ধণ ও সুমাগধা আখ্যান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই আখ্যানের উল্লেখমাত্র নয়ন সজল হয়ে উঠল পাঁচ ভিক্ষুর।

"পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে বিজন জেতকাননে সমাসীন বুদ্ধদেবের নিকট অনাথপিণ্ডদ আসিয়া বলিলেন– ভগবান! আমার কন্যা সুমাগধাকে পৌণ্ড্রবর্ধণবাসী সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনার অনুমতি পাইলে তাহাকে কন্যাদান করিতে পারি।

বুদ্ধদেব অনুমতি দান করিলেন।

বুদ্ধদেবের অনুমতি অনুসারে অনাথপিণ্ডদ বৃষভদত্তকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সুমাগধা যখন পতিগৃহে বাস করিতেছিলেন, একদিন তাহার শ্বশ্রূ তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে– সুমাগধা, তুমি সমস্ত পূজাপকরণ সজ্জিত করো। জগৎপূজ্যগুণ ভগবান জিন (জৈন ধর্ম প্রবর্তক) কল্য প্রাতে আমাদের গৃহে আগমন করিবেন।

পরদিন মুণ্ডিতকেশ ও সম্পূর্ণ নগ্ন জৈনগণকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া সুমাগধা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা মুখাচ্ছাদনপূর্বক খেদ ও নির্বেদবিনত হইয়া গুরুজন সমক্ষে শ্বশ্রূদিগকে বলিয়াছিলেন– ছিঃ! ছিঃ! দিগম্বরগণের সম্মুখে কুলবধূগণ রহিয়াছেন, এইরূপ আচার এই প্রথম দেখিলাম! এই শৃঙ্গহীন পশুগণ আপনাদের গৃহে ভোজন করিতেছে। ইহারা মনুষ্য নহে, সম্ভবত এই মনে করিয়াই বুঝি অঙ্গনাগণ ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিতা হন না।

সুমাগধা এই প্রকারে জৈনদের বহু দোষ-কীর্তন করিলে তাঁহার শ্বশ্রূ বিষণ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন– ভদ্রে তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা হইয়া থাকে তাহা বলো।

তিনি বলিলেন– আমার পিত্রালয়ে ভগবান বুদ্ধদেবের পূজা করা হয়। তিনি কারুণ্যবশত সমস্ত জগতের কুশল লাভের জন্য সতত উদ্যত থাকেন।

এইরূপে বুদ্ধের অশেষ গুণ বর্ণনা করিলে শ্বশ্রূ সুমাগধার নিকট বুদ্ধের দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলেন।

সুমাগধা ভক্তিভাবে বুদ্ধদেবকে আহ্বান করিলে বুদ্ধদেবের আসন টলিল। তিনি পুরোবর্ত্তী আনন্দকে বলিলেন– কল্য প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ড্রবর্ধণ নগরীতে যাইতে হইবে। সুমাগধা আমার ও মদীয় সঙ্ঘগণের পূজা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। পুণ্ড্রবর্ধন নগর এখান হইতে শতষষ্টি যোজনেরও অধিক, তথাপিও একদিনেই সেখানে যাইতে হইবে। এস্থলে বিলম্ব করা উচিত নহে। যে সমস্ত প্রভাবশালী ভিক্ষুগণ আকাশমার্গে যাইতে পারেন, তাঁহাদিগকেই তুমি নিমন্ত্রণশলাকা সমর্পণ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানাপ্রকার দেববেশ গ্রহণপূর্বক বিমান দ্বারা আকাশমার্গে গমন করিলেন।

সুমাগধার শ্বশুরাদিগণ সূর্যসম তেজস্বী একজন ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সুমাগধাকে বলিলেন– ইনিই কি ভগবান?

সুমাগধা বলিলেন– ইনি ভগবান নহেন। ইনি ভিক্ষু, অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

এইরূপে এক একজন ভিক্ষু বিমানমার্গে দেখা দেন, আর সুমাগধার শ্বশুরাদিগণ জিজ্ঞাসা করেন– ইনিই কি ভগবান?

সুমাগধা প্রণিধানপূর্বক দেখিয়া সেই ভিক্ষুর পরিচয় দেন।

অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্যের পর যথাক্রমে মহাকশ্যপ ভিক্ষু, ভিক্ষু শারিপুত্র, মৌদ্‌গল্য ভিক্ষু, ভিক্ষু অনিরুদ্ধ, ভিক্ষু সুপূর্ণ, ভিক্ষু এষ্যজিৎ, ভিক্ষু উপালী, ভিক্ষু কাত্যায়ন, ভিক্ষু কৌষ্টিল, ভিক্ষু পিলিন্দ বৎস, ভিক্ষু শ্রোণকোটি এই দ্বাদশ ভিক্ষু– তৎপর ভগবান বুদ্ধের পুত্র চক্রবর্তী রাহুলক এবং সর্বশেষে কাঞ্চনবর্ণ শত সূর্য আলোকে আলোকিত করিয়া দেব-নর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণরত ভগবান জিনেন্দ্র বুদ্ধদেব পুণ্যবানগণের নয়নগোচর হইলেন। ভগবান অষ্টাদশ মূর্তিতে অষ্টাদশদ্বার-সমন্বিত ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া সুমাগধার গৃহ যেন শশিকান্ত মণির প্রভায় প্রভাময় করিয়াছিলেন।

তত্রত্য সকলেই বুদ্ধদেবকে যথাযোগ্য পূজা করিয়াছিল। শ্বশুরাদিবর্গ-সহিত সুমাগধা এবং অন্যান্য পুরবাসী জনগণ শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা বিশুদ্ধাশয় হইয়া সত্য দর্শন করিয়াছিল।

তৎপরে সমগ্র পৌণ্ড্র জনপদে শুধু একই ধ্বনি, ত্রিশরণের ধ্বনি– বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধম্মং শরণং গচ্ছামি! সংঘং শরণং গচ্ছামি!"

সুমাগধা এবং বুদ্ধের আখ্যান মনে পড়ায় নয়নযুগল অশ্রুপাবিত হয়ে ওঠে ভিক্ষু উপগুপ্তের। তিনি স্খলিত কণ্ঠে আর্তনাদ করেন– আহা কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব স্বর্ণখচিত দিনগুলি! আজ! আজ আমাদের কী দুর্দৈব! আজ এই দেশটা কাদের? এই সাম্রাজ্য কাদের?

কাদের আবার! সকলেই জানে এই দেশ এই পালসাম্রাজ্য বৌদ্ধদের।

প্রিয়রক্ষিতের মুখে তিক্ত একটুকরো হাসি– সেকথাই সবাই বলবে। কেননা এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপাল এখনো নিজেকে পরমসুগত বৌদ্ধ বলেই পরিচয় দান করেন। এই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল, মহাত্মা ধর্মপাল এবং দেবপাল নিজেদের বৌদ্ধ পরিচয়কেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমেও সর্বদা প্রমাণ করতে চাইতেন নিজেদের বুদ্ধপ্রীতি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা নামেমাত্র বৌদ্ধ। তাঁর রানীরা সব উত্তর বা দক্ষিণ দেশের হিন্দু রাজবংশের কন্যা। তাঁর মাতা-বিমাতা-মাতৃকুলের সবাই হিন্দু। রাজার মহামাত্য হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের প্রসারে সদাব্যস্ত। এমনকি সাম্রাজ্যের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই সাম্রাজ্যকে এখন কি আর বৌদ্ধ সাম্রাজ্য হিসাবে আখ্যায়িত করা সমীচীন? এই ভূমিকে কি এখন আর ভগবান গৌতমের চরণাশ্রিত ভূমি বলে আখ্যায়িত করা যায়?

সুভদ্র সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানান প্রিয়রক্ষিতকে। তিনি পরম শ্লেষের সঙ্গে যোগ করেন– রাজার হিন্দুপ্রীতি অতুলনীয়! হিন্দুদের জন্য রাজা যেন কল্পতরু!

অথচ অতীতের হিন্দু রাজাদের দুস্কৃতির কথা মনে পড়লে যে কোনো বৌদ্ধের শরীরের রোম শিউরে ওঠে। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদের ওপর কী অত্যাচারই না করেছে! বৌদ্ধধর্মকে এদেশের মাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে এমন কোনো কাজ নেই যা করেনি তারা। রাজা শশাঙ্কের কথা তো সকলেরই মনে আছে। তার জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন ছিল এই পলিমাটি আর লোহিতমৃত্তিকার দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মকে সমূলে উচ্ছেদ করা। গয়ার বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটন করেছিলেন হিন্দুরাজা শশাঙ্ক। সেখানে যত বৌদ্ধমন্দির ছিল সবগুলি মন্দির থেকে বৌদ্ধমূর্তি সরিয়ে সেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। কুশীনগরের মহাবিহারকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন মাটির সঙ্গে। অজস্র ভিক্ষুকে হত্যা করেছিলেন, দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন, জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। মহাবোধিসত্ত অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের পদচিহ্ন সম্বলিত প্রস্তরখণ্ড, যেটি ছিল এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সকল মানুষের আধ্যাত্মিক গর্বের ধন, সেই মহাপবিত্র প্রস্তরখণ্ডটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলেন পাষণ্ড রাজা শশাঙ্ক। চিরতরে জলের অতলে তলিয়ে গেছে সেই বুদ্ধচিহ্নস্মারকটি।

আর আমাদের রাজা সেই হিন্দুধর্মের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে চলেছেন অকাতরে। হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিচ্ছেন, হিন্দুধর্মপ্রচারকদের নিরাপদে কাজ করার নিশ্চয়তা বিধান করছেন। অথচ আজ দেখুন আমাদের নিজেদের কী রকম দুরবস্থা! সঠিকভাবে ধর্মচর্চা কিংবা জ্ঞানচর্চা করার মতো ন্যূনতম পরিবেশও বিদ্যমান নেই আমাদের জন্য।

ভেবে দেখুন, আমাদের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন, অর্থাৎ, আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শীলভদ্র, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, দীপঙ্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীজ্ঞান, চন্দ্রগোমী, অভয়াঙ্কর গুপ্ত, জেতারী, জ্ঞানশ্রীর মতো মহাত্মাবৃন্দ। ভাবতে পারেন, উত্তর হিমালয়ের দুর্গম পর্বতমালা অতিক্রম করে আমাদেরই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে জ্বালিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের আলোকবর্তিকা। আবার দক্ষিণে সুদূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রামধনঞ্জয়ের রাজগুরুপদে বরিত হয়েছিলেন আমাদেরই আচার্য কুমার ঘোষ। হায় আমরা কেউ-ই তাঁদের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারব না!

কেমন করে পারব? আমাদের কি নিরন্তর সাধনা ও পঠনপাঠনের কোনো সুযোগ আছে? এই বিশাল পালসাম্রাজ্যের গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধন-বরেন্দ্রীতে একটাও মহাবিহার নেই। নেই পুঁথিসংগ্রহ। নেই দেশ-বিদেশের ধর্মাচার্যদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে তাঁদের কাছে বিদ্যা অর্জনের সুযোগ।

এখন তাহলে কী করা যায়?

করতে হবে তো অনেক কিছুই। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন এই প্রদেশে এমন একটি বৌদ্ধ মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করা, যা হবে নালন্দার সমতুল্য। আর একই সঙ্গে বড় আকারের যে বিহারগুলি রয়েছে, সেগুলিকেও মহাবিহারে রূপান্তরিত করতে হবে। তা নাহলে বৌদ্ধ ধর্মকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে মহারাজের কাছে এই ধরনের মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানানো।

আবেদন নয়, দাবি। সুভদ্র সংশোধন করে দিলেন উপগুপ্তের বাক্য।

আচ্ছা ঠিক আছে দাবিই জানানো হবে। তা সেই দাবি আমরা জানাব কী প্রকারে?

কেন! রাজার কাছে গিয়ে আমরা আমাদের মহাবিহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলব। তাঁর অন্তরে যদি মহাবুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের দাবি মেনে নেবেন।

কিন্তু সহোদরোপম ভ্রাতা! রাজার কাছে আমরা পৌঁছব কী করে? রাজার দর্শন পেতে হলে আগে আমাদের যেতে হবে মহামাত্য ভট্টবামনের কার্যালয়ে। আর তার কাছে গেলে তিনি আমাদের রাজার কাছে যেতে তো দেবেনই না, বরং যাতে আমরা কোনোভাবেই রাজদর্শন না পাই তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। সৃষ্টি করবেন অযুত প্রতিবন্ধকতা।

হরিভদ্র উত্তেজিত হয়েছেন প্রচণ্ড– তবু আমাদের দেখা করতেই হবে মহারাজের সঙ্গে। যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক, সেগুলি আমাদের অতিক্রম করতেই হবে!

কিন্তু কীভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজপ্রাসাদে বৌদ্ধ অমাত্য এখনো যারা অবশিষ্ট রয়েছেন, তাদের কাছে যেতে হবে আমাদের। তারা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন রাজদর্শন পেতে।

প্রিয়রক্ষিত বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– আমার বিহারের ব্যয়নির্বাহ যে কী কঠিন হয়ে পড়েছে! যারা পূর্বে নিয়মিত মুদ্রাদান করতেন, সেইসব বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীরা আজ নিজেরাই সর্বস্বান্ত, কপর্দকশূন্য। কূটবুদ্ধির অভাবে আর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ব্যবসাবৃত্তিতে তারা হেরে যাচ্ছেন হিন্দু বণিকদের কাছে। কারণ রাষ্ট্র হিন্দুবণিকদের দিচ্ছে অনেক অন্যায় পক্ষপাতিত্ব। তাছাড়া বাণিজ্যে এমন কোনো হীনপন্থা নেই যা অবলম্বনে দ্বিধা করে হিন্দুরা। যখন ছলে-বলে-কৌশলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে পারে না, তখন তস্কর পাঠিয়ে চুরি করিয়ে নেয় বৌদ্ধশ্রেষ্ঠীদের পণ্যভাণ্ডার, কিংবা পথিমধ্যে দস্যু লেলিয়ে দিয়ে লুঠ করে নেয় সব। তাই আজ আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা নিজেরাই নিজেদের অন্নের জন্য অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী। তারা বিহারে অর্থ দান করবেন কীভাবে?

রাজকোষের বার্ষিক অনুদানের কী খবর?

কী জানি কার অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে সেই বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ আজ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় শূন্যের পর্যায়ে। আমি অন্তত দশবার আবেদনপত্র পাঠিয়েছি প্রাদেশিক অমাত্যের কাছে। তিনি অনুদানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিজের অপারগতা জানিয়েছেন প্রতিবারই। আগে একশত ত্রিশজন করে যুবক প্রতিবছর বুদ্ধের শরণ নেবার জন্য ভর্তি হতেন আমার বিহারে। অথচ এখন সেই সংখ্যা কমাতে কমাতে বছরে মাত্র চল্লিশ জনে নামিয়ে এনেও আমি ব্যয়সাম্য রক্ষা করতে পারছি না। বিদ্যার্থীদের কাসাবস্ত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম। প্রবারণা পূর্ণিমার সময় কঠিন চীবরদান উৎসবে সন্নিহিত গ্রামের বৌদ্ধ গৃহস্থেরা যে বস্ত্রগুলি দান করে যান, তা দিয়ে আমরা সাংবাৎসরিক বস্ত্রচাহিদা মিটিয়ে চলতে পারি কোনোমতে। কিন্তু দিনান্তে একবার তো অন্তত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকদের মুখে শাকান্ন তুলে দিতে হবে। সেই ব্যয়নির্বাহ করাই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারির দক্ষিণা। ধরুন, গণক কায়স্থ মালাকার তৈলিক কুম্ভকার কাহলিক (ঢোলবাদক) শঙ্খবাদক দ্রাগড়িক (সময়জ্ঞাপক নাকাড়াবাদক) কর্মকর চর্মকার– এদের সবার মাসান্তিক দক্ষিণা প্রদানের অর্থসংস্থানের চিন্তায় আমাকে প্রতি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে কুঞ্চিতললাট হয়ে থাকতে হয়।

একটু থামলেন প্রিয়রক্ষিত। তারপর বিষণ্ন ক্লান্ত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে– আপনাদের কাছে আর খুলে বলার প্রয়োজন কী! আমি জানি, আমাদের সকলের অবস্থাই কম-বেশি একই রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনয়পালিত রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– আমাদের রাজা বৌদ্ধ। এই পালসাম্রাজ্য ভূ-মণ্ডলে বৌদ্ধসাম্রাজ্য নামে পরিচিত। অথচ সুগতশিক্ষাপীঠগুলির এই অবস্থা। অথচ জানেন কি এই সাম্রাজ্যের সবগুলি নগরে দেবকুল স্থাপিত হচ্ছে মহা আড়ম্বরে। সেখানে হিন্দু দেবতার সেবার নামে কী যে অশ্লীলতা চলছে! রাজার মতো দেবতারও সেবাদাসীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারা সব চামরধারিণী, ধূপদীপপ্রজ্জ্বালিনী, আলিম্পনকারিণী, নৃত্য-গীতে আনন্দবর্ধিনী। ভট্টবামনের ভাগীনেয় কোটিবর্ষ নগরে যে প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে নাকি অর্ধাঙ্গনাস্বামিনো রত্নালংকৃতিভিবি শোষিতবপুঃ শোভাঃ শতংঃ সুভ্রুবঃ– একশত সুন্দরী দেবদাসী দেবসেবায় নিযুক্তা।

পাঁচ অধ্যক্ষ পুতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তারা জীতেন্দ্রিয় হিসাবে বিবেচিত এবং পূজিত। কিন্তু জীতেন্দ্রিয় হোন আর যা-ই হোন, পুরুষ তো বটে। তাই নারী, বিশেষ করে, যুবতী সুন্দরী রমণীদের কথা আলোচনাস্থলে মাত্র একবার উঠেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে, তা তো হতেই পারে না। হরিভদ্রের মতো বৃদ্ধও এই আলোচনায় যোগ দেন অবচেতনের উৎসাহে। বলে ওঠেন– আরে শুধু মন্দির আর দেবদাসীর ব্যবস্থা করেই তো ক্ষান্ত দেননি আমাদের মহামাত্য। নিজনামে প্রশস্তিও লিখিয়ে নিয়েছেন আমাদের মহারাজের রাজসভার এক সভাকবিকে দিয়ে। অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ সব পংক্তিমালা। সেগুলি উচ্চারণ করাও পাপকার্য। তবু বাস্তব পরিস্থিতির কতখানি অবনতি হয়েছে, সেকথা বোঝানোর জন্য আপনারা শুনতে চাইলে আমি শোনাতে পারি সেই অশ্লীল পংক্তিমালা।

শোনান! শোনান! সোৎসাহ আহ্বান আসে।

এসব উচ্চারণেও অন্তরে মালিন্য আসে। মহাপ্রভু মার্জনা করুন। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা বোঝানোর জন্যেই এসব উচ্চারণ করতে হচ্ছে আমাকে। শুনুন তাহলে–

এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতিবিশ্রান্তবিদ্যাধরী
বিভ্রান্তিং দধতীঃ শতং স হি দদৌ শারঙ্গীশাবীদৃশঃ।
দগ্ধস্যোগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সংজীবনং
কারা কামিজনস্য সঙ্গম গৃহং সঙ্গীতকেলিশ্রিয়াম।।

(সেই চিদাত্মা হরিকে তিনি দান করেছিলেন শতসংখ্যক তরুণহরিণাক্ষী যারা মর্ত্যে অবতীর্ণ বিদ্যাধরীর ভ্রান্তি উৎপন্ন করে, রুদ্রনেত্রে দগ্ধ কামকে যারা কটাক্ষেই উজ্জীবিত করতে পারে, যারা কামুকদের বন্দিশালা, যারা সঙ্গীতকলাবিলাসের মিলনবাসর।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধিক্! শতধিক্ এই কবিকে। আর ধিক্ এই ব্যভিচারের উদ্ভাবক মহামাত্যকে!

সমস্বরে ঘৃণাবর্ষণ করে চারটি কণ্ঠ।

আর সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর এতই উচ্চকিত যে হরিভদ্র, হয়তো আরও কিছুক্ষণ এই ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তার, থতমত খেয়ে থেমে যেতে বাধ্যই হলেন একপ্রকার।

চারজনের ধিক্কার এবং হরিভদ্রের হঠাৎ কথা থামিয়ে দেবার পরিণতিতে কয়েক মুহূর্তের অনিবার্য নৈঃশব্দ। আসলে ঠিক কীভাবে তাদের মূল আলোচনার সূত্রমুখ ফের আঁকড়ে ধরা যাবে তা ভাবতে সময় নিচ্ছিলেন পাঁচজনই। শেষ পর্যন্ত সুভদ্রই শুরু করতে পারলেন আবার। তার কণ্ঠ চিরে বেরুল হাহাকার– আহ্ আমরা আজ এতই অবহেলিত! এতই অবহেলিত বৌদ্ধধর্ম আজ!

অবহেলিত। উপেক্ষিত। অবমানিত।

ভাবুন একবার! মহারাজা দেবপালের রাজসভায় যে কোনো বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন ঔত্থিতাসনিক (যাকে দেখলে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো হয়)। আমাদের কোনো ভিক্ষু রাজসভায় প্রবেশ করলে পৃথিবীর অধীশ্বর দেবপাল এবং ধর্মপাল সসম্মানে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকে অভ্যর্থনা জানাতেন। আর আজ! সেই ভিক্ষুদের উত্তরপুরুষ আমরা। আমাদের অধিকারই নেই রাজসভায় প্রবেশের। নিজধর্মের রাজার দর্শনলাভের জন্য, সাক্ষাৎ লাভের জন্য, অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে বিজাতীয়, ভিন্নধর্মীয় মন্ত্রী-অমাত্যের মাধ্যমে।

কখনোই না! বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন উপগুপ্ত– আমরা ভট্টবামনের দ্বারস্থ হবো না কোনোমতেই। বরং চলুন আমরা রাজসভায় যে কয়েকজন বৌদ্ধ অমাত্য অবশিষ্ট রয়েছেন তাদের সঙ্গে দেখা করি। তাদের মাধ্যমে মহারাজের কাছে আমাদের নিবেদন প্রেরণ করি।

তা বোধকরি যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রিয়রক্ষিতের কণ্ঠ ম্রিয়মান– এতে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাওয়ার অপরাধে অপরাধী হতে হবে হয়তো। পরবর্তীতে একথা অবশ্যই জানতে পারবেন ভট্টবামন। তিনি তখন মন্ত্রণা দিয়ে রাজার মনকে আমাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে বিষিয়ে তুলবেন। এর ফলে আমাদের আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

তাহলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে আমাদের দেখা করার চেষ্টা করতে হবে ভট্টবামনের সাথেই। তার মাধ্যমেই আবেদন জানাতে হবে মহারাজের সাক্ষাৎকারের। মনে রাখবেন, ভট্টবামনের সহানুভূতি না পেলেও তার বিরূপতা অর্জন, অন্তত এইমুহূর্তে, আমাদের কাম্য হতে পারে না।

এই যুক্তির বিরোধিতা করার মতো কোনো কথা খুঁজে পায় না কেউ।

০৬. পিতা-পুত্র

চিনতে শেখার বয়স হওয়ার পর থেকে বাবা নামের কারো সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি পপীপের। এখন হুট করে একজন লোক তাকে বলছে সে তার বাবা, আর অমনি তাকে বাবা বলে মেনে নেয়া বেশ কঠিনই মনে হয় পপীপের কাছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়, পপীপের সামনে এখানে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপরিচয়। তাছাড়া কোনোদিন যা পাওয়া হয়নি, যার অস্তিত্ব আছে কিনা সেটিও জানা নেই, জানা হয়নি, তার জন্য অভাববোধ কিংবা পাওয়ার তৃষ্ণাও তৈরি হয়নি তার জীবনে। তাদের গাঁয়ে অন্য ছেলেমেয়েরা যখন তাদের পিতার কোলে উঠে বেড়াতে যেত, কিংবা কোনো পিতাকে যখন তার সন্তানকে আদর করতে দেখত পপীপ, তখন তার নিজের বাবা কোথায় সেই প্রশ্ন অবশ্য মনে এসেছে পপীপের। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ মনে থাকেনি। বা খুব মন খারাপ হয়নি। আসলে তার বাবার অভাব বুঝতে দেয়নি তার মা। তাছাড়া নিজেদের গাঁয়ে পপীপের ছিল নিজেদের ঝুপড়ি, নিজের মা, গাঁয়ের অন্য মেয়েরা কেউ ছিল তার খুড়ি কেউ কাকি কেউ পিসি, পুরুষরা খুড়ো-জ্যাঠা-কাকা, কেউবা দাদা। সেখানে তার বাবা নামের কেউ ছিল না। অবশ্য অদেখা এক বাবার নামে মাঝে মাঝে মাকে সে দেখেছে অশ্রুবর্ষণ করতে। তবে এই মানুষটাই যে সেই বাবা, তা চিনিয়ে দেবার জন্য মা-ও তো এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই। তাই অপরিচয়ের দ্বিধা কাটতে চায় না পপীপের মন থেকে। অবশ্য তার সহজাত প্রবৃত্তি বলছে, লোকটি তাকে যে আদর করছে তার সবটুকুই অন্তর থেকে উঠে আসা। এবং এই আদর, লোকটির বুকের সংস্পর্শ, তার ছোট্ট জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গত কয়েকদিনের লণ্ডভণ্ড ঝড়ের ধাক্কাকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে পারছে, নিজেকে গত কয়েকদিনের মতো আর অতখানি অনিরাপদ মনে হচ্ছে না। তবুও তার মনটা একটুখানি থিতু হওয়ার সুযোগ পাওয়ামাত্রই মায়ের জন্য হাহাকার করে উঠছে। তাই সে লোকটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার চারপাশে তাকায় এবং অকস্মাৎ-ই ফুঁপিয়ে ওঠে মা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কান্নার প্রতিক্রিয়ায় মানুষটির সজল চোখ আবারও জলে উপচে পড়ে। লোকটার বুকেও বোধহয় অনেক কান্নাই জমে আছে। নইলে এত তাড়াতাড়ি সজল হয়ে উঠতে পারে না কারো চোখ। সে আবার বুকে টেনে নেয় পপীপকে। নিজের পিঠে রুক্ষ, ছিন্নভিন্ন, কড়াপড়া, ফাটাফাটা হাতের স্পর্শ পায় পপীপ। অমসৃণ হাতের তালুর স্পর্শও এত আদরময় হতে পারে! পপীপের মন থেকে অপরিচয়ের সব দ্বিধা, সব দোদুল্যমানতা উবে যেতে চায় এই আদরের স্পর্শে। কিন্তু মায়ের জন্য হাহাকার তার ফুরায় না– মায়ের কাছে যাব!

লোকটি, বট্যপ, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে উদ্গত অশ্রু আর অন্তরের অনিরুদ্ধ বেদনার আবেগ সামলানোর চেষ্টা করে প্রাণপণে। ভাঙাস্বরে বলে– যাবি রে সোনা! মায়ের কাছে যাবি তো বটি। এই তো আর কয়টাদিন। প্রভুর দ্রম্ম কয়টার প্রায়শ্চিত্তি করতে পারলেই তুই আর আমি চলে যাব। চলে যাব আমাদের বরিন্দের সেই কৈবর্তগাঁয়ে। তোর মায়ের কাছে। আমার ভাইদের কাছে। আমাদের লিজেদের মানুষদের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে– মা তোরে খুব ভালোবাসে, লয়?

মাথা ঝাঁকায় পপীপ।

তা তো বাসবেই। মায়ের কত কষ্টের নাড়িছেঁড়া ধন যে তুই!

আবার জিজ্ঞাসা– তোর মন মায়ের তরে খুব টানে, লয়?

পপীপ নির্দ্বিধ মাথা ঝাঁকায়।

তোরা... তুই আর তোর মা রোজ কী খেতিস রে পপীপ?

এটা কোনো প্রশ্ন হলো! পান্তা, সোরা, খরগোসের মাংস, কুলবড়ই, আম আরও কত কী!

রোজ রোজ খেতে পাস রে তোরা?

এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধায় পড়ে পপীপ। রোজ কি তারা খেতে পায়? তার জন্য কিছু না কিছু তো মা রোজই যোগার করে আনে যেভাবে পারে। কিন্তু মা রোজ খেয়েছে কিনা সেটা তো কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। আসলে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে কি না সেটাও কখনো ভাবা হয়নি।

মোদের গাঁয়ের আর সবাই কেমন আছে রে পপীপ?

আর সবাই মানে?

ঐ যে পরভু, দয়াল, পিতু, তোর খুড়িমা... সবাই ভালো আছে রে?

পিতু জ্যাঠা মরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বড় ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ এতদিন পরে এই প্রথম শুনতে পায় বট্যপ। বড় দাদার সঙ্গে তার যে খুব কথা চালাচালি হতো তা নয়। এমনকি কামরূপে চলে আসতে বাধ্য হবার পর থেকে দাদার কথা খুব যে একটা মনে পড়ত, তা বলা যাবে না। তার বুক জুড়ে ছিল স্ত্রী বিবানি আর একদিনের সন্ত ান পপীপ। কিন্তু এখন দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনে তার বুকটা খুব খালি খালি ঠেকে, মোচড় দিয়ে ওঠে। গলার স্বর আবারও ভেঙে আসতে চায় কান্নার চাপে। মানুষের মনের মধ্যে কোন গোপন খুপড়িতে কে যে কোন জায়গা জুড়ে বসে থাকে!

তখন দ্রগড় (ঘণ্টা) বাজে।

চমকে উঠে বট্যপের বুকে সেঁটে আসে পপীপ– উটি কীসের শব্দ বটি?

খেতে যাওয়ার জন্যে মোদের ঐ ঘন্টি বাজিয়ে ডাকছে। খেতে যাওয়ার সময় হয়েছে রে বাপ। চল আমরা খেতে যাই।

এরা এমনি এমনি মোদের খেতে দিবে?

তিক্ত হাসি ফোটে বট্যপের মুখে। কিন্তু কোনো কথা বলে না উত্তরে। বরং আবার তাড়া দেয়– দেরি হয়ে যাচ্ছে রে বাপ, চল, খেতে চল! খেয়ে এসে আবার ঘুম যাবি।

তাদের মতো সারি সারি ঝুপড়ি থেকে বেড়িয়ে আসছে মানুষ। পপীপ প্রত্যুষের আলোতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় চারপাশে। ভেতর থেকে ঝুপড়িগুলিকে তাদের কৈবর্তগ্রামের ঝুপড়ির মতো মনে হলেও আদতে সেরকম নয়। আকারে মিল রয়েছে ঠিকই। তবে তাদের গাঁয়ের মতো সেগুলি শুধু পাতা বা খড়ে ছাওয়া নয়। ওহালি (বাঁশের বাতা) দিয়ে তৈরি চালা এবং দেওয়াল। চালা আর দেওয়ালের ওপর পুরু করে লেপে দেওয়া মাটি। ফলে ঝড়ির (বর্ষা) সময় চালা ফেঁড়ে বৃষ্টির জল ঢুকতে পারে না ঝুপড়িতে। বাঁশ আর মাটি মিলিয়ে বানানো দেওয়াল খুবই শক্ত। এই রকম দেওয়াল থাকলে যখন-তখন বনের জন্তু-জানোয়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে না। তাছাড়া, বট্যপ জানায়, মাটির পুরু আস্তর দেওয়া থাকায় গরমকালে কম গরম, আর শীতকালে কম ঠাণ্ডা লাগে ঘরগুলিতে। আমরা বরেন্দিতে যখন ফিরে যাব, ঠিক এই রকম করে মোদের ঘর বানিয়ে নিব রে বেটা। তাহলে আমরা বাপ-বেটা-মায়ে মিলে থাকতে পারব সুখে। গরমের কালেও, শীতের কালেও, আবার ঝড়ির কালেও।

যে ঘরে তাদের খেতে দেওয়া হলো, সেটি লম্বায় অনেক বড়। ওপরে শুধু চালা। চারপাশে কোনো দেওয়াল নেই। তকতকে লেপা মেঝে। বট্যপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানায়, দিনে অন্তত দুইবার এই মেঝে লেপা-পোঁছার কাজ করে গোলগোমীরা (ঘর পরিষ্কার করার দাসী)।

সেই মেঝেতে দুই সারিতে খেতে বসে ভূমিদাসরা। মাটির মালসায় প্রথমে আসে সূক্ত (ছাতু)। সঙ্গে লবণ মেশানো জল। সেগুলো খাওয়া শেষ হলে আসে ফেনাভাত, নলতে শাক, কচু, অলাবুর তরকারি। মাছ-মাংস এখানে অচল। রামশর্মা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার ভূস্বামীত্বে মাছ-মাংস ঢুকবে না। খাওয়ার পরে জলের ঘটি নিয়ে যেতে হয় ইন্দারায়। বড় বালতি থেকে একজন জল ঢেলে দেয় প্রত্যেকের ঘটিতে। প্রথমে সেই জল খেয়ে তেষ্টা মেটানো। তারপর বাকি জল দিয়ে মালসা পরিষ্কার করে রেখে আসতে হবে খাবার-চালার নির্দিষ্ট জায়গায়। এই অস্পৃশ্য ভূমিদাসদের নিয়ে শাস্ত্রীয় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল রামশর্মাকে। সেই পতঞ্জলি-মনুর সময় থেকে চলে আসছে তিন ধরনের শূদ্র-বিচার। এক রকম হচ্ছে 'যজ্ঞাদনিরবসিতানাম'। যজ্ঞস্থান থেকে বিতাড়িত নয় যারা। এরা যজ্ঞের বিভিন্ন ধরনের কাজে যোগালির কাজ করতে পারে। যেমন তক্ষ (ছুতার), অয়স্কার (কামার), রজক, তন্তুবায়। এরা সৎশূদ্র। অর্থাৎ জল-চল। জল-অচলদের শূদ্রদের মধ্যে আছে দুই রকম। 'পাত্রদনিরবসিতানাম'। এরা আর্যদের বাসন-কোসন ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারের পরে পাত্র ফেলে দিতে হয় না। অন্ত্যজ তৃতীয় শ্রেণীর শূদ্র হচ্ছে 'নিরবসিত'। এরা একবারেই নিম্নস্তরের। এরা কোনো বাসনপত্র ব্যবহার করলে সেই বাসনপত্র আর শুদ্ধ করে নেওয়া যায় না। ফেলে দিতে হয় দূরে, যাতে সেগুলো ব্রাহ্মণের স্পর্শদোষ ঘটাতে না পারে।

কৈবর্তরা তো আর্যদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র শূদ্রই নয়, তারা রাক্ষস অনাস বয়াংসি। এদেরকে যে কোন স্তরে ফেলা হবে তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তাটিকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। রোজ রোজ এদেরকে নতুন পাত্র দিলে ব্যাপক ব্যয় হয়ে যায়। এমনকি এটিকে অপব্যয়ও বলা চলে। শেষ পর্যন্ত অনেক পুঁজি-পাতি ঘেঁটে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এদের এঁটোপাত্র ফেলে দেওয়া হবে না। ভালো করে ধুয়ে গঙ্গাজলের ছিটে দিলে পুনঃব্যবহারযোগ্য হবে। তবে তা শুধু ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মানুষের জন্য। কোনো ব্রাহ্মণ বা উচ্চবংশের মানুষ এই সব পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না।

তখন থেকে এই নিয়ম চলছে।

খাওয়া এবং জলপানের পরে আবার দ্রগড় বাজে।

এবার কাজে যেতে হবে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে পপীপের দিকে তাকিয়ে থাকে বট্যপ। ছেলেকে নিয়ে কী করতে হবে সেরকম কোনো নির্দেশ এখনো এসে পৌঁছায়নি তার কাছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে– তুই ঘরেই থাক রে বাপ। একটু পরেই রোদের বড় ঝাঁঝ বেড়ে যাবে। তখন বাইরে থাকলে তোর কষ্ট হবে। বাইরে যাস না। এই ঘটি নে। জল ভরে দিচ্ছি। ঘরে রেখে দে। তেষ্টা পেলে জল খাবি।

আর খিদে পেলে?

এই প্রশ্নে আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে অসহায় পিতা। এখানে সূর্যাস্তের আগে আর খাদ্যবস্তু জোটার কোনো উপায় আছে কিনা এত বছরেও তা জানা হয়নি তার। তাদের তো দিনে দুইবারই শুধু খেতে দেওয়া হয়। একবার সকালে কাজে যাবার পূর্বে, আর একবার সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফেরার পরে। কিন্তু কচিপেটের শিশু। তার তো ঘন ঘন খিদে পাওয়ারই কথা। তখন কী হবে! ভাবতে গিয়ে ঘেমে ওঠে বট্যপ। সন্তান তার খিদের জ্বালায় কাঁদছে, এমন দৃশ্য মনের মধ্যে ভেসে ওঠায় বুক মুচড়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় আবারও।

তুমি কখন ঘরে ফিরবে?

ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে পপীপ– ওটা ঘুরে গেলে।

তাহলে আমার যে খিদা লাগবে!

খিদা লাগলে... খিদা লাগলে ঐ জলটাই খাবি বাপ! বেশি বেশি করে খাবি। তাহলে দেখবি খিদা মরে গেছে।

শব্দ কয়টি ছেলেকে লক্ষ করে ছুঁড়ে দেয় বটে পিতা, কিন্তু মনে হয় শব্দের ধাক্কায় সে নিজেই পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করেছে।

আজ বট্যপকে কাজ করতে হবে আখের জমিতে। এখানে আখের চাষ খুবই লাভজনক। আখের রস থেকেই গুড়। গুড় ছাড়া তো কোনো মিষ্টান্ন কল্পনাই করা যায় না। আবার মিষ্টান্নকে বাদ দিলে হিন্দুদের কোনো পূজারই কল্পনা করা যায় না। কেননা মিষ্টান্ন ছাড়া দেবতার ভোগ হয় না। তাই বাজারে তোলামাত্র বিক্রি হয়ে যায় গুড়ের পাটালিগুলো। ঝোলাগুড় চোলাই করে তৈরি হয় উৎকৃষ্ট আসব। সোমরস। সোমরস ছাড়া আর্য হিন্দুদের কোনো বিনোদন হয় না। কোনো যজ্ঞও হয় না। তাই রামশর্মা আখের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বুঝে তার নালভূমির এক বিরাট অংশে গড়ে তুলেছেন আখের ক্ষেত। সারা কামরূপ রাজ্যে তার চেয়ে বড় আখের চাষভূমি আর কারো নেই। এই আখ-সাম্রাজ্য নিয়ে রামশর্মা ও তার পরিজনরা তো গর্ব করেই, কখনো কখনো গর্ব করে ভূমিদাসরাও। তাদের খেতের আখের গুড়ের পাটালি ও ঝোলাগুড়ের সুনাম সর্বত্র। এই গুড় কামরূপের সর্বত্র নিয়ে যায় সার্থবাহরা। আবার অন্য রাজ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ চাহিদা তাদের এই গুড়ের। এই রাজ্যের নদীগুলি সদানীরা (সারা বছর জল থাকে এমন নদী)। তাই নৌযান চলে সারাবছর। নৌযানগুলি নদীর জলে ভেসে ভেসে দূরের-দূরের দেশে বয়ে নিয়ে যায় কৈবর্তভূমিদাসদের রক্ত-ঘামে ফলানো রামশর্মার ক্ষেতের আখের গুড় ও ঝোলাগুড়। কামরূপের ঝোলাগুড় আর সুগন্ধি করঞ্জের তেল নিতে পৃথিবীর অন্য পার থেকে, আরব থেকে, চীন থেকে সার্থবাহরা আসে সাগর পাড়ি দিয়ে।

আজ বট্যপের হাত চলে খুব দ্রুত। এমনিতেই কৈবর্তরা কাজে ফাঁকি দিতে জানে না। চাষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে তাদের নাড়ির সম্পর্ক। চাষের কাজ পেলে, মাটি ও শস্য সম্ভাবনার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেই তারা তার সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। যে জমিতে কাজ করছে, সেটি নিজের জমি না অন্যের জমি তা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র অবসর তাদের থাকে না। তারা তখন পৃথিবী ও মৃত্তিকার উপাসনায় মগ্ন। মৃত্তিকার সাথে তাদের এই অদ্ভুত একাত্মতা দেখে আর্য পণ্ডিতরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যায়। তারা বলে, এসব অসুর জাতির মৃত্তিকাপ্রেম তাদের জাতির উৎপত্তির সাথে সংশিষ্ট। তারা বলে, বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরক-অসুর জন্ম নিয়ে অঙ্গ-বঙ্গ-পুণ্ড্র-গৌড় অঞ্চলে ভৌম বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর্যাবর্তের সব বিখ্যাত আর্যবংশ সবই সুর্য ও চন্দ্র, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় দেবাংশ থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এইসব অঞ্চলের অনার্যদের উৎপত্তি আকাশের জ্যোতিষ্কে নয়, মাটির গর্ভে – নরকাসুরের বীর্যে।

বট্যপের রক্তে-মাংসে-হৃদয়ে-কল্পনায় সেই একই মৃত্তিকাপ্রেম। তাই নালক্ষেত্রে সে মনপ্রাণ ঢেলেই কাজ করে সবসময়। কিন্তু আজ তার কাজের গতি আরও বেড়ে যায়। সাত বছরের নিঃসঙ্গতার পরে তার আত্মজ আজ তার বুকের পাশে। সেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় সে যেন আজ মৃত্তিকাকে উৎসর্গ করতে থাকে আরও বেশি দেহজ ও মনজ শ্রম।

দ্বিপ্রহরে পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। রোজই এটা ঘটে। শরীর এখন কিছু খাদ্য চায়। কিন্তু বট্যপ জানে একটু পরেই ধীরে ধীরে পেটের এই মোচড় দিয়ে ওঠা কমে যাবে। থাকবে শুধু একটু ভোঁতা চিনচিনে ব্যথা। একটু পর পর সেই ব্যথা ঝিলিক দিয়ে তীব্র হয়ে উঠে তাকে মনে করিয়ে দেবে তার পেট এখন খাদ্য চায়। তবে এই দাবি অস্বীকার করে দিন কাটিয়ে দেবার অভ্যাস তৈরি হয়েছে বট্যপের। নির্বিকারে এটিকে সঙ্গী করেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিছুক্ষণ পরেই তার মন থেকে মুছে যাবে এই চিনচিনে ব্যথার ভিন্ন তাৎপর্য। তার মনে হতে থাকবে এটি তার নৈমিত্তিক সঙ্গী। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আর কিছুতেই মন থেকে ব্যথাটিকে তাড়াতে পারে না বট্যপ। তার মনে পড়ে, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে শিশু পপীপেরও। ঝুপড়ির মধ্যে খিদের যন্ত্রণা নিয়ে পেট চেপে বসে আছে অসহায় একটি শিশু, দৃশ্যটি মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই হাহাকারে ভরে ওঠে বট্যপের বুক। থেমে যায় তার হাতের খনিত্র। পাশে কাজ করছিল ভিগু। সে লক্ষ করে বট্যপের ভাবান্তর। জিজ্ঞেস করে– কী হলোরে বট্যপ?

ছেলেটা!

কী হয়েছে ছেলেটার? সকালে তো ভালোই দেখে এলাম তোদের বাপ-বেটাকে।

ছেলেটা খিদায় কষ্ট পাচ্ছে ভিগু!

তাইতো! ভিগুরও যেন খেয়াল হয় ব্যাপারটা।

তা কী করবি বটি এখন?

কী করব ভিগু?

এদিক-ওদিক তাকায় ভিগু। আখক্ষেতের পরে পুকুর। তার ওপারে বাঁশবন। সেদিকে ইশারা করে ভিগু– ঐদিগে যা। বাঁশঝাড়ে কোণ্ডক (বাঁশের কোঁড়) পাবি। না পেলে পুকুরের জল থেকে সলুপ্য (শালুক) তুলে ছেলেটাকে দিয়ে আয়।

ইতস্তত করে বট্যপ– কিন্তু প্রভুর অনুমতি...

ভিগু তাচ্ছিল্যে হাত নাড়ে– ও জন্য অনুমতি লাগবে কেনে? ওসব তো এখেনে পড়েই থাকে। কেউ খায় না। যা দিয়ে আয়। ছেলেটা টুকুন খেয়ে পেটের আগুন নিভাক।

কিন্তু কাজ ছেড়ে যাব!

এইটুকুন সময়ে আর কী মহাক্ষতি হবে! ঝমঝম যাবি আর আসবি। ফিরে এসে দুইদণ্ড জোরে হাত চালালেই হয়ে যাবে।

শালুক এবং বাঁশের কচি কোঁড়– দুটোই তুলে আনে বট্যপ। অনেকগুলিই আনে। সে জানে ভারি খুশি হবে ছেলেটা এগুলো পেলে। সে নিজেও শিশুবয়সে এসব পেলে পান্তাভাতও খেতে চাইত না।

ঝুপড়ির দরজায় এসে ডাকে– পপীপ!

কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ছেলেটা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বট্যপ এবার ঝাঁপ ঠেলে ভেতরে ঢোকে। বাইরের ঝাঁ ঝাঁ রোদের আলো থেকে ঝুপড়িতে ঢুকলে প্রথমে কিছুক্ষণ থাকে শুধু সোঁদা অন্ধকার। সেই অন্ধকার চোখে সয়ে এলে বট্যপ হড়াশ্ শব্দ করা বুক আর হতাশ্বাসভরা চোখ নিয়ে দেখে ঘরে কেউ নেই!

ছেলেটা গেল কোথায়?

বাইরে আসে বট্যপ। তাকায় এদিক-ওদিক।

কোথাও ছায়ামাত্র দেখা যায় না শিশুর। সে তখন গলা চড়িয়ে ডাকে– পপীপ! পপীপরে! বাপ পপীপ!

প্রতি ডাকে গলা চড়তে থাকে।

কিন্তু কোনো প্রতিধ্বনি ওঠে না। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ যেন বট্যপের কণ্ঠ চিরে বেরুনো শব্দগুলোকে নিজের ঝাঁঝালো উদরে মুহূর্তেই শুষে নিচ্ছে।

ডাকতে ডাকতে বট্যপের শুকনো গলা যখন প্রায় ফেটে যাওয়ার উপক্রম, তখন তাদের খাবার ঘরের মেঝে লেপছিল যে গোলগোমী, সে বেরিয়ে আসে– এত চ্যাঁচাও কেনে? কারে ডাকো?

আমার ছেলেটা। পপীপ!

ও, ঐ যে ছেলেটা যে কাল রাতে এখানে এসেছে?

হ্যাঁ গো।

তাকে তো কাজে পাঠানো হয়েছে। ঐ উত্তরের সব্জি ক্ষেতে।

ক্বে... কে পাঠিয়েছে বটি?

কে আবার! প্রভু। তা মনে হলো বাজ পড়েছে তোমার মাথায় কথাটা শুনে! তাকে কি এখানে এম্নি এম্নি আনিয়েছে প্রভু? কাজ করার জন্যে লয়? কাজ করার জন্যেই তো বটি। আর কাজ না করলে তোমার ঋণটা শোধ কীভাবে হবে বলো দিকিনি?

মাথায় বাজ-পড়া খাড়া শবদেহের মতোই একহাতে শালুক, অন্যহাতে কচি বাঁশের কোঁড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নির্মম সত্যাহত বট্যপ।

০৭. নাটক এবং নাটকের মধ্যে নাটক

"হে সোম তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী দীপ্তিমান কর্মপটু, তুমি যারপর নাই মধুপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও! বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করে বৃষের ন্যায় বলবান হন। তোমাকে পান করে ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দর রূপে স্ফুর্তিযুক্ত হয়, যেরূপ ঘোটক যুদ্ধে যায় তিনি সেরূপ শত্রুর আহার্যসামগ্রী লুণ্ঠন করতে যান। হে সোম, তোমার ন্যায় উজ্জ্বল আর কিছু নাই! তুমি যখন ক্ষরিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হও তখন দেববংশজাত সকল ব্যক্তিকে অমরত্বের দিকে আহ্বান জানাতে থাকো।"

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক সিংহাসনে বসে আছে বিশালদেহী একটা লোক। তার মুখমণ্ডল, গলা, বাহু, শালের মতো প্রশস্ত নগ্নবক্ষ, আর বিশাল জয়ঢাকের মতো উদর সোনালি রঙে রঞ্জিত। তার মাথার চুল কাঁধ ছাপিয়ে নামায় সেটাকে দেখাচ্ছে সিংহের কেশরের মতো। তার শ্মশ্রু নেমে এসেছে নাভিমূল পর্যন্ত। সে দুই হাতে বিশাল একটি স্বর্ণপাত্র ধরে রেখেছে। তা থেকে মুখে ঢালছে সোমরস। সোমপানের সময় আন্দোলিত হচ্ছে তার কেশ ও শ্মশ্রু। ইন্দ্রবেশী এই মানুষটিকে লক্ষ করেই স্তোত্রপাঠ হচ্ছে নেপথ্য থেকে।

এরপর মঞ্চে এল দুই অপ্সরা। তারা এতই স্বল্পবসনা এবং স্বচ্ছবসনা যে তাদের দেহলাবণ্য মঞ্চারূঢ় ইন্দ্র তো বটেই, দর্শকসারির শেষ ব্যক্তিটির কাছেও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। দুই অপ্সরা এসে করজোড়ে শুরু করল ইন্দ্রের স্তব– হে হিরন্ময় হিরণ্যবাহু ইন্দ্র! তোমার স্বর্ণনির্মিত রথ ভেদ করতে পারে স্বর্গ-নরক-পাতাল, বজ্র তোমার অস্ত্র, ঝড়-বৃষ্টি-প্লাবন সংঘটিত হয় তোমার ইচ্ছায়, তুমি শম্বর দৈত্যের উনশতটি পুরি ধ্বংস করেছ, তাই তোমার বিরুদ (উপাধি) 'পুরন্দর', আজ তোমারই জন্য আহুত হয়েছে এই ভোজসভা। স্বয়ং বিষ্ণু তোমার পাচক, তোমার জন্য রন্ধন করা হয়েছে একশত মহিষ, তৈরি করা হয়েছে এক সহস্র পুরোডাস (ছাগলের মাংসের তৈরি পিঠা), সোমরসে পূর্ণ করা হয়েছে তিনটি নদী। তুমি আমাদের আহুতি গ্রহণ করো!

ইন্দ্ররূপী বিশাল পুরুষ হুংকার ছাড়ে– তোমাদের মুখ থেকে বচন নয়, সঙ্গীত চাই! তোমাদের অঙ্গ থেকে চৈত্রের ঘূর্ণিতে কেঁপে ওঠা সদানীরা নদীর উত্তাল হিল্লোল চাই!

সঙ্গে সঙ্গে দুই অপ্সরা শুরু করল সঙ্গীত এবং নৃত্য। সঙ্গীতের বাক্যগুলি যেন কামকলার শব্দানুবাদ, আর নৃত্য যেন বাৎসায়নের রতিআসনের পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরিক অনুবাদ।

ভট্টবামনের নাটমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ইন্দ্রপ্রশস্তি' নাটক। নগরীর অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষই কেবলমাত্র সেখানে দর্শক হবার সৌভাগ্য লাভ করে। তারা সবাই নাটকের সাথে একাত্ম। নর্তকী অপ্সরা তিনজন তুমুল সঙ্গমভঙ্গিমায় দেহে হিল্লোল তোলামাত্র অস্ফুট কামার্ত ধ্বনি বেরিয়ে আসছে দর্শকদের মুখ চিরে। দর্শক আসনে বিপদাপন্ন চেহারা নিয়ে পাংশু মুখে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন হরিভদ্র, উপগুপ্ত, প্রিয়রক্ষিত, সুভদ্র, বিনয়পালিত। এই অশ্লীল গর্ভস্রাব তাদেরকে চাক্ষুষ করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। সেই বেদনায় প্রত্যেকেই লজ্জা এবং আত্মধিক্কারে মুহ্যমান। এই নাটকের দৃশ্য দেখে তাদের শরীর রি রি করছে। ইচ্ছা হচ্ছে এখনই সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীর এবং মন থেকে এই পঙ্কিলতা ঘষে ঘষে তুলে ফেলে। অন্তত এই মুহূর্তেই এই নাটমণ্ডপ ত্যাগ করতে পারলেও কথঞ্চিৎ শান্তি হয়তো পাওয়া যেত। কিন্তু তাদের ওঠার উপায় নেই। তাই স্থানুর মতোই বসে থাকতে হয়। এখান থেকে উঠে গেলে সেটাকে ভট্টবামন তার ব্যক্তিগত অপমান হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। তাহলেই সর্বনাশ!

মহারাজের সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদনপত্র পাঠানোর তিনদিনের মধ্যেই পাঁচ বৌদ্ধ-আচার্যকে অবাক করে ভট্টবামন জানালেন যে তিনি নিজেই এই সাক্ষাতের আয়োজন করে দিতে চান।

কবে?

যেদিন আচার্যরা চাইবেন।

আজকে সেই দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। মহারাজ আচার্যদের সঙ্গে দেখা করবেন আজ রাতে। তাদের সাথে তিনি নৈশভোজেও মিলিত হতে চান। তাই ততক্ষণে তাদের আপ্যায়ন করতে চান ভট্টবামন নিজে। তাদের সম্মানেই ভট্টবামনের নাটমণ্ডপে আয়োজন করা হয়েছে এই নাট্য প্রদর্শনীর।

ভট্টবামনের কাছ থেকে এমন ইতিবাচক এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়ে প্রায় হতভম্ব হবার দশা তাদের প্রত্যেকেরই। হরিভদ্র, উপগুপ্ত, প্রিয়রক্ষিত, সুভদ্র, বিনয়পালিত– প্রত্যেকেই গত কয়েকটি রাত্রি কাটিয়েছেন বিনিদ্র। তাঁরা কথোপকথনের নামে বির্তকের ছক কেটেছেন; যাতে ভট্টবামন কোনোক্রমেই মহারাজাধিরাজ মহীপালের সঙ্গে তাদের একান্ত সাক্ষাতের পথ রুদ্ধ করতে না পারেন। কিন্তু তারা পাঁচজন মহামাত্যের কার্যালয়ে প্রবেশ করামাত্র জানতে পারলেন যে ভট্টবামন তাদের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাতের সুচারু ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পাঁচ বিহারের অধ্যক্ষ একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ভট্টবামন খেয়ালই করেন না যেন তাদের দ্বিধা। নাটক শেষ হওয়ার পরে তিনি জানান, মহারাজ একান্তেই যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে কথা বলবেন বৌদ্ধ ধর্মনেতাদের সঙ্গে। ততক্ষণ তিনি নিজে সম্মানীত অতিথিদের আপ্যায়ন করে ধন্য হতে চান।

তা আপনারা ঠিক কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান মহারাজের সঙ্গে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়রক্ষিত কিছুটা স্খলিত বিহ্বল স্বরে উত্তর দেন– আমাদের আলোচনা আর কী নিয়ে হবে মহামাত্য! ধর্ম-কর্ম ছাড়া আমাদের জীবনের পরিধিতে আর কিছুই নেই। তাই আমাদের আলোচনাও এই ধর্ম-কর্ম সম্পর্কেই আর কী।

সে তো বটেই। সে তো বটেই। আপনারা মহাত্মা বুদ্ধের পায়ে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন সম্পূর্ণরূপে। ধর্ম তো আপনাদের ধ্যান-জ্ঞান হবেই। আমারও ইচ্ছে করে নিজেকে ধর্মকাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখতে। কিন্তু– বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ভট্টবামন– জাগতিক যে গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পিত, তা পালনের জন্য অষ্টপ্রহর নিয়োজিত রাখতে হয় নিজের শ্রম-মেধাসহ সবকিছু। শুধু যখন আপনাদের মতো ধর্মাত্মাদের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি কিছুক্ষণের জন্য, কেবলমাত্র তখনই আমি পাই চিত্তের প্রশান্তি, আত্মার বিশ্রাম। তাই আমি মনে মনে সবসময় লালায়িত হয়ে থাকি আপনাদের মতো মহাত্মাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য।

সৌজন্যতার পরাকাষ্টা দেখে পাঁচ অধ্যক্ষ একটু বিহ্বলই হয়ে পড়েন। এতটা বিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কোন উত্তর দেওয়া উচিত, তা ভেবে বের করতে সময় লাগে।

কিন্তু তারা কথা বলার আগেই আবার নিজের কথার খেই ধরেন ভট্টবামন– এই অরাজক দেশে, ইতর প্রাণীদের মতো অসুর-অনাস-ম্লেচ্ছভূমিতে দেবচিন্তা বয়ে এনেছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে মহান এই দুই ধর্মে কোনো বিভেদ তো নেই। দুই ধর্ম যেন বিশ্বপিতার ঔরসে জন্ম নেওয়া দুই সহোদর। আর এখনতো দুই ধর্ম দিনে দিনে প্রায় এক হয়ে এসেছে। চান্দ্রব্যাকরণের বৃত্তিকার ধর্মদাস কী সুন্দর লিখেছেন –

রুদ্রো বিশ্বেশ্বরো দেবো যুষ্মাকং কুলদেবতা।
মারজিদ্ ভগবান্ বুদ্ধঃ অস্মাকং কুলনন্দনঃ।।

(রুদ্র বিশ্বেশ্বর দেব তোমাদের বংশের ঠাকুর। মার-জয়কারী ভগবান বুদ্ধ আমাদের বংশের আনন্দবর্ধন।)

সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু যাকে 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি দিয়েছেন, সেই রামচন্দ্র কবিভারতী লিখেছেন–

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদং বচো
যস্মিন রাগলবোহপি নৈবন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যাহেতুর নন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোহথবা স ভগবংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(জ্ঞান যাঁর সমস্ত বস্তু ও বিষয় ব্যাপী, বাক্য যাঁর নির্মল, চিত্তে যাঁর আসক্তির কণামাত্র নেই এবং দ্বেষ ও মোহও নেই, যাঁর হেতু অজস্র কৃপামাধুরী অনন্ত সুখ দান করছে– তাঁকে বুদ্ধই বলি অথবা গিরিশই বলি– সেই ভগবানকে আমরা নমস্কার করি।)

থরে থরে খাদ্যবস্তু নিয়ে আসে গৃহভৃত্যেরা। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়।

পাঁচ আচার্য একটু জড়োসড়ো হন– মহারাজের সঙ্গে যদি নৈশভোজে যোগ দিতে হয় তাহলে এমন অসময়ে খাদ্যগ্রহণ...

ভট্টবামন জোড়করে দাঁড়ান– একটু সেবা করুন! নয়তো গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাছাড়া মহারাজের নৈশভোজে অনেক বিলম্ব ঘটে। প্রায়শই তিনি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ নৈশভোজে বিলম্ব করে থাকেন। ততক্ষণে এইটুকু খাদ্যবস্তু আপনাদের পাকস্থলি জীর্ণ করে ফেলবে।

ভৃত্যদের পরিবেশনের ইঙ্গিত করলেন তিনি।

খাওয়া শেষে পালা আসে বহুমূল্য পরসুক পান করার (বন্য দ্রাক্ষার রস)। স্বচ্ছ স্ফটিকসুলভ কাচপাত্রে এই পানীয় স্বর্গীয় বর্ণ ধারণ করে। পাঁচ আচার্য জানেন না এই পানীয়ের নাম। কিন্তু তারা কেউই দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না পানপাত্রের দিক থেকে। তাদের আপ্লুত বিহ্বল মুখাবয়ব দেখে মনে মনে হাসলেন ভট্টবামন। বললেন– এই পানীয় এসেছে বহু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোম নামক ম্লেচ্ছদের দেশ থেকে। এর নামই পরসুক।

নাম শুনেই চমকে উঠলেন পাঁচ আচার্য। এই সেই পরসুক! ভূ-পর্যটক শ্রমণদের কাছে তারা শুনেছেন, পৃথিবীতে পরসুকের চাইতে উন্নত কোনো পানীয় নেই। স্বচ্ছতম ঝরনার জল, বিশুদ্ধতম সৈন্ধব লবণ, আম্রপালির বনের মধু, কামধেনুর প্রথম প্রত্যুষের দুগ্ধ, পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম দ্রাক্ষারসের পাতনের সংমিশ্রণে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তার নাম পরসুক। এই নির্দোষ কিন্তু মহামূল্য পানীয়ের কথা চিরকাল শুনেই এসেছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। আজ পান করার সুযোগ পেয়ে তারা সারাজীবনের একটি বিরাট অতৃপ্তি প্রশমিত করার অনুভূতি লাভ করলেন।

এবার ভট্টবামন নিজে তাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন মহারাজের প্রাসাদে। যাপ্যযানে (পালকি) চড়ে তারা রওনা দিলেন প্রাসাদের দিকে।

সেখানেও তারা চমকের পরে চমকে চমকিত। তাদের অভ্যর্থনা জানাতে স্বয়ং মহারাজ এসেছেন প্রাসাদের সিংহদরজায়! মুহূর্তে বিগলিত হয়ে গেল পাঁচ অধ্যক্ষের বিক্ষুব্ধ হৃদয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রণাকক্ষে নয়, একেবারে মহারাজের নিজস্ব বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের।

আশীর্বচন, কুশলাদি বিনিময়ের পরে কাজের কথা।

আবেদন জানানোমাত্র একযোগে সম্মতি দিলেন মহারাজ এবং মহামাত্য। এতদিন বিভিন্ন ব্যস্ততায় বিহারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন মহারাজ। এসব ব্যাপার তাঁকে মনে করিয়ে দেবার কিছুটা দায়িত্ব বর্তায় অবশ্যই মহামাত্যের কাঁধে। তিনি সেই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি তাই নিজেও লজ্জিত বলে জানালেন ভট্টবামন। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন কী করা যায়। তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দান করা হলো প্রতিটি বিহারের বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিহারের জন্য বরাদ্দ করা হলো দশটি করে গ্রাম। আগামীকাল প্রভাতেই তাম্রফলকের দানপত্রে নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রার ছাপ দিয়ে দেবেন মহারাজ। পাঁচ অধ্যক্ষই মহা খুশি।

কিন্তু আরও প্রাপ্তির বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। মহারাজ জনালেন, বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে এক মহাবিহার। যা হবে নালন্দার সমতুল্য। মহারাজা ও মহামাত্য এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। সেই মহাবিহারের নকশা প্রস্তুত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বিশ্বের স্থপতিকুলশিরোমণি ধীমান এবং তার সুযোগ্য পুত্র বীতপালের ওপর। বরেন্দ্রভূমির সোমপুরে টিলার ওপরে এই মহাবিহার নির্মিত হবে। মাঝখানের মন্দিরে থাকবে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের বিশাল মূর্তি। সেখানে থাকবে একশত শ্রেণীকক্ষ, ও দশ হাজার ভিক্ষু শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেক মাসে মহাবিহারে আয়োজন করা হবে কমপক্ষে একটি করে শিক্ষা ও ধর্মীয় উৎসব।

একটি বড়-সড় গ্রামের মতো বিশাল স্থান জুড়ে তৈরি হবে আটটি মঠ। প্রতিটি মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হবে একশত কুড়ি পাটক করে ভূমি। প্রত্যেক মঠে অধ্যাপক ও ছাত্ররা ছাড়াও থাকবেন একজন করে গণক, একজন কায়স্থ (হিসাবরক্ষক), চারজন মালাকার, দুইজন তৈলিক, দুই কুম্ভকার, পাঁচজন কাহলিক (ঢোলবাদক), দুইজন শঙ্খবাদক, দুইজন ঢক্কাবাদক, চারজন দ্রগড়বাদক (সময় জ্ঞাপক ঘন্টা), কর্মকর ও চর্মকার মিলে বাইশজন, একজন নট, দুইজন সূত্রধর, দুই স্থপতি, দুই কর্মকার, আটজন বেট্টিক (চাকর)। অধ্যাপক সম্মানী হিসাবে পাবেন দশ দ্রোণ দশ পাটক জমির আয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 'পালিফুট্টাকার্থং' (খাদ্যসহ ব্যয় নির্বাহ) বাবত এক পাটক জমির আয়, অতিথিসেবার জন্য পাঁচ পাটক ভূমির আয়। এছাড়া ভাণ্ডারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণের জন্য এক পাটক জমির আয়, গনকের জন্য এক পাটক জমির আয় এবং কায়স্থের জন্য আড়াই পাটক জমির আয়। মালাকার তৈলিক কুম্ভকার কাহলিক শঙ্খবাদক ঢক্কাবাদক দ্রগড়িক কর্মকর চর্মকার প্রত্যেকে অর্ধ পাটক, নট দুই পাটক, সুত্রধর ও স্থপতি প্রত্যেকে দুই পাটক এবং প্রত্যেক বেট্টিক পৌণে এক পাটক ভূমির আয় পাবে। ভাঙ্গা এবং ফুটো চালাগুলি সারানোর জন্য দশ পাটক এবং নতুন কোনো নির্মাণ কাজের জন্য সাতচল্লিশ পাটক ভূমির আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া মহাবিহারে যাতে কখনোই কোনো জলকষ্ট না হয় সেই জন্য খনন করা হবে যথেষ্ট সংখ্যক গভীর কূপ। তবে পাশাপাশি পানীয় জল রান্নাঘরে এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের কক্ষে পৌঁছে দেবার জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বারিক (জলবাহক)। বারিকের পারিশ্রমিক বাবত বরাদ্দ করা হয়েছে দেড় পাটক ভূমির আয়।

সাধু! সাধু!

পাঁচ অধ্যক্ষ অভিভূত। এছাড়া আর কোনো বাক্য নিঃসৃত হতে পারে না তাদের কণ্ঠ থেকে। কৃতজ্ঞতা জানানোর আর কোনো ভাষা তারা খুঁজে পান না। একবার শুধু বলেন– এর জন্য যে অনেকগুলি গ্রাম সম্প্রদান করতে হবে মহাবিহারের নামে!

সে বিষয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই– অম্লানবদনে আশ্বাস দেন ভট্টবামন– বরেন্দ্রীতে আর যাই হোক, নালভূমির অপর্যাপ্ততা নেই। অসভ্য কৈবর্তরা অনেক খিলক্ষেত্রকে (পরিত্যক্ত ভূমি) অন্তত শস্য ফলানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছে। সেই কারণেই তো আমরা সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠার জন্য বরেন্দ্রভূমিকেই বেছে নিয়েছি। কৈবর্তরা অনন্তকাল চালিয়ে যাবে মহাবিহারের ব্যয়নির্বাহের কাজ। বিনিময়ে তাদের অসুরযোনীতে জন্মগ্রহণের পাপ অন্তত মোচন হবে কিছুটা।

মহামাত্যের দূরদর্শিতা তো সর্বজনবিদিত। তার আর নতুন করে প্রশংসা জানানোর দরকার কী? তবুও পঞ্চ আচার্য পঞ্চমুখে প্রশংসা শুরু করলেন ভট্টবামনের নিখুঁত পরিকল্পনার। স্মিতমুখে তাদের প্রশংসাবাক্যগুলি গ্রহণ করলেন মহামাত্য। তারপরই ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা। ভারি কণ্ঠে বললেন– অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ ও তাঁর সংঘের সেবায় যৎকিঞ্চিৎ অবদান রাখতে পেরে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। কিন্তু বিনিময়ে আমরা, মানে এই পাল সাম্রাজ্য, আপনাদের কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্য যাচঞা করছি।

মুহূর্তে ভারি হয়ে ওঠে কক্ষের পরিবেশ। পাঁচ আচার্য অস্বস্তির সাথে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারপর অপেক্ষা করতে থাকেন মহামাত্যের পরবর্তী বাক্যের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভট্টবামন বলেন– আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা কোনো কৈবর্ত বা চণ্ডালকে বুদ্ধের সংঘে গ্রহণ করবেন না।

কেন?

আর্যরক্তের শুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট থাকতে হবে।

একথা বলার পরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকান ভট্টবামন। বোঝার চেষ্টা করেন সবার প্রতিক্রিয়া। তারপরে ফের সূত্র ধরেন আগে বলা বাক্যের– আমি আগেই বলেছি, এই ভূখণ্ডের বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয়েই আর্য রক্তের ধারা বহন করছে। পিতৃ-উত্তরাধিকারের দিক থেকে তারা মূলত এক। আমরা হিন্দুরা, আমাদের শাস্ত্রের সাক্ষ্য পেয়েছি একথার সত্যতা প্রমাণে। এমনকি হিন্দুরা বিষ্ণুর যে দশ অবতারকে শ্রেষ্ঠ জেনে পূজা করেন, তাঁদের মধ্যেও গৌতম বুদ্ধ রয়েছেন। আপনারা বোধহয় জানেন যে এই দশাবতার হচ্ছেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি। আপনারা যদি হিন্দুদের পাশপত মঠে যান, সেখানে যে শিবমূর্তি দেখতে পাবেন, সেই শিবের মাথার উপরে দেখবেন বরাভয় মুদ্রাধারী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব। সেখানে প্রায়শ্চিত্তকারীরা পাপমুক্তির যজ্ঞ করতে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তা হচ্ছে–

জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা
তদপকৃতি স্তব লেনাকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং লজ্জে
গতিতুমহং তব পাদপঙ্কজভক্তঃ।।

(জগতের উপকারসাধনই বুদ্ধের পূজা। তার অপকারসাধনই, হে লোকনাথ, তোমার পীড়া। হে জিন, জগতের অপকারী আমি কেন লজ্জা বোধ করছি না এই কথা উচ্চারণ করতে যে আমি তোমার পাদপঙ্কজের ভক্ত।)

হরিভদ্র মৃদুকণ্ঠে বলেন– জানি। এসব কথা আমরা জানি। কিন্তু...

তার বাক্য শেষ করা সম্ভব হয় না। এবার বাধা দেন স্বয়ং মহারাজ। বলেন– আপনার দ্বিধার কোনো কারণ নেই আচার্য। মহামাত্য যা বলেছেন, যুক্তিযুক্ত জেনে আমার সঙ্গে পরামর্শক্রমেই বলেছেন। দয়া করে তার অবশিষ্ট কথাগুলিও শুনুন।

ভট্টবামন ফের বলতে শুরু করেন– আমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে দুই ধরনের বিবাহের কারণে। অনুলোম বিবাহ (ব্রাহ্মণ ও অন্য দ্বিজদের সাথে নিম্নবর্ণের নারীদের বিবাহ) এবং প্রতিলোম বিবাহ (ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ)। এতে সৃষ্টি হচ্ছে বর্ণশংকর, পারশব এবং চণ্ডালদের। এদের মধ্যে চণ্ডালরা (ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র পুরুষের বীর্যে উৎপন্ন সন্তান) হচ্ছে আমাদের সমাজের ভয়ঙ্কর এক সমস্যার নাম। এদের সম্পর্কে মনুর বিধানে লেখা আছে– চণ্ডালদের আশ্রয়স্থল হতে হবে গ্রামের বাহিরে। তাদের অপপাত্র করবে (জলপাত্রাদি দেবে না), এদের ধন বলতে থাকবে কুকুর ও গাধা। এদের পরিধেয় বস্ত্র হবে শববস্ত্র, ভোজন ভগ্নপাত্রে, অলংকার লোহার বেড়ি। ধর্মানুষ্ঠানকারী লোক তাদের সাথে দর্শনাদি আলোচনা করবেন না। তাদের ঋণদানাদি পরস্পর (নিজেদের মধ্যে) হবে, এবং বিবাহ হবে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই। এদের অন্ন পরাধীন (অর্থাৎ ভদ্রজন সরাসরি এদের হাতে বা থালায় অন্ন তুলে দেবেন না, দেবেন ভৃত্যের মাধ্যমে), অন্ন দিতে হবে ভগ্নপাত্রে, তারা রাত্রিকালে কোনোমতেই কোনো নগরে ও ভদ্রগ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি দিনের বেলাতে প্রবেশ করে তাহলেও সেখানে রাজার অনুমতিতে কোনো চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে দ্বিজদের স্পর্শদোষ না ঘটিয়ে বিচরণ করবে এবং অনাথ শব লোকালয় থেকে বাহিরে বহন করে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কৌটিল্যের একটি সাবধান বাণী মনে রাখবেন– যে রাজ্য শূদ্রবহুল, শস্তিকাকীর্ণ ও দ্বিজহীন, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

জন্মের বিচারে দেখুন, অসুর-বীর্যে পৃথিবীর গর্ভে কৈবর্ত জাতির জন্ম। এরা চণ্ডালের সমগোত্র। কাজেই এদের জন্য যদি আপনারা বোধিসত্ত্বের শরণ উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে ওরা বেশি বেশি মিশে যেতে থাকবে আর্যদের সঙ্গে। আরও বেশি করে সৃষ্টি হবে ঘৃণীত শঙ্কর জাতির। তাতে রাজ্যবিনষ্টির সমূহ আশংকা। তাই অনুরোধ, ব্রহ্মার পদতল থেকে যাদের সৃষ্টি, তাদের চিরকাল পদাবনতই রাখতে হবে, ভগবান প্রকৃতির এই নিয়ম মেনে নিয়ে নিয়মটিকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকুন। কোনোমতেই, আবার বলি, কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কৈবর্তদের।

কৈবর্তদের যে কতটা ঘৃণা করেন ভট্টবামন তা বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিবারই কৈবর্ত শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু ও নাসিকার তীব্র কুঞ্চন দেখে।

০৮. ওলান ঠাকুর কথা বলেন

দিব্যোকের কার্যালয়ের সামনে শত শত মানুষ। বরেন্দির সবগুলি গ্রামের মণ্ডল, কুলিক, অষ্টগ্রামিক, দশগ্রামিক, কৈবর্ত-পুরোহিত সবাই একসঙ্গে ধরনা দিতে এসেছে আজ। সবাই বিক্ষুব্ধ। কৈবর্তদের কি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায় মহারাজা মহীপাল আর তার লোকজন? তা নইলে কেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে অত্যাচার?

দিব্যোকের মন্ত্রণাকক্ষে এত লোকের স্থান সংকুলান হবে না। তাই সকলকে নিয়ে কার্যালয়-চত্বরের গাছের ছায়ায় বাঁশের চাঁচের পাটি বিছিয়ে আলোচনায় বসে দিব্যোক। শুনতে চায় সমস্যার কথা।

সমস্যা তো সেই ভূমি, সেই ভূমিকর, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, সেই বেগার। রাজা একের পর এক গ্রাম দান করে চলেছেন পুণ্যের নামে। আর তার সম্পূর্ণ হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে কৈবর্তপ্রজাদের। সেই সাথে কোল, ভিল, কোচ, রাজবংশীরাও সমান ভুক্তভোগী।

শনিয়া মণ্ডল প্রথমেই শুরু করে– আমরা এখন কার প্রজা বটি?

কার প্রজা মানে? মহারাজাধিরাজ মহীপালের প্রজা।

আমরা কার লিয়মে চলব?

রাজার লিয়মে।

বুধিয়া মণ্ডল এবার কথা বলে ওঠে– তা সেই রাজার লিয়মটা কী?

কেউ কোনো কথা বলে না বেশ কিছুক্ষণ। আঙিনার ছায়ার বাইরে রোদে পুড়ে পুড়ে আরও তামাটে হয়ে যাচ্ছে বরেন্দির মাটি। মাঝে মাঝে রোদে তেতে ওঠা বাতাসের ঝাঁওয়াল কালো নাঙা শরীরগুলোর গায়ে দমকায় দমকায় গরমের হলকা ছিটিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অষ্টপ্রহর ঘামতে থাকা শরীরগুলো থেকে এই বাতাস ঘাম শুষে তো নেয়-ই না, বরং ঘামের ধারা এবং গায়ের জ্বালা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে এই মুহূর্তে প্রকৃতির গরমের চাইতে অন্তরের রাগ-ঝালের গরমেই বরং টগবগ করে ফুটছে মানুষগুলো। বেশ কিছুটা সময় উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেও দিব্যোকের মুখ খোলার লক্ষণ না দেখে বুধিয়া নিজেই আবার মুখ খোলে– রাজার লিয়মে আমরা আমাদের ভুঁই চষি, ধান ফলাই, ফসল কাটি, ঝেড়ে-মেপে ঘরে তুলি। আর বছর অন্তর তার ছয় ভাগের এক ভাগ তুলে দিই রাজার লোকের হাতে। ঠিক কি না?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক!

এই লিয়ম মোদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের। ঠিক কি না?

হ্যাঁ ঠিক বটি।

তুমি দিব্যোক, তুমি যখন বরেন্দির রাজা হলে...

না, আমি রাজা লই– দিব্যোক বলেন– রাজার লোক বটি।

হ্যাঁ, যখন রাজার লোক হলে, তখনও তো সেই আগের লিয়মই।

হ্যাঁ, সেই লিয়মই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখন যে এক-এক গাঁয়ে এক-এক লিয়ম। এখন অনেক গাঁয়ে আর রাজার লিয়ম নাই। কোনো গাঁয়ে বামুনঠাকুরের লিয়ম, কোনো গাঁয়ে অশোক শ্রীজ্ঞানের লিয়ম। আমরা এখন কোনটা মানি?

এ কথার উত্তর দিব্যোকের অজানা। রাজা যে মহাবিহার এবং মন্দিরের জন্য একের পর এক গ্রাম দান করে চলেছেন, তার ফলে কৈবর্তদের বড় অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও সে উপযুক্ত কোনো সমাধান খুঁজে বের করতে পারেনি।

দশগ্রামিক ভোয়ীল খুবই অভিজ্ঞ মানুষ। বহুদিন ধরে রাজ-কার্যালয় এবং কৈবর্তপ্রজাদের মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করে আসছেন। মধ্যবর্তিতা যে করে, প্রকৃতিগতভাবেই তাকে ঠাণ্ডা স্বভাবের হতে হয়। সেই ভোয়ীলকেও আজ বিক্ষুব্ধ মনে হয়– এ কী অনাচার বাপু! লিয়ম ছিল কর দিতে হবে ফসলের আট ভাগের এক ভাগ। পরে বাড়িয়ে করল ছয় ভাগের এক ভাগ। এখন সেটিও শুধু আছে লিয়মের নামে। আসলে নিয়ে যাচ্ছে যা খুশি সেই পরিমাণ। তাহলে আমাদের খাওয়ার জন্যে থাকলটা কী? এ কি অনাচার লয়?

খালি কি জমি?– উঠে দাঁড়ায় মৎস্যজীবী কিছু কৈবর্ত– চিরকাল শুনেছি খাল-বিল-নদী-হাওড় সব ওলান ঠাকুরের সম্পত্তি। যে সব গাঁয়ের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে, খাল ঢুকেছে যেসব গাঁয়ের পেট চিরে, সেই সক্কল গাঁয়ের মানুষের জন্য ধরতি মা অধিকার দিয়েছে জলের-মাছের-গুগলি-শামুকের। চিরকাল শুনে আসছি আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দার সময় থেকে, কেউ কুনোদিন নদী-খালের ওপর অন্যায্য হাত বাড়ায়নি। এতদিন সেই জলের ফসলই আমাদের মুখের অন্ন যুগিয়েছে। আর এখন? এখন ঘাটে ঘাটে বসিয়েছে ঘাটক। তারা বলে– দিতে হবে জলকর। বলে একবার ডোঙা-জাল নিয়ে জলে নামলে দিতে হবে আধা কার্ষাপণ। দিতে না পারলেই কেড়ে নেবে মাছ জাল সবকিছু।

আর হঠাৎ হঠাৎ মঠ থেকে, বিহার থেকে, মন্দির থেকে, আজ্ঞা নিয়ে আসবে রাজপুরুষ। আসবে সেই সূর্যের আলো ওলান ঠাকুরের গায়ে পড়ার আগেই। যাকে যাকে ইচ্ছে হবে, আদেশ দিবে, তাকে যেতে হবে বিষ্টি (পারিশ্রমিক ছাড়া বেগার) দিতে। ক্ষেতের কাজ ফেলে, মাঠের কাজ ফেলে, ঘরের কাজ ফেলে তখন যাও বিষ্টি দিতে। যাব না বললেই পিঠে পড়ে কাঁটালাগানো লাঠির বাড়ি। দগদগে গা হয়ে যায় পিঠে। পিছন ফিরে পিঠ দেখা রে তোরা। মোদের রাজার মানুষ দিব্যোক দেখুক তার জাতির মানুষের পিঠগুলোতে রাজার কেমন চিহ্ন আঁকা করা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনে যাই যদি একটা হরিণ-খরগোস কিছু পাওয়া যায়। তাতে অন্তত মাংসের সোয়াদ কিছু হলেও মনে রাখতে পারে ঘরের ছেলে-মেয়েরা। এখন সেখানেও রক্ষী বসিয়েছে। বনকরের কার্ষাপণ না দিয়ে বনে ঢোকা বারণ।

আরে শিকার তো শিকার! মেয়েরা যে কাঠ-পাতা টোকাতে যায় বনে, সেটি পর্যন্ত করার জো নেই। তাদের সাফ কথা, বনে ঢুকতে হলে কড়ি ফেলতে হবে। আর ঝোপ-ঝাড়ের আবডাল পেলে সোমত্ত মেয়েদের ওপর হামলে পড়া তো আছেই।

তবে হ্যাঁ! আমাদের মেয়েগুলোনও ওলান ঠাকুরের যোগ্য কন্যা বটি! কুকুরের বমির মতোন ফ্যাকফেকে সাদা চামড়ার লোক তাদের দিকে হাত বাড়ালেই টাঙ্গি দিয়ে এমন কোপ মারে যে ডাকাতগুলো পালানোর পথ পায় না। গিয়ে দ্যাখো, সবগুলো বনরক্ষীর গায়ে-হাতে-বুকে টাঙ্গির কোপের দগদগে ঘা।

কৈবর্ত-মেয়েদের বীরত্বের গর্বে সকলের চেহারা কিছুক্ষণের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে বেশিক্ষণ সেই মৌতাত টেকে না। ওরা আবার নিজেদের ফিরিয়ে আনে মূল আলোচনায়–

ওরা নাকি ধম্ম করে। এগুলো কি ধম্ম না অধম্ম?

অধম্ম! অধম্ম! সম্মিলিত শব্দ ওঠে।

ভোয়ীল আবার বলে ওঠে– দিব্যোক, আমরা রাজা-মহারাজা-মন্ত্রী এইসব কিছু বুঝি না। আমরা বুঝি তুমি আমাদের লিজের মানুষ। আমাদের জাতির মাথা। আমরা তাই বলছি তুমি এইসবের বিহিত করো।

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এইসবের বিহিত করো! আবারও সমস্বর কাঁপিয়ে দেয় পুরো চত্বর। সেই সমস্বর এত জোরে বেজে ওঠে যে গরম বাতাসের একটা কুণ্ডলি সেই শব্দের সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজেকে কেন্দ্র করে কয়েক পাক ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যায়।

কিন্তু দিব্যোক চুপ। মাথা নিচু করে বসা।

রা করছ না কেনে দিব্যেক? বিহিত কর তুমি এইসব অধম্মের।

আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি। পত্রের পর পত্র পাঠিয়েছি মহাসন্ধিবি গ্রহিকের কাছে, পুস্তপালের কাছে, অমাত্য-মহামাত্যের কাছে। এমনকি মহারাজের কাছেও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি।

বুধিয়া মণ্ডল বলে– আরে ছোঃ! ওসব লিখা-আঁকার কী কুনো ফল হয়! পত্রে লিখে আর কতটুকুন বলা যায়? আসল হলো মুখের কথা। তুমি মহারাজের কাছে যাও। মুখে মুখে কথা বলো!

সমস্বরে সমর্থন আসে– হ্যাঁ হ্যাঁ মুখে মুখে কথা বলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মহারাজের সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেও পত্র লিখেছি। কিন্তু সেই আবেদনেরও কোনো সাড়া পাইনি।

দিব্যোকের কণ্ঠে অসহায়তা।

এ-ও তো সেই লিখা-আঁকার কথাই বলছে দিব্যোক। আরে জলজ্যান্ত মানুষ সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেসব কথা বলতে পারে, লিখা-আঁকা তো আর তা পারে না। তাছাড়া কাগজ বলো আর তালপত্র বলো, যাতেই লিখা হোক না কেন, সেই জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষকে তো আর কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। এই সাধারণ কথাটা কি ভুলে গেছে দিব্যোক? রাজার লোকের সাথে উঠা-বসা করতে করতে সে-ও এখন কি হয়ে গেছে রাজার লোকদের মতো? তা নাহলে মুখে মুখে কথা বলার পরিবর্তে বার বার কেন লিখা-আঁকার কথা বলছে?

সমবেত কৈবর্ত মোড়লরা একটু বিরক্তই হয় দিব্যোকের উপর। সেই বিরক্তি কীভাবে প্রকাশ করবে ভাবতে একটু সময় লাগে তাদের। ফলে কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা নেমে আসে সভায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক চিৎকার চিরে ফেলে স্বল্পকালীন স্তব্ধতার পর্দা– কট্টলি! কট্টলি!

শব্দটি শোনামাত্র উপস্থিত সবার দেহের মধ্য দিয়ে যেন চড়াৎ করে বিজলি বয়ে যায়।

কে বলে এই কথা! কে ধরতি-মাতাকে ডাকে এই নাম ধরে!

মুকেন্দে ওঝা উদ্বাহু নাচছে। ওলান দেবতার পুরোহিত মুকেন্দে। পুরো কৈবর্ত সমাজের প্রধান ওঝা। তাকে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে নাচতে দেখে এবং চিৎকার করতে শুনে সবার রোম খাড়া হয়ে যায়। ভর উঠেছে মুকেন্দে ঠাকুরের। স্বয়ং ওলান দেবতা এখন ভর করেছে তার ওপর। সে এখন আর শুধু মানষ নয়, সাক্ষাৎ দেবতা। তার কণ্ঠে কথা বলবে ওলান ঠাকুর।

কট্টলি! কট্টলি!

বরেন্দির আদি নাম কট্টলি। বয়স্করা জানে। কিন্তু সবাই এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে বরেন্দি নামেই। আজ এত বছর পরে বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে ফেলে সেই নামকে কেন পুনরুজ্জীবিত করছে ওলান ঠাকুর!

আমি আমার কট্টলিকে চাই! ফিরিয়ে দে আমার কট্টলিকে!

সভার সবচেয়ে সদস্য বয়স্ক শনিয়া মণ্ডল করজোড়ে সামনে দাঁড়ায়– এই তো তোমার কট্টলি বাবা! আমরা সবাই তো কট্টলিতেই আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কৈবর্তদের জন্যে যে কট্টলি বানিয়েছিলাম, তোরা সেই কট্টলিকে ফিরিয়ে আন।

এই কি কট্টলি সেই কট্টলি লয় বাবা?

না। আমার কট্টলি ফিরিয়ে আন।

এবার হতভম্ব হয়ে পড়ে সবাই। কোন দেশের কথা বলছে ওলান ঠাকুর মুকেন্দের মুখ দিয়ে?

এই দেশটা কাদের? কৈবর্তদের। কৈবর্তদের জন্যে বানিয়েছিলাম আমি। এই লাল মাটি, এই উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি, এই লাল নদী, এই বন-জঙ্গল, পাখি-পাখলা, এই মাটির ওপর দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া লু বাতাস– সব কৈবর্তের জন্যে। সবকিছু শুধু কৈবর্তের জন্যে।

এই পর্যন্ত বলেই হাহাকার ফুটে উঠে মুকেন্দের কণ্ঠে– আমার সন্ত তিগুলির জন্যে আর কিছু নাই রে! যে মাটি ছেনে যাদের বানিয়েছি, সেই মাটি আর তাদের নাই রে!

এলোমেলো পা ফেলে ঘুরতে থাকে মাকেন্দে। কারো কারো সামনে দাঁড়ায় দুই-এক মুহূর্তের জন্য হয়তো। যার সামনে দাঁড়ায়, তারই চোখের সামনে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে মাটির দিকে তাকাতে, আকাশের দিকে তাকাতে, তার গাত্রবর্ণের দিকে তাকাতে। তারা নির্দেশিত জিনিসগুলির দিকে তাকায়। কিছু একটা অনুভব করে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মুকেন্দের ইঙ্গিতের পূর্ণ অর্থ। মুকেন্দে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে ঘুরেই চলে। ঘূর্ণি বাতাসের মতো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে চলে। আঙিনায় মেলে রাখা অঞ্জনলক্ষ্মী ধানে কৈবর্তনারীরা যেভাবে ঘুরে ঘুরে পা দিয়ে মলন দেয়, সেভাবে ঘুরতে থাকে মুকেন্দে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মুকেন্দে চলে যায় একেবারে দিব্যোকের সামনে। টকটকে লাল চোখ মেলে তাকায় দিব্যোকের চোখে। কাঁপা কাঁপা আঙুল তোলে তার দিকে– যা কট্টলিকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়!

দিব্যোক কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু তাকে সেই সময় দেয় না মুকেন্দে। আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে– যা কট্টলিকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়!

তারপর ঝটিতে সরে যায় দিব্যোকের সামনে থেকে। তার ঘূর্ণিগতি এতটাই বেড়ে ওঠে যে কেউ আর পুরো অবয়বের মুকেন্দেকে দেখতে পায় না। শুধু দেখতে পায় কোমরে সাদা কাপড় জড়ানো কালো একটা কাঠামো চৈত্রের ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বনবন করে ঘুরছে।

হঠাৎ করেই থেমে যায় সেই ঘূর্ণি। পাক খাওয়া বন্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঝড়ে-পাওয়া গাছের মতো টলতে থাকে মুকেন্দে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দড়াম করে আছড়ে পড়ে রোদতপ্ত লালমাটিতে। খিঁচুনি ওঠে তার। মুখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসে সাদা গ্যাঁজলা। আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠে তার শরীর কয়েকবার। তারপর স্থির হয়ে যায়। লোকজন কাছে গিয়ে দেখে, ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে মুকেন্দের মুখাবয়বের কষ্টের রেখাগুলি। শান্ত স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। শান্তির ঘুম।

দেবতার আদেশ এসেছে!

ফিস ফিস শব্দ ওঠে চারপাশে। তার মানে যুদ্ধ করতে হবে।

না!

দিব্যোক পরিষ্কার জানিয়ে দেয়– যুদ্ধ এখন করা যাবে না।

তাহলে আমরা কী করব? যদি এখন যুদ্ধ না করি, তাহলে কি দেবতার কথা অমান্য করা হয় না?

দিব্যোক বলে– আগে আমরা মহারাজের কাছে ধরনা দিব। বুঝিয়ে বলব আমাদের কষ্টের কথা।

তা সেই মহারাজকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?

গৌড়ে। রাজধানীতে যাব আমরা।

সবাই? সব কৈবর্ত?

না। সবার যাওয়ার দরকার নাই। যাব আমি। যাবে আমার ভাই রুদোক। সঙ্গে যাবে দশগ্রামিক আর মণ্ডলরা।

সবাই গেলে ক্ষতিটা কী?

দিব্যোক বোঝানোর চেষ্টা করে– আমাদের তো ঘোড়া নেই। তাই গৌড়ে যেতে হবে হেঁটে, নয়তো গরুর গাড়িতে। তাহলে গৌড়ে গিয়ে পৌঁছুতেই আমাদের লাগবে এক হপ্তা। ফিরে আসতেও তাই। আর মহারাজের সাক্ষাৎ পেতে যে কত দিন সময় লাগবে তার ঠিক নেই। তাহলে যদি ধরো, পুরো এক মাস বরেন্দির সব পুরুষ বাইরে থাকে তাহলে ক্ষেতের কাজ করবে কে? গরু-ছাগলের দেখা-শোনা করবে কে? বিপদে আপদে নারী ও শিশুদের রক্ষা করবে কে?

মাথা নাড়ে কেউ কেউ– কথা তো অন্যায্য লয়!

ঠিক হয় প্রতিনিধিদল যাত্রা শুরু করবে তুষ্যা পরবের শেষে ওলান ঠাকুরের পূজা শেষ করার পরে।

ততদিন কী করা হবে?

মুচকি হাসে দিব্যোক। বলে– মাঝে মাঝে আমরা শিকার পরব করব।

সঙ্গে সঙ্গে খুশির শব্দ ভেসে আসে জনসমাবেশ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে কাজে লাগানো হয়েছে তরকারির ক্ষেতে। রামশর্মার বিশাল ইক্ষুসাম্রাজ্যের এক পাশে তরকারির ক্ষেত। সেখানে অলাবু, কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া), করবেল (করলা), ইচ্ছর (এঁচর), বাতিঙ্গন (বেগুন), পটল, মূলক (মুলো), হিলমঞ্চি (হেলেঞ্চা শাক) ফলানো হয়। যে ঋতুতে যে তরকারির ফলন হয়, সেই ঋতুতে সেই তরকারির চাষ। এখানকার তরকারি দিয়ে রামশর্মার পরিবার-পরিজন তো বটেই, শ্রমদাসদেরও সারা বছরের তরকারির প্রয়োজন পূরণ করা হয়। একেই বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। রামশর্মার কাছে এই তরকারি ক্ষেতের গুরুত্বও অপরিসীম। তিনি আদর করে একে বলেন– ব্যাঞ্জন উদ্যান।

কাছের পুষ্করণি থেকে ছোট আকারের একটি মৃৎপাত্রে জল ভরে এনে বাতিঙ্গন চারার গোড়ায় ঢালছে পপীপ। এই জলসেচনের কাজ সচরাচর করে থাকে গোলগোমী নারীরা। তারা কাঁখের কলস ভর্তি করে জল এনে ঢালে গাছের চারাগুলিতে। তাদের সাথে পপীপের মতো শিশুদের জুড়ে দেওয়া হয়। এইটুকু ছেলেকে জলটানার কাজ করতে দেখে মাতৃহৃদয় সহজেই জেগে ওঠে গোলগোমীদের ভেতরে। তারা কেউ কেউ পপীপকে কাছে টেনে নেয়। আঁচলে মুছিয়ে দেয় গায়ের ঘাম। মুখে হাত বোলায় স্নেহ-ভালোবাসা মিশিয়ে। কেউ কেউ শাপান্ত করে রামশর্মার– লোকটার বুকের মধ্যে হৃদয়ের বদলে ভগবান ঠেসে দিয়েছে প্রাগজ্যোতিষ পাহাড়ের শিলাপাথর। তা নাহলে এইটুকু দুধের সন্তানকে জলটানার মতো কঠিন কাজে লাগিয়ে রাখতে পারে! এই বামুন ঠাকুরের কত কার্ষাপণ আর স্বর্ণমুদ্রা প্রয়োজন? ও কি চিতায় ওঠার সময় ধন-সম্বল সঙ্গে নিয়ে যাবে? লোকটা মরলে সব সম্পত্তি শেয়াল-শকুনে খাবে। যা বাবা পপীপ, তুই ঐ পনস (কাঁঠাল) গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাক। তোকে জল টানতে হবে না। আমরাই তোর কাজ করে দিচ্ছি।

কিন্তু পপীপ গিয়ে গাছের ছায়ায় হেলান দিয়েছে কি দেয়নি, তেড়ে এল রামশর্মার উদ্যানপ্রহরী। হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরেছে মাথার ওপর– কাজের সময় কুঁড়েমি শ্রী শ্রী রামশর্মার রাজত্বে চলবে না। ওঠ ব্যাটা অসুরের বাচ্চা! যা কাজ কর! নইলে দিলাম বাড়ি মাথায়। এক বাড়িতে ছাতু বানিয়ে দেব তোর মাথার হাড়-মাংস।

গোলগোমী যুবতীরা অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। একজন আগে বেড়ে হাতজোড় করে অনুরোধ জানায়– ঐ টুকুন শিশু একটানা কাজ করতে পারবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না রে। দেখ না কেমন নেতিয়ে পড়েছে! ও থাকুক বসে। টুকুন বিরাম নিক। আমরা বাড়তি খেটে নাহয় ওর কাজটুকুন করে দেবো।

চলবে না! উদ্যানপ্রহরী চিৎকার করে– রামশর্মার খামারে নিয়ম মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। কেউ কারো কাজ করে দেবে এমন নিয়ম নাই। এই বরাহনন্দন অসুরের ছাও, যা ওঠ! নইলে দিলাম ঘা।

অসহায় মেয়েটা বিড় বিড় করে অভিশাপ দেয়– তোর লাঠিধরা হাতে কুষ্ঠ হবে! মাংস খসে পড়বে! চামড়া খসে পড়বে!

উদ্যানপ্রহরী ততক্ষণে বীরত্ব দেখানোর ছুতা পেয়ে গেছে। তার আগ্রহ বেড়ে গেছে শতগুণ। সে লাঠি তুলে নাচায় পপীপের নাকের ডগায়। খোঁচা মারতে যায় তার মাথায়।

ঠিক তখনই উদ্যান-দরজার কাছ থেকে চিৎকার ভেসে আসে এক পুরুষকণ্ঠের– সাবধান রামশর্মার কুকুর! ঐ শিশুর গায়ে যদি তোর ষষ্টির একটা পালকস্পর্শও ঘটে, তাহলে ওটা ঢুকিয়ে দেবো তোর পশ্চাদ্দেশে।

চমকে তাকায় সবাই নতুন কণ্ঠের উৎসের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় এক পুরুষ। পরনে ধুতি। গায়ে উড়নি। এমন পোশাক সচরাচর ব্রাহ্মণ আর অভিজাতরা পরে। কিন্তু এই লোকের গাত্রবর্ণ বলছে সে তাদের দলে নয়। বরং সে পপীপদেরই স্বজাতি। তাকে দেখামাত্র গোলগোমী যুবতীরা সহর্ষে চেঁচিয়ে ওঠে– মল্ল!

তাদের দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসি দেয় মল্ল। তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়ায় উদ্যানপ্রহরীর একেবারে পাশে। তার হাতের লাঠি তখনো উঁচু করে ধরা। সে আসলে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। মল্ল তার হাত থেকে লাঠিটা এমন সহজে ছিনিয়ে নিল যেন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে মোয়া। উদ্যানপ্রহরী চিঁ চিঁ করে বলল– দ্যাখ মল্ল ভালো হবে না বলছি! শ্রী শ্রী রামশর্মা জানতে পারলে তোর...

তার কথা শেষ করতে দেয় না মল্ল। মুখে তার বিদ্রূপ মাখানো মৃদু হাসি। বলে– কী করবে তোর রামশর্মা?

তোর পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

এবার হো হো করে হেসে উঠল মল্ল– পিঠের চামড়া তুলে নেবে। তোর এই লাঠি দিয়ে? তাহলে আগে তোর লাঠির ব্যবস্থাই করা হোক কেনে।

লাঠির দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরল মল্ল। তারপর সবেগে নামিয়ে আনল নিজের ভাঁজকরা হাঁটুর ওপর। মটাৎ করে ভেঙ্গে দুই টুকরা হয়ে গেল লাঠি। লাঠিভাঙ্গার শব্দে আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে গেল উদ্যানপ্রহরী। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিলখিল করে হেসে উঠল গোলগোমী মেয়েরা। হাতের লাঠির টুকরা দুটো দুই দিকে ছুঁড়ে ফেলল মল্ল। উদ্যানপ্রহরী অস্ফুটে বলে– আমার এত সাধের ষষ্টি! তেল খাইয়ে খাইয়ে পাকা করেছিলাম কতদিন ধরে!

আবার হাসে মল্ল– এবার তুই নিজে পালা এখান থেকে। তা নইলে তোকেও দুই টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলব তোর লাঠির মতো।

প্রহরী ততক্ষণে পুরোপুরি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। মিনমিন করে বলে– কিন্তু আমাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে! তা নাহলে রামশর্মা আমাকে কর্ম থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাহলে আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকব!

যা তাহলে উদ্যানের দ্বারে গিয়ে বসে থাক। সেখানে বসে বসে তোর দায়িত্ব পালন কর। ততক্ষণ আমরা দুইদণ্ড রসালাপ করি।

প্রহরী চলে যাওয়ার পরে ধুতির খুঁট থেকে কিছু ছাতু বের করল মল্ল। একজন গোলগোমীকে বলল– নে এতে জল মিশিয়ে পুয়াটাকে টুকুন খাইয়ে দে তো! আর তুই বাবা ছাতু খেয়ে এই ছায়াতে ঘুমিয়ে পড়। তোর কাজ এরাই করে দেবে।

মেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসল মল্লকে– তা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বটি?

আমি কি আর একটা জায়গাতে ছিলাম? হ্যাঁ, যদি এককথায় জিজ্ঞেস করিস যে কোথায় ছিলাম, তাহলে বলব, পথে। পথেই ছিলাম আমি। পথ থেকে পথে। এক পথ থেকে আরেক পথে।

তা কোন কোন পথে ছিলি?

ধর যে কামরূপ থেকে পথ চলতে শুরু করলাম। গেলাম সমতটে। সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ। সেখান থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ।

মেয়েদের চোখ তখন বিস্ফারিত– এত এত জায়গাতে গিয়েছিলি তুই!

হ্যাঁ।

ঐসব দেশ বোধহয় মোদের পৃথিমীর বাইরে! সেইস্থানে ভূত-পেত্নীরা থাকে! লয়?

না না। সেইসব দেশে যারা থাকে তারাও আমাদের মতোই মানুষ।

আমাদের মতোই!

একেবারে আমাদের মতো লয়। তা ধরগে অনেক ভিন্‌তা আছে। তবুও তারা মানুষই।

তারা কেমন মানুষ? ভালো মানুষ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোও আছে। খারাপও আছে।

সেখানে তুই কী করলি বটি?

আমি তো কিছু করতে যাইনি। দেখতে গিয়েছি। দেখেছি।

শুধু দেখার জন্যে কেউ এত কষ্ট করে!

কেনে সখি, শুধু দেখার জন্যেও কি অনেক কষ্ট করতে হয় না! তোমার নাগরের সাথে যখন দেখা করতে যাও, তখন কষ্ট করতে হয় না?

আবার খিলখিল হাসির দমক।

একজন হাসতে হাসতেই বলে– তখন কি আর কষ্টকে কষ্ট মনে হয়? তখন খালি ঘোর নেশা। মহুয়ার নেশার থেকেও বড় নেশা।

তাহলেই বোঝো।

তা তুই কোন সুন্দরীর খোঁজে গিয়েছিলি? পেয়েছিস?

না। কোথাও কোনো সুন্দরী নাই। অন্তত তোদের মতো সুন্দরী কেউ নাই। তাই তো ফিরে এলাম তোদের কাছেই।

মেয়েরা সবাই জানে মিথ্যা কথা বলছে মল্ল। তবু এখন এই মিথ্যা কথা শুনতেও তাদের খুব ভালো লাগে। মিথ্যা এত মধুর হলে সত্যের কাছে কেই-ই বা ফিরতে চায়! তাছাড়া এই দিগন্তবিস্তারি ধূসর মাটির গা বেয়ে বেয়ে বেড়ে ওঠা সবুজ ছোপ ছোপ লকলকে শাক-তরকারির গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উত্তপ্ত বাতাস শরীরে জমা বিনবিনে ঘামের ওপর উষ্ণ শিহরণ তুলে দিচ্ছে, সেই সময় সুপুরুষ এক ভূমিপুত্রের সান্নিধ্য, যার কীর্তিকলাপ ইতোমধ্যেই কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যে কোনো যুবতীর কাছে সত্যের চেয়েও অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত মনে হতে থাকে।

এক তরুণী জিজ্ঞেস করে– এখন থেকে তুই এখানেই থাকবি?

থাকব বলেই না এলাম!

কোথায় থাকবি?

কোথায় থাকব তাই না? বড় কঠিন প্রশ্ন। আচ্ছা তোদের মধ্যে যার ঘরে পুরুষ নাই, তার ঘরেই নাহয় থাকব।

আবারও খিলখিল হাসিতে চুর চুর হয়ে ভেঙে পড়ে উদ্যানের দুপুর।

শবর তরুণী হাসতে হাসতেই বলে– আমাদের কতজনের ঘরেই তো পুরুষ নাই। তা তুই কার ঘরে থাকবি বটি?

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসে– তোর ঘরে।

কেনে কেনে? কলকলিয়ে প্রশ্ন করে একসাথে কয়েকজন যুবতী– মোদের সবাইকে বাদ দিয়ে তুই ওর ঘরে থাকবি কেনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়চোখে একবার পপীপের দিকে তাকায় মল্ল। ছেলেটি পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে মাটির বিছানাতেই। অবশ্য কৈবর্ত আর কোল-ভিল-কোচদের প্রায় সকলেই যখন-তখন মাটিতেই ঘুমাতে অভ্যস্ত। ঘুমের জন্য তাদের পালকের বিছানার প্রয়োজন হয় না। মাটিই তাদের খাদ্যের উৎস, ক্লান্তির আশ্রয়। ছেলেটা বিভোর ঘুমে তলিয়ে আছে দেখে মল্ল এবার নিশ্চিন্ত মনে তরুণীদের সাথে খুনসুটিতে মেতে উঠতে পারে। সে বলে– শবরীর যা আছে... কথা শেষ না করেই চোখ মটকায় মল্ল।

লজ্জায় কালো চকচকে পাথরকোঁদা মুখগুলোতে সিঁদুরের রং ধরে গেছে। তবু আলোচনা থেকে পিছে হটতে সম্মত নয় মেয়েরা। একজন জোরগলায় প্রতিবাদ করে– ওর এমন কী আছে যা আমাদের নাই?

তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তোদেরও আছে বটি।

তাহলে?

তা... আমতা আমতা করে মল্ল– মুখে একবার বলে ফেলেছি যখন ওর কথা...

না না কথা ঘুরান চলবে না। বলতে হবে তাকে। বল ওকে কেন পছন্দ করলি? কী আছে ওর?

তাহলে বলছি। ওর... মানে ওর বুক যেন পাকা তাল্য ফলের সমান।

কানে আঙুল দেয় শবরী।

আর ওর ঠোঁট যেন গরমের দিনের কচি তালশাঁসের মতো মিষ্টি।

এবার লজ্জায় মাটিতে শুয়ে পড়ার উপক্রম হয় শবরীর।

ওর গায়ের বর্ণ যেন প্রায় পক্ক তাল্যগুচ্ছের মতো মৃদু বাতাসে দুলে দুলে কাছে ডাকে।

আর না! আর না! তোর পায়ে পড়ি মল্ল এবার থাম বটি তুই!

শবরীর লজ্জাকাতর নিষেধের অনুরোধ কানেই যেন যায়নি মল্লর। সে বলতে থাকে– আর ওর কাঁকালের ভাঁজ... আহা ওখানে একবার হাত বুলাতে পারলে... আর ওর থোড়-না-ছড়ানো কদলীবৃক্ষের মতো উরু... আহা! আহা!

কলকলিয়ে ওঠা হাসির হররা ছোটে উদ্যান জুড়ে। হাসতে হাসতে বেতসলতার মতো নুয়ে পড়তে যায় কোনো কোনো তরুণী। একজন সেই হাসির ফাঁকে জিজ্ঞেস করে– এমন সব মিষ্টি মিষ্টি খারাপ কথা তুই কোত্থেকে বলতে শিখলি?

এসব কী আবার আলাদা করে শিখতে হয়! তোদের মতো সুন্দরীদের সামনে এলে এসব কথা আপনা-আপনিই মুখ থেকে ছুটে বেরুতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই? কিন্তু আর কোনো পুরুষের কাছ থেকে তো আমরা এমন সব কথা শুনতে পাই না।

ভাগ্যিস সব পুরুষ এই রকমভাবে কথা বলতে পারঙ্গম হয় না! তাহলে আমার ভাত মারা যেত বটি!

এবার এত জোরে সবাই হেসে ওঠে যে গাছের ডালে ডালে বসে থাকা পাখিগুলো ভয় পেয়ে উড়তে শুরু করে। কিন্তু আচমকা হাসির তোড় তাদেরও দিকভ্রান্ত করে দিয়েছে বলে ঠিক কোন দিকে উড়ে যাবে তা যেন তারা বুঝে উঠতে পারে না। তখন শুরু হয় তাদের ভয়-পাওয়া কণ্ঠের কলকাকলি। আর সেই শব্দে জেগে ওঠে পপীপও।

মেয়েরা নিজ নিজ কাজে ফিরতে শুরু করে। এবার মল্ল মন দেয় পপীপের দিকে। জিজ্ঞেস করে– তুই কে বাছা?

আমি পপীপ।

এখানে কেন?

ওরা এনেছে।

রামশর্মার লোক?

জানি না।

এখানে কে আছে তোর?

একটু ইতস্তত করে পপীপ। বলে– বাবা আছে।

বাবার নাম কী?

বট্যপ।

ও তুই বট্যপের ছেলে। চল তোকে তোর বাবার কাছে নিয়ে যাই।

উদ্যানের মূল দরোজা দিয়ে বেরুনোর সময় প্রহরী হাত কচলায়। মল্লকে বলে– ছেলেটাকে এখন যেতে দিলে... আর প্রভু জানতে পারলে... আমার কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে রে মল্ল।

মল্ল তার কথায় কান দেয় না। বলে– তোর প্রভুকে বলিস এই ছেলের ভাগে যে কাজ পড়বে, তা আমি করে দেব।

পপীপের হাত ধরে বেরিয়ে আসে মল্ল– চল তোর বাবার কাছে যাই।

পপীপ বলে– আমি মায়ের কাছে যাব!

সেই অনুচ্চ কণ্ঠে বলা শব্দ কয়টিতে এতই নাড়িছেঁড়া আকুতি মেখে আছে যে শোনামাত্র মল্লর দুই চোখ জলে ভরে যায়। সে হাঁটু গেড়ে বসে পপীপের সামনে। উদ্গত কান্না চাপতে চাপতে বলে– অবশ্যই যাবি! আমি তোকে একদিন তোর মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বাপ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দ্বিধায় মল্লর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পপীপ। মল্লর অবয়বের মধ্যে এমন কিছু একটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে তাকে বিশ্বাস না করার কোনো উপায়ই নেই।

কী আছে মল্লর অবয়বে?

অনেক অনেক বছর পরে, পপীপ যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে শিখবে, তখন প্রথম দেখা মল্লর অবয়বকে সে বর্ণনা করবে এইভাবে– 'তার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জক্রদ্বয় (কণ্ঠাস্থি) গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত ও বর্ণ লোহিতাভ, কৃষ্ণমৃত্তিকাতুল্য গাত্রবর্ণ।'

এই বর্ণনা কার সাথে যেন মিলে যায়! কার সাথে?

এ তো অযোধ্যার রামের বর্ণনা! মহান রামচন্দ্র!

পপীপ ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি এনে বলবে– দূর কোথায় মল্ল আর কোথায় রামচন্দ্র! অমন রামসদৃশ পুরুষসিংহ কৈবর্তদের ঘরে ঘরে জন্মায়।

১০. পপীপ তুমি কে?

মনে রাখিস তুই হলি কৈবর্ত। কৈবর্তের জন্যে কয়েকটা লিয়ম আছে। ভগমান যেদিন কৈবর্তকে বানালেন, সেদিন থেকেই তাকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে সেইসব লিয়ম মেনে চলতে হবে। সেইসব লিয়ম যে মেনে চলতে পারে না, সে আসলে কৈবর্ত লয়। প্রথম লিয়ম, কৈবর্ত কোনোদিন অন্য কোনো জাতির মানুষকে নিজের চোখের জল দেখাবে না। তারপরের লিয়ম হলো, কারো কাছে কৈবর্ত কোনোদিন হাত পাতবে না। তারপরের লিয়ম, মুখ থেকে একবার কথা বের হলে সেই কথা থেকে দূরে হটবে না। তার জন্যে দেহ নিপাত হলে হবে, কিন্তু মুখের কথার লড়চড় হবে না। তারপর হলো, নিজের জাতির জন্যে নিজের জীবন দিতে হলে দিতে হবে। সভায় আলোচনা করার পরে, মানে পাঁচজনার পাঁচ কথা শোনার পরে কৈবর্তের মোড়ল-মণ্ডলরা যা বলবে তা অপ্রশ্নে মেনে চলতে হবে।

পপীপের দিকে দুচোখকে তীরের ফলার মতো ধারালো করে নিয়ে তাকায় মল্ল– বুঝতে পেরেছিস আমার কথা?

সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায় পপীপ। মুখ থেকে কথা বের হয় না। তখন মল্লই কথা বলে আবার– বুঝতে পারলি কি না তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু আসে-যায় না। মনে রাখতে হবে, আর মেনে চলতে হবে লিয়মগুলো। তাহলেই হবে।

পপীপ তাকিয়ে থাকে মল্লর মুখের দিকে। সেই দৃষ্টিতে দেবতাকে দেখার মুগ্ধতা। মল্লর সব কথা মেনে চলতে সে সম্মত। কারণ মল্ল কথা দিয়েছে তাকে সে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। মল্লর কথা শেষ হতেই সে আবার নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে– মায়ের কাছে যাব!

অবশ্যই যাবি। কিন্তু তার লগ্ন আসতে হবে রে বাপ।

লগ্ন কী?

যে কাজের যে সময়, সেটাই হলো তার লগ্ন বুঝলি?

বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, মাথা নাড়ে পপীপ। বুঝেছে।

এবার তাহলে যা। ঐদিকে গিয়ে খেলা করগে যা!

একা একা কি খেলা করা যায়?

সত্যিই তো! তাহলে এখন কী করা যায়?

গল্পই চালিয়ে যেতে হয়।

কৈবর্ত কী?

কৈবর্ত হলো একরকম মাটি। হ্যাঁ মাটিই। ভগবান ওলান ঠাকুর মাটি বানালেন। কারণ মাটি দেখলে তার চোখের আরাম হয়। রোদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে চোখে-মুখে ছায়া ঢাকা দিঘীর জলের ঝাপটা দিলে যে রকম শান্তি লাগে, সেই রকম আরাম। তা মাটি তো তৈরি হলো। কিন্তু মাটিরও তো সঙ্গী-সাথী চাই। তার যে বড় একা একা লাগে! তখন ওলান ঠাকুরের ইঙ্গিতে মাটির বিভিন্ন জায়গার দানাগুলি একটার গায়ে একটা লেগে লেগে তৈরি হলো মানুষ। তাই মাটিরও যে রং, মানুষেরও সেই রং। এক বরেন্দির মাটি থেকেই তৈরি হলো কত রকমের মানুষ! কৈবর্ত হলো, কোল হলো, পুণ্ড্র হলো, কোচ হলো, ভিল হলো। তাদের আলাদা আলাদা সীমানা। ওলান ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, নিজের নিজের সীমানাতে থাকবে সবাই। ওঠাবসা, চালাচালি থাকবে, কিন্তু কেউ কারো মাটি নিয়ে খামচাখামচি করতে পারবে না। কেউ তা করেও নি। দরকারই তো ছিল না। সকলেরই তো যা যা দরকার সব ঠিক ঠিক পেয়েছিল ওলান ঠাকুরের কাছ থেকে। একসময় সকলের সবকিছু ছিল।

এই পর্যন্ত এসেই উদাস হতে থাকে মল্ল। তার কণ্ঠ মন্দ্র এবং জলভারাক্রান্ত মনে হতে থাকে–

কৈবর্তদের সব ছিল। সোনাফলানো মাটি ছিল। অঞ্জনলক্ষ্মী ধান ছিল। ছিল ককচি ধান। কৈজুড়ি, কেসুরভোগ, জলরাঙ্গি, চন্দ্রমণি, খয়েরশালি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেজুরছড়ি, কিয়াপাতি, গোহোম, চড়ুইনেচা, ছিছরা, কলামচা, গুয়াশালি, ছায়ারত্ন ধান। সেই ধানের ভুঁয়ে চড়াই-দোয়েলের নাচানাচি ছিল, ধানের চারার সাথে নাচারি-পাছারি ছিল উত্তরা-দক্ষিণা-পূবাল বাতাস-ঝঞ্ঝার, কৈবর্ত নারী-পুরুষের গায়ের ঘাম শুকানোর জন্যে মোদের আদিযুগের বাপ-দাদুরা আদর করে যে ফুঁ দিত, সেইসব ফুঁ-ই তো বাতাস হয়ে এসে লাগত মোদের আর মোদের সন্ততিদের গায়ে! কৈবর্তদের নদী ছিল। লাল আর ঘোলাজলের মিশেল নদী। মানুষের চামড়ার নিচ দিয়ে কত যে নদী বয়ে যায়! তাদের জলের রং লাল। তাদের আমরা বলি রক্ত। সেই রক্তের চিহ্ন নিয়ে লালজলের নদী ছিল কৈবর্তদের। তার জলে যে ঘোলা রং মিশে থাকে, তা তো কৈবর্তের গায়ের ঘাম। তাই মোদের নদী মোদের চিহ্ন মাখা। কৈবর্ত যেখানেই যাক, এক লহমায় চিনে লিবে তার লিজের নদী। যেখানে সেই শোনিত-ঘামের নদী নাই, সেটা কৈবর্তের ঘর লয়। কৈবর্তরা তাই কোনোদিন নিজেদের বরেন্দি ছেড়ে কোনো জায়গাতে যায়নি। কিন্তু বরেন্দিতে এসেছে অনেক মানুষ। মানুষ এসেছে সূর্য উঠার দিক থেকে, মানুষ এসেছে সূর্য ডোবার দিক থেকে, মানুষ এসেছে পাহাড়-নদী-বন পেরিয়ে ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে, মানুষ এসেছে নদীর বানের সাথে যুঝতে যুঝতে পায়ের নিচে শক্ত মাটির পরশ পাওয়ার আশায়, মানুষ এসেছে নিজের বুক চেপে ধরে প্রাণদায়ী নির্মল বাতাসের আশায়, মানুষ এসেছে অন্য মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরাপদ ঘরের আশায়। বরেন্দি তাদের ছায়া দিয়েছে, মায়া দিয়েছে, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েছে, শত্রু-বাঘ-সাপের হাত থেকে বাঁচানোর নিরাপত্তা দিয়েছে, অতিথিকে ভগবান জেনে ভগবানের পূজার ডালি দিয়েছে, শীতের রাতে পোয়ালজ্বালানো উম দিয়েছে, সব দিয়েছে, সব দিয়েছে, সব দিয়েছে।

আর ওরা?

ওরা ওঁত-ঘাঁত চিনে লিয়ে গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছে লিজেদের জাতির কাছে। ওরা জেনেছে কৈবর্তরা অস্ত্র বানাতে জানে। কিন্তু মানুষ খুনের জন্যে অস্ত্র বানায় না। শিকারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি একটাও অস্ত্র বানায় না কৈবর্তরা। অহেতুক অস্ত্র বানানো আর অস্ত্র শানানো কৈবর্তদের ধর্মে নিষেধ। তারা কোনোদিন কোনো মানুষের দিকে উঁচায়নি তাদের বল্লম। তারা কোনোদিন কোনো মানুষের দিকে তাক করেনি তাদের ধনুকের তীর। কৈবর্তের কাছে মানুষ অবধ্য। কৈবর্তদের এই ধর্মই অন্য মানুষদের সুযোগ এনে দিল। সেই সুযোগ ওরা গ্রহণ করল। ওরা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল বরেন্দির ওপর। তারপর...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লর বুক ফুঁড়ে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে– তারপর কত শত বৎসর যে কেটে গেল! বরেন্দি আর কৈবর্ত-বরেন্দি রইল না! কৈবর্তের বরেন্দি আর কৈবর্তের কাছে ফিরল না।

পপীপ সব কথা বুঝতে পারেনি। কিন্তু মল্লর বরেন্দি যে আর মল্লর নেই, মল্লদের নেই, তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেসের ভঙ্গিতে বলে– বরেন্দি আবার ফিরবে! লয়?

মল্লর উদাস ভাব কাটে না– করে যে ফিরবে রে বাপ! আমার বুক যে টাটায়! আমি শিকলপরা বরেন্দির মাটিতে তিষ্টাতে পারি না। বরেন্দি মোরে বার বার তার শিকলবান্ধা দুই হাত দেখায় আর বলে হাতের শিকল মোর খুলে দে মল্ল! এই শিকলের বড় জ্বালা! বড় অপমান! শিকল খুলে দে মল্ল! কিন্তু আমি বরেন্দির কান্না দেখে নিজেও শুধু কাঁদতেই পারি। আমার তো সেই শক্তি নাই! বরেন্দির হাতের শিকল খুলে দেওয়ার শক্তি তো আমার একার নাই।

কেনে? নাই কেনে?

সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না মল্ল। সে নিজের আগের কথাই চালিয়ে যায়– বরেন্দির সেই কান্না আমি শুনতে চাই না। তাই বার বার বরেন্দি ছেড়ে পালাই। দূরে চলে যাই। শ্রমণদের সাথে হেঁটে হেঁটে যাই, সার্থবাহদের সাথে তাদের জলের নৌকায় ঢোল-সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে চলে যাই পৃথিবীর আরেক পারে, অচেনা ভাষার মানুষের সাথে অচেনা পৃথিবীতে চলে যাই, অশ্ববিক্রেতা তুড়ুকদের সাথে চলে যাই তাদের দেশে... কিন্তু বরেন্দির কান্না যে আমার কানকে ক্ষ্যামা দেয় না রে পপীপ, বরেন্দির কান্না আমার বুকরে যে ক্ষ্যামা দেয় না রে পপীপ! বরেন্দির বুকের ওপর দুপদাপ করে হাঁটে ওরা কারা? ওদের গায়ের বণ্ণ দেখেছিস? ওদের গায়ের বণ্ণে মাটির কোনো ছোপ নাই। ওদের শরীরে মাটির কোনো ছোঁয়া নাই। ওরা তাই মাটিকে ভালোবাসতে জানে না। মাটিকে পূজা করতে জানে না রে পপীপ। ওরা জানে মাটির সাথে তস্করতা করতে, মাটিকে লুঠ করতে।

ঢোল-সমুদ্দুর কোনটা? পপীপ জিজ্ঞেস করে– মোদের এখানে আনার সময় একটা সমুদ্দুর পার করিয়েছে কাকা। সে কী ফোঁসফোঁসানি সেই সমুদ্দুরের জলের! সেইটাই কি ঢোল-সমুদ্দুর?

মল্ল বোঝায়– যে সমুদ্দুরের একপাড়ে দাঁড়িয়ে খুব জোরে জোরে ঢোল, মানে জয়ঢাক বাজালেও তার শব্দ আরেক পারে পৌঁছায় না, সেইটা হলো ঢোল-সমুদ্দুর।

শব্দ পৌঁছায় না কেনে? শব্দ কোথায় যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় আবার যাবে! সমুদ্দুর লিজেই সেই শব্দ গিলে নেয়।

নদী-সমুদ্রের কথা থেকে আবার বরেন্দির কথায় ফিরে আসে পপীপ– বরেন্দি ফের মোদের হবে! লয়?

হবেই তো। অবশ্যই হবে! বরেন্দির মাটি ঐ দস্যুদের শাপ দিচ্ছে না? সেই শাপ লাগবেই। মাটির হয়ে মাটির সন্তানরা প্রতিশোধ লিবেই লিবে। মনে রাখিস পপীপ, প্রতিশোধ লিতেই হবে তোকে-আমাকে!

তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বুদ্ধমূর্তির মতো নিশ্চল বসে থাকে মল্লু। শুধু চোখ বেয়ে অবিরল ঝরে পড়তে থাকে অশ্রু। তারপর, অনেক অনেক পল, প্রায় একটা প্রহরের সমান পল কেটে যাবার পরে যখন সে চোখ মেলে তাকায় তখন তাকে অনেকটা ধাতস্থ দেখায়। সে শান্তভাবে পপীপকে বলে– এইসব দস্যুদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কোনটা তা কি জানিস পপীপ?

পপীপ কী উত্তর দেবে!

উঠে গিয়ে একটুকরো শক্ত গাছের ডাল তুলে আনে মল্লু। সেটা দিয়ে মাটির ওপর আঁকিবুকি করে। একটা চিত্র ফুটে ওঠে মাটির ওপর। সেদিকে ইঙ্গিত করে মল্লু বলে– ওদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এটা।

হতভম্ব পপীপ জানতে চায়– ওটা কী বটি?

মল্লু ক্লিষ্ট হাসে– এটা হলো অক্ষর। এটাই হলো ওদের শক্তির প্রাণভোমড়া।

অক্ষর!

হ্যাঁ। এটা দিয়ে ওরা লিখতে পারে। পড়তে পারে। লিখে রাখতে পারে বলে ওদের একজনের জ্ঞান কোনোদিন হারায় না। এই অক্ষর দিয়ে ওরা শাস্ত্র বানায়, লিয়ম বানায়। সেই শাস্ত্র দিয়ে রাজ্য চলে। এটাই ওদের প্রাণভোমড়া। তাই ওরা আমাদের কোনোদিন এই জিনিস শিখতে দিতে চায় না।

তুমি শিখলে কীভাবে?

রামশর্মার কন্যা মুকুলিকার কাছ থেকে।

সে তোমাকে শিখাল কেনে?

রামশর্মার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম প্রাগজোতিষের বাঘের থাবা থেকে। সেই কৃতজ্ঞতায় সে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে গেল তার পরিবারের দেখাশোনার জন্যে। সেখানে মুকুলিকার সঙ্গে আমার প্রেম-পিরিতি হলো। মুকুলিকাই আমাকে শিখিয়েছে।

তার কী হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন ধরা পড়ে গেলাম আমরা। তখন ব্রাহ্মণরা বিধান দিল– শূদ্রপুরুষের বীর্য ধারণ করে মুকুলিকা গর্ভবতী হয়েছে। তার গর্ভের সন্তান হবে সমগ্র আর্যজাতির কলঙ্কচিহ্ন। তাই গর্ভস্থ সন্তানসহ তাকে পুড়িয়ে মারা হলো।

শিউরে উঠল পপীপ– আর তোমাকে কিছু বলেনি? তোমার কিছু ক্ষতি করেনি?

চেষ্টার কমতি তো করেনি! চেষ্টা তো এখনো করছেই। সুযোগ পেলেই আমাকে প্রাণে মারবে ওরা। কিন্তু সরাসরি কিছু করতে পারছে না। কারণ আমি তো ওদের ক্রীতদাসও নই। ওদের রাজ্যের প্রজাও নই। ওদের শাস্ত্র আমাকে ফাঁসাতে পারছে না। শাস্ত্র না মেনে ওদেরও উপায় নাই। আসলে ওরা নিজেরাও ওদের শাস্ত্রের দাস। তাই সবসময় চেষ্টা করে আমাকে অন্য কোনোভাবে বিপদে ফেলার। কিন্তু মল্লকে কে কী করতে পারে! গর্ব ফুটে ওঠে মল্লর কণ্ঠে। তারপরে বলে– সে অনেক কথা। সেসব কথা আরেকদিন বলব। এখন তোকে এই জিনিস শিখতে হবে। অক্ষর শিখতে হবে। লিখতে শিখতে হবে। পড়তে শিখতে হবে। তাহলে হয়তো তুই একদিন খুঁজে পাবি বরেন্দির শিকল ছেঁড়ার পথ।

কে শেখাবে মোরে?

আমি যতটুকু জানি শেখাব। তারপরে তোকে যেতে হবে কাহ্নপার কাছে।

সে কে?

সে জগৎগুরু। পৃথিবীর সকল বিদ্যা তার ঠোঁটের ডগায়।

তাকে কোথায় পাব?

তা তো জানি না রে বাপ। কাহ্নপা যে কখন কোথায় থাকে কেউ তা বলতে পারে না। তবে ভয় নাই। সময় হলে সে লিজেই তোকে দেখা দেবে। যদি তার মনে হয় যে তোকে তার প্রয়োজন। যদি তার মনে হয় যে তোকে বরেন্দির প্রয়োজন, তাহলে সে লিজেই তোর কাছে আসবে। তোকে সর্বশিক্ষা-মন্তর দেবে। এখন আয় তুই। তোর পাঠ নেওয়া শুরু হলো এখন থেকে।

১১. কণ্ঠ ছেনে বজ্র আনো

তারপর শুরু হয় আরেক লুকোচুরি খেলা। পূবের পাহাড় থেকে আসা বাতাসের গায়ে ভেসে ভেসে সূর্যটা তাদের দাসকুঠিরগুলোর চালায় ঠিকরে পড়ার আগেই রামশর্মার মন্দিরের স্তোত্রপাঠ আর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ জাগিয়ে তোলে ইক্ষুক্ষেতের কর্মীদের। কিন্তু তারও আগেই বট্যপের ঝুপড়ির দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে মল্ল। সে আলতো ধাক্কায় জাগিয়ে দেয় পপীপকে। আর পপীপ কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধা-আলস্য না করে শয্যা ছেড়ে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে যায় মল্লর সাথে। পিতা বট্যপ ভয় পেয়েছিল। মল্ল তো সকলের কাছে ডাকাবুকো। তার খামখেয়ালিপনা আর অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে বিপদে ঝাঁপ দেওয়ার অভ্যাসের কথা সকলেরই জানা। এই রকম একজন মানুষের সংস্রব তার ছোট্ট ছেলেটার জন্য কী বিপদ ডেকে আনে কে জানে! কিন্তু মল্ল যখন জানাল যে পপীপ এই ইক্ষুক্ষেতে ক্রীতদাসত্বের জীবন কাটানোর জন্য জন্ম নেয়নি, সে সেই ব্রহ্মাস্ত্র আয়ত্ত করার কাজে নিমগ্ন হয়েছে যা দিয়ে বরেন্দিকে মুক্ত করা হবে চিরতরে, তখন সবকথা না বুঝলেও আশীর্বাদ করে ছেলেকে মল্লর হাতে তুলে দিয়েছে সে।

রামশর্মার স্তোত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পপীপের পাঠগ্রহণ। একটানা চলে জলখাবারের ঘণ্টা বেজে ওঠা পর্যন্ত। জলখাবারের সময় অন্যদের সাথে পংক্তিতে বসে যবাগু (যবের মণ্ড দিয়ে তৈরি জাউ), অথবা কড়কচ্চ (লবণ) মেশানো ছাতু খায় পপীপ। সবাই নিজ নিজ কাজের দিকে অগ্রসর হলে সে আবার আলগোছে সরে পড়ে। ব্যঞ্জন-উদ্যানের প্রহরীর সাথে বলা-কওয়া আছে। সে কখনো পপীপের খোঁজ নেয় না। গোলগোমী মেয়েরা পপীপের অংশের কাজ করে দেয়। আর পপীপ চলে যায় মল্লর সাথে এখান থেকে কয়েক শত নল দূরে এক বনছাওয়া কুটিরে। সেখানে চলে পাঠাভ্যাস। একটানা দ্বিপ্রহরের আহার পর্যন্ত। দিনের পাঠ শেষ করে দুপুরে পপীপকে অন্যদের সাথে পংক্তিভোজনে পৌঁছে দিয়ে মল্ল চলে যায় অন্যত্র। কোথায় যায় জিজ্ঞেস করলে মল্ল উত্তর দেয় না। শুধু হেসে বলে– বড় হলে বুঝবি!

এভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন।

দুই মাস পরে পপীপের জীবনে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে। দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য মল্লর সঙ্গে ইক্ষুক্ষেতে ফিরছিল সে। হঠাৎ প্রবেশ তোরণের সামনে সে থমকে দাঁড়ায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তোরণের সামনে টাঙানো তাম্রফলকটির দিকে। তার চোখ রক্তিম হয়ে উঠেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে জোরে জোরে। উত্তেজনায় সে দুই হাতে সর্বশক্তিতে চেপে ধরেছে মল্লর হাতের কব্জি। পপীপকে অমন করতে দেখে মল্লও থমকে যায়। জিজ্ঞেস করে– কী হয়েছে রে পপীপ?

পপীপ কথা বলতে যায়। কিন্তু দেখা গেল উত্তেজনায় তার কণ্ঠে শব্দ ফুটছে না। মল্ল অভয় দেবার ভঙ্গিতে তার পিঠে-মাথায় হাত বোলায়। বার বার বরাভয় দেয়। আবার জিজ্ঞেস করে– কী হয়েছে রে বাপ?

পপীপ এবার হাত ছাড়ে মল্লর। নিজের ছোট্ট ডান হাতটিকে পূর্ণ প্রসারিত করে তোরণের তাম্রফলকটির দিকে। তার তর্জনি তাক করা ফলকটির দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার তর্জনিকে অনুসরণ করে মল্লও তাকায় তাম্রফলকটির দিকে। রোজকার দেখা জিনিস। তার ভিন্ন কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পায় না মল্ল। পপীপ এই সময় ফিসফিস করে বলে– ঐ ফলকটি মোর সাথে কথা কইছে কাকা!

এমন কথা শুনে প্রথমে মল্লও হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই বুঝতে পারে পপীপের এই কথার তাৎপর্য। খুশির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল– তার মানে, তুই এখন পড়তে পারছিস কী লেখা রয়েছে ঐ তাম্রফলকটাতে তাই না?

হ্যাঁ কাকা পারছি বটি!

এবার আনন্দে মল্ল বুকে জড়িয়ে ধরে পপীপকে। তার মুখে এমন এক হাসি ফুটে ওঠে যে হাসি কেবল ফুটতে পারে সন্তানের কৃতিত্বে বুক জুড়িয়ে যাওয়া পিতার মুখে, কিংবা চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিষ্য কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরে সদ্‌গুরুর মুখে, কিংবা অনেক পরিশ্রমে প্রতিকূল জলবায়ুর সাথে যুঝতে যুঝতে অবশেষে বিরূপ মাটিতে পোঁতা বীজ থেকে অংকুর গজিয়ে উঠতে দেখলে বরেন্দির কৃষকের মুখে। হাসতে হাসতে মল্লর চোখ থেকে জল গড়াতে থাকে। সে আবেগী কান্নায় জমে যাওয়া গলায় স্বর ফোটাতে পারে কোনোক্রমে– নিয়েছে! বরেন্দি-মা আমার পূজা নিয়েছে! এই অধম সন্তানের নৈবেদ্য বরেন্দি-মা গ্রহণ করেছে। এবার আর আমি একা লই। এবার দুইজন হয়েছি। তারপর পাঁচজন হবো। শতজন হবো। অযুত জন হবো। তারপর বরেন্দি-মায়ের বুকের মধ্যে জলৌকার মতো গেঁথে বসে থাকা সব কাঁটা উপড়ে ফেলব! আজ যে আমার কী আনন্দ পপীপ! চল তোকে আজ অন্য এক জায়গাতে লিয়ে যাই।

কোথায় কাকা?

হাসে মল্ল। স্নেহের হাসি। বলল– এ্যাদ্দিন তো শুধু মাটিতে আঁকা অক্ষর দেখলি। এবার সত্যিকারের পুঁথি দেখবি।

আগ্রহের আতিশয্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন পপীপের– সত্যিকারের পুঁথি?

হ্যাঁ। একেবারে ভূর্জপত্রের ওপরে লেখা সুতায়-বাঁধানো পুঁথি! ব্রাহ্মণদের কাছে যেসব থাকে। রাজার পাঠাগারে যেসব থাকে। বিহার-মহাবিহারগুলিতে যেসব থাকে।

ওরা মোদের পড়তে দেবে?

দূর পাগল! তাই কোনোদিন দেয়!

তাহলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুকুলিকার পুঁথিগুলো লুকিয়ে রাখা আছে একজনের কাছে। তার কাছে যেতে হবে মোদের।

চলো তাহলে এক্ষুণি যাই!

যাব তো বটি। কিন্তু আধাবেলার পথ। আগে কিছু ছাতু-কড়কচ্চ লিয়ে আসি। পথে খেতে তো হবে।

কিন্তু আর যেন তর সইছিল না পপীপের। চলো কাকা এখনই যাই! ছাতুর দরকার নাই।

মল্ল হাসে। বলে– এখন বলছিস দরকার নাই, কিন্তু খানিক পরেই খিদে লাগলে তখন আর পা চলবে না। তার চেয়ে একটু অপেক্ষা কর।

সেই ছাতু গামছাতে পেঁচিয়ে হাঁটতে শুরু করে তারা।

এমনিতেই পথে বেরুলে নতুন কিছু দেখার প্রত্যাশায় সবসময় পপীপের চোখদুটো অনবরত চারপাশ ছাঁকতে ছাঁকতে যায়, আর এখন তারা চলেছে কামরূপের একেবারে না-দেখা অঞ্চলের দিকে। আর সাথে আছে মল্লকাকা। যে সঙ্গে থাকলে ভয়-ভাবনা কিছুই ঠাঁই পায় না কারো মনে। তাই খুশিমনে চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে হেঁটে চলে পপীপ। যা দেখে, সেটাই তার ভালো লাগে। কিন্তু কয়েক ক্রোশ হাঁটার পরে হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের পটভূমিকায় এমন একটা জিনিস সে দেখতে পায় যে তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি আটকে যায়। কিছুতেই আর অন্যদিকে চোখ সরাতে পারে না সে।

অনেকটা দূর থেকেই চোখে পড়ছিল মন্দিরের সোনাবাঁধানো চূড়া। সূর্য থেকে গলগলিয়ে নেমে আসা রোদ সেই সোনার সাথে মিশে যাচ্ছে অথবা পিছলে যাচ্ছে সোনার গায়ে আছড়ে পড়ে। যেটাই ঘটুক না কেন, চূড়ার উজ্জ্বলতা তাতে বেড়ে যাচ্ছে শতগুণে। প্রথম দৃষ্টি পড়ার পরেই পপীপের মুখ থেকে আশ্চর্যবোধকতা নিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল সুন্দরের স্তব– উটা কি ভগমানের আলো কাকা?

মল্ল তিক্ত হেসে বলে– উটা হচ্ছে অন্য মাটি থেকে এসে মোদের কাছ থেকে বরেন্দি-পুণ্ড্র কেড়ে নেওয়া দস্যুদের বিজয়চিহ্ন।

পপীপ বুঝতে পারেনি একথার তাৎপর্য। প্রশ্ন চোখে নিয়ে কয়েকবার তাকালেও মল্ল আর কিছু বলছে না দেখে তাকেও শেষ পর্যন্ত চুপ করেই থাকতে হয়। কিন্তু সোনারঙের আকাশধাঁধানো চূড়া থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিল না পপীপ। এঁকেবেঁকে যাওয়া হাঁটাপথ। কখনো কখনো পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহাবৃক্ষের সুউচ্চ ডালপালা পপীপের চোখ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়াল করে ফেলছে মন্দিরের চূড়াকে। তখন মনে মনে অধীর হয়ে উঠছে পপীপ। ওটাকে আবার দেখতে পাওয়ার আশায় বৃক্ষের বিস্তার পেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটছে জোরে জোরে। তারপর আবার যখন চোখে পড়ছে উজ্জ্বল চূড়াটি, তখন নিজের অজান্তেই সুন্দরকে দেখার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তার চোখও। নিজের অভিভূত অবস্থা শেষ পর্যন্ত মুখে প্রকাশ না করে পারল না পপীপ। বলে উঠল– মনে হচ্ছে উটা ভগমানের চোখের জ্যোতি বটি কাকা!

থমকে দাঁড়ায় মল্ল। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে পপীপের মুখ। কী যেন খুঁজছে। বিব্রত পপীপ অনুভব করতে পারছে তার মুখের ওপর চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়ানো মল্লর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে কি কোনো অন্যায় কথা বলে ফেলেছে? মল্ল কাকা কি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার কথা শুনে? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে মল্ল। ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকায় পপীপ। মল্লর চোখে এখন আরও বেশি স্নেহ। সেই স্নেহকে স্পর্শে রূপ দিতেই বোধকরি তার মাথায় আলতো হাত রাখে মল্ল– তুই আসলে জন্ম-কবি বটি পপীপ।

আবার হতভম্ব হবার পালা পপীপের– কবি কী বস্তু?

নিজেই বুঝবি এক সময়। চল্ এখন পা চালা! এখনো অনেক দূর যেতে হবে।

পথে একটা বড় খাল। অনেক বড় খালটি। প্রায় নদীই বলা যায়। খালের পাশে থমকে দাঁড়ায় মল্ল। খালের পাড় ধরে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক হাঁটে। কিন্তু পার হবার কোনো উদ্যোগ নেয় না। তার দিকে তাকায় পপীপ। মল্লকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মল্লই বলে– এই জায়গাটা একটু অন্যরকম। তুই কি বুঝতে পেরেছিস পপীপ?

ঘাড়ের দুইপাশে মাথা নাড়ে পপীপ– না, সে কিছু বুঝতে পারছে না।

মৃদু হাসে মল্ল। সস্নেহে বলে– তোর বোঝার কথাও লয় অবশ্য। তোর আর কতই বা বয়স! কিন্তু তোকে খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শিখতে হবে বাপ। আকাশের দিকে তাকা!

মল্লকাকার নির্দেশে আকাশের দিকে তাকায় পপীপ। তাকে কিছুক্ষণ আকাশ নিরীক্ষণ করতে দেয় মল্ল। তারপর জিজ্ঞেস করে– কী দেখলি?

আকাশ দেখলাম। মেঘ নাই। খুব রোদ।

পাখি উড়তে দেখছিস না?

হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক পাখি! উৎসাহিত হয়ে বলে পপীপ– পাখিগুলো একবার নেমে আসছে খালের জলের কাছাকাছি, একবার উড়ে যাচ্ছে আকাশে। বার বার একই কাজ করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক বলেছিস। মল্ল বলে– পাখিগুলোর খুব জলতেষ্টা পেয়েছে।

ও। তা ওরা জল খেলেই পারে। খালে তো অনেকই জল।

তা পারে। কিন্তু পাখিগুলো তো আর খালের জলে ডুব দিয়ে জল খেতে পারে না। ওদের তো এমন কোথাও বসতে হবে যেখান থেকে ওদের ঠোঁট জলের নাগাল পাবে। কিন্তু খালের পাশে তেমন কিছু তো নাই। দেখতে পাচ্ছিস?

না।

খালের পাশে অনেক গাছ থাকার কথা। সেসব গাছের হেলে-পড়া ডালে বসেই পাখিরা জল খায়। এই খালের পাশে সে রকম কোনো গাছ নেই। কোনো হেলে-পড়া ডালও নেই। আয়, একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তাকে সাথে নিয়ে পাশের বুনো ঝোপগুলির দিকে হাঁটতে থাকে মল্ল। ঝোপের মাঝখানে দুই-একটা বৃক্ষেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ঝোপের কাছে পৌঁছে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভঙ্গিতে গাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইল মল্ল। তারপর যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমন নিচুকণ্ঠে বলে– সঙ্গে তো দা-কাটারি কিছুই নেই রে, ডাল কাটব কীভাবে?

পপীপ কোনো উত্তর করে না।

মল্ল তরতর করে উঠে পড়ে একটা গাছের ওপর। তারপর ভাঙতে থাকে একটার পর একটা ডাল। ভেঙে ভেঙে নিচে ফেলতে থাকে। চেঁচিয়ে পপীপকে বলে– তুই ডালগুলোকে টেনে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো কর পপীপ।

একটা গাছ থেকে কয়েকটা ডাল ভাঙার পরে সেটা থেকে নেমে আবার আরেকটা গাছে ওঠে মল্ল। এইভাবে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতেই বেলা গড়িয়ে যেতে থাকে। পপীপ একটু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এইভাবে দেরি করলে যেখানে যাওয়ার কথা, আজ তো সেখানে গিয়ে পৌঁছানোই যাবে না। কিন্তু সেকথা মল্লকে বলা যায় না।

অনেকক্ষণ পরে বেশ কয়েকটি গাছের ডাল ভাঙার পরে নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে জড়ো করা ভাঙা ডালগুলোর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির ঢঙে মাথা ঝাঁকায় মল্ল। বিড়বিড় করে বলে– হ্যাঁ, এই কটা হলেই বোধহয় কাজ চলবে।

এবার পপীপকে বলে– ধর, একটা একটা করে টেনে খালপাড়ে নিয়ে চল।

বিনাপ্রশ্নে সেটাই করে চলে পপীপ।

সবগুলি ডাল খালপাড়ে নিয়ে আসার পড়ে পরনের কাপড় খুলে শুধু নেংটি পড়ে জলে নেমে যায় মল্ল। একটা একটা করে ডাল টেনে নিয়ে পুঁততে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালের জলের তলাকার কাদায়। পপীপ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। যখন মল্ল আদেশ করে, ডালগুলিকে একটা একটা করে এগিয়ে দেয় তার কাছে।

জলের তলায় ডাল পোঁতার কাজ শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। ভেজা গায়ে জল থেকে উঠে এসে মল্ল সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখে এইমাত্র শেষ করা নিজের কাজটিকে। একটু দূরে দূরে পোঁতা ডালগুলিকে এখন খালের ওপর অনেকটা জায়গাজুড়ে বিছিয়ে থাকা চাদরের মতো মনে হয়। পপীপ আর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসে– খালের মধ্যে গাছ লাগিয়ে কী হবে কাকা?

কই! খালের মধ্যে আমি আবার গাছ লাগালাম কখন?

একটু বিব্রত পপীপ বলে– এই যে ডালগুলো পুঁতে এলে। এগুলো তো গাছ হয়ে যাবে তাই না?

ও এই কথা! মল্ল হাসে– তা দুই-একটা ডাল হয়তো শিকড় বাড়িয়ে গাছ হয়েও যেতে পারে। কিন্তু আমি তো গাছ লাগাতে চাইনি। আমি ডালগুলোকে এখানে পুঁতেছি যাতে পাখিরা ওগুলোতে বসে জল খেতে পারে।

পাখিদের জল খাওয়ার জন্য এতকিছু করতে হবে!

করতে হবে না! আহারে জল খেতে না পেয়ে পাখিগুলো কী অসহায়ভাবে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল! ভগমানের রাজ্যে কেউ জলকষ্টে ছটফট করবে, তাই কি কোনোদিন হয়?

এ বিষয়ে আর কথা বলতে চায় না পপীপ। শুধু জিজ্ঞেস করে– আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানে আজ আর যাওয়া হবে না?

একটু বিব্রত লজ্জার সাথে হাসে মল্ল– তাই তো রে! অন্ধকার নেমে এসেছে। আজ আর সত্যিই যাওয়া যাবে না।

তাহলে পুঁথি? পপীপের কণ্ঠে হতাশা।

সে আজ হলো না, কাল হবে। কিন্তু ভেবে দ্যাখ জলকষ্টে ভগমানের এতগুলো জীব কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের কষ্ট লাঘবের কাজ না করলে আমরা আর কীসের কৈবর্ত! ঠিক না?

পপীপ পুরোটা না বুঝেই মাথা নেড়ে সায় দেয়। বোধহয় তার ভেতরের কৈবর্তই তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে নেয়– ঠিক।

১২. সুন্দরের কাছে যাওয়া

মন্দিরের একেবারে কাছে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির, তার বিশালতা, তার সৌন্দর্য, তার পরিপার্শ্বের নৈসর্গিক প্রভা আরও বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপকে। তার পা থেমে যায় নিজের অজান্তেই। এখন তাদের এবং মন্দিরের মাঝখানে খুব ছোট্ট আদুরে এক নদী। নদী পেরুনোর জন্য মূলিবাঁশের সংযোগ-পথ। কিন্তু এখান থেকে স্বচ্ছতোয়া নদী এবং মন্দিরের সৌন্দর্য পপীপকে এতটাই আবিষ্ট করে ফেলে যে সে বাঁশের সেতুতে পা রাখার চাইতে নদীর জলে পা ভিজিয়ে জল ছড়িয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য মনে মনে আকুল হয়ে ওঠে। মল্ল বাঁশের সেতুতে পা রাখলেও সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে মন্দির আর মন্দিরের কোলঘেঁষে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ জলের খেলা। মল্ল যেন বুঝতে পারে তার মনের কথা। হেসে বলে– তলা দেখা গেলেও এই নদীর জল কিন্তু অনেক বেশি পপীপ! তুই তো ডুবে যাবিই, আমি পর্যন্ত থাও পাব না রে বাপ। সাঁতরাতে হবে।

সাঁতার তো কৈবর্তশিশুরা হামাগুড়ি দেবার বয়সেই শিখে নেয়।

কিন্তু মল্ল নিষেধ করে। এখন পরনের কাপড় ভেজানো চলবে না। সে আশ্বাস দেয়, এই নদীতে জলভেঙ্গে সাঁতরানোর সুযোগ অনেক পাবে পপীপ। পপীপ তখন মল্লর হাত ধরে পা বাড়িয়ে দেয় সেতুর প্রথম ধাপে।

মন্দিরের সামনে পৌঁছে প্রথম বাস্তবের মাটিতে হোঁচট খায় স্বপ্নাবিষ্ট পপীপ। মন্দিরের সিংহদুয়ারে পৌঁছে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকার জন্য দ্রুত পা চালায় সে। কিন্তু তার হাতে চাপ দিয়ে গতিরোধের সংকেত দেয় মল্ল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই মল্লর মুখে ফুটে ওঠে সেই তিক্ত হাসিটাই। মুখে বলে– মন্দিরে ঢোকার অধিকার মোদের নাই।

মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই কৈবর্তকিশোর জেগে ওঠে পপীপের বুকে। মন্দিরের সমস্ত সৌন্দর্য নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার চোখ থেকে।

তার চোখে-মুখে হতাশা এবং ব্যথা ফুটে উঠতে দেখে নিজেই আবার সান্ত্বনা দেয় মল্ল– তবে তুই আর আমি ঠিকই ঢুকতে পারব রে পপীপ।

পপীপের সমস্ত উৎসাহ তখন নিভে গেছে। কান্নার বাষ্প ততক্ষণে কণ্ঠকে বুঁজিয়ে ফেলেছে অনেকখানি। কোনোমতে বলতে পারে– আমি ঢুকতে চাই না।

না চাইলেও ঢুকতে হবে।

কেন?

তোর পুঁথি-পুস্তক তো এখানেই রে। এখানে থেকেই তো তোকে পড়তে হবে।

আমি এখানে থাকব কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু থমকায় মল্ল। বলে– ঠিক কীভাবে এখানে তোকে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে তা এখনো পর্যন্ত আমি জানি না। কিন্তু করতে হবে, এটাই হলো সার কথা। চল দেখা যাক, পথ একটা-না-একটা বেরিয়ে আসবেই।

মন্দিরের সিংহদুয়ারে জনা কুড়ি ভূমিপুত্রের জটলা। সেই জটলার মধ্যে পপীপকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়ে মল্ল। মন্দিরের দরজায় সশস্ত্র প্রহরী। তাদের এড়িয়ে কেউ মন্দিরে ঢুকতে পারে না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-অভিজাতরা ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই এই মন্দিরে। তবে বিশাল মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজও তো অনেক। অনেক নারী-পুরুষকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সার্বক্ষণিকভাবে। কিন্তু তাদের পক্ষে তো আর নীচুশ্রেণীর কাজগুলি করা সম্ভব হয় না। সেবায়েতরা নিজেরা তো কোনো কায়িক শ্রমের মধ্যে যাবেই না। সেই কারণে আশপাশের গ্রাম থেকে বিষ্টি (বেগার শ্রম) দেবার জন্য ভূমিপুত্রদের ধরে আনা হয়। তারা নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে ঢুকতে পারে। নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন হওয়ামাত্র তাদের আবার মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরেই তাদের মন্দিরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। মল্ল নিজের মুঠিতে শক্ত করে ধরে রেখেছে পপীপের একটা হাত। মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় একটা বিশাল আঙ্গিনার মধ্যে। আঙ্গিনার একপাশে একটা উঁচু বেদী। মল্ল নিচুকণ্ঠে পপীপকে জানায়, এখানে ঐ বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিত সপ্তাহান্তে একবার সাধারণ আর্যদের সমাবেশে বেদের বাণী শোনায়। আঙ্গিনা পেরিয়ে মন্দিরের মূল চত্বর। কিন্তু সেখানে ঢুকতে দেওয়া হলো না কর্মীদের। তাদেরকে মূল চত্বরের পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মন্দিরের উদ্যান অংশে। এখানে দুইটি অংশ। পুষ্পোদ্যান আর ফলদ উদ্যান। পুষ্পোদ্যানে কোনো অনার্যের প্রবেশাধিকার নেই। কারণ সেখান থেকে দেবতার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করা হয়। সেই উদ্যান যাতে কোনো অস্পৃশ্যের স্পর্শে কলুষিত না হতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। কর্মীদের লাগানো হলো ফলদ উদ্যান আর অন্নজ্জ (সবজি) উদ্যানে আগাছা পরিষ্কারের কাজে। ফলদ উদ্যানে পনস (কাঁঠাল), কপিত্থ (কয়েত বেল), আতাফল, দাড়িম্ব (ডালিম), নারিকেল, কলা, তাল জাতীয় বৃক্ষই বেশি। সন্নিহিত অন্নজ্জ উদ্যানে পানিফল, কেশুর, পটল, ডাঁটা, অলাবু (লাউ), বাতিঙ্গন (বেগুন), করবেল (করলা), মূলক (মূলা) আর কুষ্মাণ্ডের (চালকুমড়া) সমারোহ। এখানে কাজ করতে করতে পাশাপাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ানো আটটি ছোট ছোট কিন্তু অসাধারণ সৌকর্যমণ্ডিত ইষ্টকনির্মিত বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সবুজ মাঠের মধ্যে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহিত ইষ্টকের বাড়িগুলি। কাজ করতে করতে মল্ল চাপাকণ্ঠে পপীপকে বলে– আমি একটা কাজে যাচ্ছি। তুই ভয় পাবি না। যেভাবে কাজ করছিস সেভাবেই কাজ করে যাবি। আমাকে খুঁজবি না। আর অন্য কারো সঙ্গে পারতপক্ষে কোনো কথা বলবি না।

একটু থেমে আবার বলে– ঐ যে ইষ্টকের বাড়িগুলি দেখছিস! সেখানে এই মন্দিরের দেবদাসীরা থাকে। আমি তাদের একজনের কাছেই যাচ্ছি।

দেবদাসী কী কাকা? জিজ্ঞেস করার পরে হঠাৎ নিজেই উত্তর পেয়ে গেছে মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে তাকায় পপীপ। বলে– ঐ তারা, যাদের কাছে পুঁথি আছে তাই না? তারাই আমাকে পুঁথি পাঠ করাবে তাই না কাকা?

মল্লর মুখে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ হাসি ফুটে ওঠে। সে পপীপের একথায় কোনো উত্তর করে না। শুধু বলে– আমি চললাম। তুই সাবধানে থাকিস!

তারপর পপীপের সম্মতির অপেক্ষা না করেই ছুটে চলে যায় একদিকে। কিছুক্ষণ পরেই তাকে গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখে পপীপ।

হঠাৎ করেই নিজেকে এত অসহায় আর একাকী মনে হতে থাকে পপীপের যে, যে মাটির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাটিকেও মনে হলো তার মতোই ভয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে। যে আগাছাটিকে টান মেরে উঠিয়ে আনবে বলে মুঠোয় ধরেছিল, হঠাৎ মনে হলো সেটা একটা কেউটে সাপ। আঁতকে উঠে হাত থেকে আগাছাটিকে ছেড়ে দিল সে। থরথর করে কাঁপছে। প্রাণপণে মল্লর মুখ মনে করার চেষ্টা করছে সে। মল্লকাকা তার কাছে সাহস আর শৌর্যের প্রতীক। তার মুখ মনে পড়লে আপনা-আপনিই ভয় দূর হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে শত চেষ্টাতেও কিছুতেই পপীপের মনের জমিতে ফুটে উঠছে না মল্লর সেই বরাভয়মাখা মুখের ছায়া। উল্টো তার মনের চোখে ভেসে উঠছে সেই দুই রাজপুরুষের ছবি যারা তাকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে নির্বাসন দিয়েছে এই অচেনা জগতে। এখানে মল্লর ছায়ায় থেকে থেকে এই কয়েক মাসেই এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তার বিন্দুমাত্র অনুপস্থিতি তার মন থেকে ছিনিয়ে নেয় নিরাপত্তার ন্যূনতম অনুভূতিটুকুও। একবার পপীপের মনে হলো গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ভীতি তার বুকে এমনভাবে জমাট বেঁধে ফুলে উঠেছে যে তার কণ্ঠ পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টাতেও কোনো শব্দই ফুটল না পপীপের মুখে। তখন হঠাৎ মনে হলো সে মারা যাচ্ছে। উজ্জ্বল হলুদাভ রোদ্দুরের আলোতে হাসতে থাকা প্রকৃতি তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাপসা হতে থাকে। সে নিজেকে এতক্ষণ কষ্ট করে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এখন আর সেই কষ্টটুকু করতেও তার ইচ্ছে করছে না। সে নিজের পা দুটোকে মুক্তি দিয়ে দিল দেহের ভার বহনের দায়িত্ব থেকে। তখন অনুভব করল ধীরে ধীরে ঘাসে ঢাকা মাটি তার চোখের কাছাকাছি চলে আসছে। তার এক ধরনের বিশ্রামসুখ অনুভূত হচ্ছে। বুঁজে আসছে চোখের পল্লবদুটিও। সে টের পাচ্ছে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে তার শরীরের কাঁপুনি। তার পরিবর্তে শরীরজুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এক ধরনের নিশ্চেষ্টতার সুখানুভূতি। পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে যাওয়াও তাহলে বেশ সুখেরই ব্যাপার! সে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করল সেই অনুভূতির কোলে। যেন সে ঝড়ের মুখে পড়া অরক্ষিত একটা করঞ্জতেলের প্রদীপ। ঝড়ের সাথে আর না যুঝে নিজেকে নিভে যেতে দিচ্ছে।

তার বাবা এক অন্ধকার সন্ধ্যায় রামশর্মার ঝুপড়িতে শুয়ে শুয়ে তাকে গল্প শোনাচ্ছিল। বাবা বলছিল যে নিয়তির সাথে কেউ যুঝতে পারে না রে বাপ! নিয়তি মানে সেই জিনিস, যা ঘটবেই। যাকে রোধ করা সম্ভব নয়। যেমন আকাশ থেকে যখন বিজলি নেমে আসে তাকে মেনে নিতে হয়। যখন ঝড় এসে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তাদের ঝুপড়িগুলোকে, তখন সেই ঝড়কে থামানোর সাধ্য তো কারো থাকে না। তাই তখন তাকে মেনে নিতে হয়। সেই রকমই, তারা এখন রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতের ক্রীতদাস। এটি তাদের নিয়তি। এটিকে মেনে নিয়েছে বলেই বট্যপ এবং তার মতো অন্যরা এখনো বেঁচে থাকতে পারছে। মেনে না নিলে হয় মরতে হতো, নয়তো পাগল হয়ে যেতে হতো। মাঝে মাঝে মেনে নেওয়ার মধ্যেও এক রকমের সুখ সুখ ভাব থাকে রে বাপ। বট্যপের মনে আছে, সে একবার হাইলা কৈবর্তদের সাথে নৌকায় গিয়েছিল মাছ ধরতে। তখন নদী শ্রাবণ মাসের ভরা পোয়াতি। একপাড় থেকে আরেক পাড় দেখা যায় না। হঠাৎ উঠল ঝড়। আর নদী আরও উঠল ফুঁসে। একরত্তি নৌকা এক ঢেউয়ের বাড়ি খেয়েই চিৎপটাং। তাদেরকে ঝড়ে-মাতাল নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করে নৌকা নিমেষে চলে গেল কোন দিকে কে জানে। তখন বাঁচার জন্য অবিরাম সাঁতরাচ্ছে বট্যপ। কিন্তু কোনদিকে যাবে সে! অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না কোনদিকে নদীর পাড়। বোঝাই যাচ্ছে না কোনদিকে কূল আর কোনদিকে অকূল। তখন ভীতি-ক্লান্তি মিলে বট্যপের স্রোতের সাথে, ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনো বাঁচার জন্য বুকের মধ্যে ভীষণ আকুতি। তাই তার কষ্টও বেশি। এই রকমভাবে যুদ্ধ করতে করতে একসময় হাল ছেড়ে দিল বট্যপ। হাত-পায়ে আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। সে হাত-পা দুটোকেই নাড়ানো বন্ধ করে দিল। চোখ খুলে এতক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের মধ্যেও নদীর কূল খোঁজার চেষ্টা করছিল। এবার চোখদুটোকেও বুঁজে ফেলল। বিশ্রাম নিতে দিল দুই চোখের পাতাকে। শরীরের সব পেশিকে ঢিল করে দিয়ে মনে মনে বলল, ঝড়ের দেবতা, এখন তুমিই আমার নিয়তি। আমি মেনে নিলাম তোমার ইচ্ছাকে। আর কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার সকল কষ্ট। বাতাসে ভেসে বেড়ানো কার্পাসের মতো হালকা হয়ে গেল তার শরীর। সে এমনকি ঘুমিয়েও পড়ল। পরে যখন ঘুম ভাঙল, দেখল সে মরে যায়নি। নদীর স্রোত আর ঝড়ের উথালপাতাল ঢেউ নিজেই তাকে বয়ে নিয়ে এসে ফেলে রেখেছে অচেনা এক গাঁয়ের মাটিতে।

পপীপের নিজেকে এখন মনে হচ্ছে সেই ঝড়ে উত্তাল নদীর স্রোতের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া বাবার মতো। তারও দুই চোখে নেমে আসছে শান্তির ঘুম। তারও মন জুড়ে এখন নিয়তিকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেবার স্বস্তি। সে আলতোভাবে নড়ে-চড়ে এমনভাবে শুয়ে পড়ে, যেন উদ্যানের মাটি তার জন্য এখন নরম শয্যা হয়ে গেছে। সে পুরোপুরি উপুড় হয়ে গাল ঠেকিয়ে রাখে কোমল মাটির বুকের সাথে। আহ, নিজেকে পুরোপুরি ভাগ্য-ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিলেও এতটা শান্তি পাওয়া যায়!

কিন্তু কে যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে তার নাম ধরে!

সেই ডাক কানে এলেও ঠিকমতো যেন শুনতে চায় না পপীপ। সে বরং পাশ ফিরে শরীরকে আরও শিথিল করে আরও গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু নাছোড় সেই কণ্ঠ। আবারও ডাক ভেসে আসে পপীপের নামে।

এবার পপীপ বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বরের প্রতি। সেই কণ্ঠকে এড়ানোর জন্য কানকেও যেন ঠেসে ধরতে চায় মাটির সাথে।

তবু ডাক আসছেই।

চরম বিরক্তি বোধ করে পপীপ। এমন সুখের মুহূর্তে কোনো আহ্বানে সাড়া দিতে মোটেই ইচ্ছা করছে না তার। কিন্তু দূরের সেই কণ্ঠও ভীষণ একগুঁয়ে। বিরতিহীন ডেকেই চলেছে তাকে। সেই আহ্বান প্রথমে মস্তিষ্কের এক কোণে একটু রিনিঝিনি তুলেছিল। কিন্তু এখন সেটি তীব্রতায় বেড়ে চলেছে। ঝনঝন করে বাজছে তার কানের তন্ত্রীতে। তখন আর সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না পপীপের। সে চোখ মেলতে বাধ্য হয়।

তার চোখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে মল্লর অবয়ব। সে ধড়ফড় করে উঠে বসার চেষ্টা করে। মল্ল তাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। হেসে বলে– ঘুমিয়ে পড়েছিলি! অবশ্য আমারও একটু দেরি হয়ে গেছে বটি। চল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মনে মনে বলে পপীপ– তুমি আমাকে ছেড়ে দূরে যেও না কাকা! তুমি কাছে না থাকলে এত ভয় করে! সেই ভয়কে আমার মরণের মতন কষ্ট মনে হয়!

কিন্তু মুখে বলা হয় না।

সে যন্ত্রের মতো মল্লকে অনুসরণ করে।

মল্ল হাঁটছে সেই ইষ্টকনির্মিত সুরম্য বাড়িগুলির দিকে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই পরিবর্তন করে দিক। সপাট পথ ছেড়ে ঘুরে ঘুরে চলে সে। কখনো ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে, কখনো খোলা জায়গায় গুড়ি মেরে। পপীপ বুঝতে পারেনি যে তারা এখন চলছে ঐ বাড়িগুলির পেছনের অংশের দিকে। শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ে মল্ল। বহু বছরের পুরনো একটা আম্রবৃক্ষের প্রকাণ্ড কাণ্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে পপীপকে বোঝায় যে কোনো রকম শব্দই এখন করা চলবে না।

চারদিকে নৈঃশব্দ। সেই নৈঃশব্দের সঙ্গে নিজেরাও নিস্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। মনে হয়, তারাও এখন প্রকৃতির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে– কে কতক্ষণ কোনো শব্দ না করে প্রহর কাটাতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে খুব মৃদু একটা শব্দ পাওয়া যায়। ঘাসের ওপর কাঠবিড়ালি কিংবা খরগোসের হেঁটে যাওয়ার মতো সতর্ক পায়ের শব্দ। সেই শব্দ তাদের কাছাকাছি এসে থামে। জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া-ছাড়ার শব্দ পাওয়া যায়। তারপর মৃদু কিন্তু ব্যাকুল একটি নারীকণ্ঠ ভেসে আসে– মল্ল! মল্ল কোথায় তুমি?

মল্ল আম্রকাণ্ডের আড়াল ছেড়ে নিজেকে উন্মুক্ত করামাত্র একটি যুবতী যেন উড়ে এসে আলিঙ্গন করে মল্লকে। বেতসলতার মতো কাঁপছে যুবতীশরীর। নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় ফুঁপিয়ে উঠছে থেকে থেকে। প্রচণ্ড জোরে আলিঙ্গন করে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে মল্লর গণ্ডদেশে, গালে, কপালে, বুকে। থেকে থেকে কথা বলছে– মল্ল তুমি এসেছ! পৃথিবীর পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমি এসেছ! আমার মল্ল তুমি আমার কাছে এসেছ! ফিরে এসেছ তোমার প্রণয়িণীর কাছে! ফিরে এসেছ তোমার চরণদাসীর কাছে!

মল্ল কয়েকটি প্রতিচুম্বন করে। কিন্তু সে অনেক ধীর-স্থির। মনের মধ্যে আবেগ থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে বোঝা যায়। সে যুবতীর কানের লতিতে চুমু খায়। তবে একই সাথে সে যুবতীর কানে কানে কিছু একটা বলারও চেষ্টা করে। কিন্তু যুবতী তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। সে মল্লকে আরও জোরে চেপে ধরে আরও বেশি করে চুম্বন শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। সেই সাথে বেড়ে যাচ্ছে তার ফোঁপানির শব্দও। এবার মল্ল শক্ত হাতে চেপে ধরে যুবতীর দুই বাহুমূল। তারপর তার মুখের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে কয়েকটি বাক্য। যুবতী এবার ছিটকে সরে দাঁড়ায়। চোখ ঘুরিয়ে তাকায় আম্রকাণ্ডের একপাশে অপেক্ষমান পপীপের দিকে। যুবতীর গণ্ডদেশে এখন স্পষ্ট লজ্জার লাল আভা। মল্ল মৃদু হেসে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে কিছু বলে যুবতীকে। তারপর পপীপও যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে কণ্ঠ উঁচিয়ে যুবতীকে বলে– আমাদের তোমার গৃহে ডাকবে না ঊর্ণাবতী?

হেসে ফেলে যুবতী। অনেক সহজ হয়ে এসেছে এখন। পপীপের দিকে হাত বাড়ায়– এসো!

তার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে পপীপ এবং মল্ল। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল পপীপ। এত সুন্দর কোনো ঘর হতে পারে! এত সুচারুভাবে সজ্জিত কোনো বাড়ি হতে পারে! দেয়ালে দেয়ালে মনোলোভা রঙের আবরণ। কুলুঙ্গির ওপরে তিনদিকেই জানালা কাটা। যাতে আলো ঢুকতে পারে সবদিক থেকে। আবার আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্য, কিংবা প্রয়োজনমতো আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মোটা কাপড় ঝুলিয়ে রাখা রয়েছে গবাক্ষগুলোর পাশে। সেগুলি টেনে দিলেই কক্ষ ঢেকে যাবে সুস্নিগ্ধ আবছা অন্ধকারে। ঘরের এক কোণে বিশাল কারুকাজ করা পালঙ্ক। সেখানে পেতে রাখা হয়েছে পালকের শয্যা। তার পাশে সুদৃশ্য আলম্বন (আলনা)। ঘরের মানুষের কাপড়চোপড় সেখানে সুচারুরূপে সজ্জিত। আর যুবতীর দিকে তাকিয়ে পপীপ আবার অনুভব করল সৌন্দর্যের আভা কাকে বলে। দূর থেকে স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরচূড়া দেখে যেমনটা অভিভূত হয়েছিল পপীপ, যুবতীর সৌন্দর্যও অনেকটা তারই কাছাকাছি, তবে স্নিগ্ধ একটা অনুভূতি এনে দিল তার মনে।

যুবতী তাদের বসতে দেয় কারুকাজ করা নরম আসনে। ইতোমধ্যে ঘরে ঢুকেছে আরও তিনজন যুবতী। তাদের দিকে তাকিয়ে ঊর্ণাবতী বলে– সম্মুখের দ্বার বন্ধ করে রাখ। কেউ যেন টের না পায় আমার গৃহে অন্য মানুষ এসেছে।

যুবতীর এক সহচরী হেসে বলে– অন্য মানুষ বলছ কেন? বলো মনের মানুষ এসেছে।

আরক্ত ঊর্ণাবতী বলে– আচ্ছা তাই হলো। বালকের সামনে যা তা বলিস না আর! যা দ্বার বন্ধ করে দে। আগামী কয়েকটি দিন সতর্ক থাকতে হবে।

সোনার মতো চকচকে মঙ্গলঘটে জল আসে। জলপাত্র হাতে নিয়ে ঊর্ণাবতী নৃত্যের ভঙ্গিমায় উবু হয়ে বসে মল্লর দিকে– তোমার পা বাড়িয়ে দাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকুক না! আমি নিজেই পা ধুয়ে নিতে পারব। মল্ল বলে একটু সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে।

না থাকবে না! যুবতী বলে জেদীকণ্ঠে।

যেন নিতান্ত বাধ্য হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে দুই পা বাড়িয়ে দেয় মল্ল।

পপীপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। পরম যত্নে জল ঢেলে মল্লর পা ধুয়ে দিল ঊর্ণাবতী। তারপর প্রথমে পরনের বহুমূল্য শাড়ির আঁচল দিয়ে, পরে নিজের মাথার মেঘরাশির মতো চুল দিয়ে মুছে দিল মল্লর পা।

মল্ল একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাকাচ্ছে পপীপের দিকে। কিন্তু পপীপের চোখে মুগ্ধতা। ঊর্ণাবতী যা করছে, এটা কি ভালোবাসার চিহ্ন? নাকি আনুগত্যের চিহ্ন? নাকি এটাই আর্যদের নিয়ম? যেটাই হোক না কেন, এর ভেতরে যে সুচারু এবং সোচ্চার আত্মনিবেদন রয়েছে, পপীপকে মুগ্ধ করেছে সেটাই। পপীপ এটাও দেখতে পায় যে ঊর্ণাবতীর বিশাল দুই আয়ত চোখের পাতা ভেজা ভেজা। এ কী অন্তরের আনন্দের চোখের বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসা! মল্লকাকা বলেছিল সে দেবদাসীদের কাছে যাচ্ছে। ঊর্ণাবতীও কি দেবদাসী? দেবদাসীরা এত সুন্দরভাবে মানুষের সেবা করে! তাহলে তো তারা ভালো মানুষ। তাহলে কৈবর্ত ছাড়াও ভালো মানুষ আছে!

মল্লর পদসেবা শেষ করে একজন সহচরীকে ডাকে ঊর্ণাবতী– যুথিকা তুই এই বালককে অতিথি কক্ষে নিয়ে যা। ওর শরীর প্রক্ষালনের জন্য যা যা লাগে দিবি। তারপর জলখাবার দিস।

পপীপের দিকে ফিরে ঊর্ণাবতী স্নেহমাখা সুরে বলে– যাও বাবা তুমি তোমার এই মাসির সাথে যাও!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন মল্লও। পপীপের সামনে এমন পরিস্থিতিতে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিল সে। তাড়াতাড়ি সায় দেয় ঊর্ণাবতীর কথায়– যা পপীপ। কোনো ভয় নেই। আমি এই ঘরেই আছি। তুই মাসির সাথে যা। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর। তারপর কীভাবে তোর পাঠ শুরুর ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।

পপীপকে সঙ্গে নিয়ে যুথিকা বেরিয়ে যেতেই আরেক সহচরী সীমন্তিনীকে আদেশ করে ঊর্ণাবতী– সম্মুখের দ্বারে লোহিত উড়নি টাঙিয়ে দে।

দেবদাসীর দ্বারশীর্ষে লোহিত উড়নির অর্থ হচ্ছে দেবদাসীর চান্দ্রমাসিক ঋতু শুরু হয়েছে। এই পাঁচ বা ছয়দিন সে অস্পৃশ্যা। যে কয়দিন লাল কাপড় দেখা যাবে সেই কয়েকদিন কোনো মহাজন ব্যক্তি আসবে না দেবদাসীর সেবা নিতে। দেবদাসী নিজেও যেতে পারবে না মন্দির প্রাঙ্গণে। ঋতুকালে দ্বারশীর্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোহিত বস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা এখানকার বিধান। এতদিন এই বিধানকে অপমানজনক এবং তীব্র আপত্তিকর বলে মনে করে এসেছে ঊর্ণাবতী। কিন্তু আজ মনে হয় এই বিধান তার জন্য পরম উপকারী। এই বিধানের কারণেই মল্লকে সে নিবিড় করে পাবে কয়েকটি দিনের জন্য।

ঊর্ণাবতীর লাল উড়নি সেঁটে দেবার কথা শুনে আঁতকে ওঠার ভান করে মল্ল। তার মানে তো পাঁচ-সাতটি দিবস-রাত্রির ব্যাপার। অতগুলি দিন আমি কীভাবে এখানে থাকব ঊর্ণাবতী? আমার যে অনেক কাজ! আমাকে অবিলম্বে বরেন্দিতে ফিরতে হবে। সেখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। দিব্যোক সংবাদ পাঠিয়েছে গোপন বার্তাবাহকের মাধ্যমে। দিব্যোক চায় আমি এখন সেখানে থাকি। তার পাশে থাকি।

যত কাজই থাকুক, তোমাকে অন্তত আগামী পাঁচটা দিন থাকতেই হবে! পাঁচটা দিন পরেই নাহয় তুমি বরেন্দিতে গেলে। বলতে বলতেই চোখ সজল হয়ে উঠল ঊর্ণাবতীর– জন্মপাতকিনী আমি! সারা বছর ধরে কলুষিতা হই। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে শুদ্ধি না দিয়ে গেলে আমি বাঁচব কী নিয়ে!

কে বলেছে তুমি কলুষিতা? ত্রিস্রোতা নদীর জলে কত পাষণ্ডই তো জলক্রীড়ায় নামে, স্নান করতে নামে, নদীতে মাছ ধরতে নামে। তাই বলে কি ত্রিস্রোতা কোনোদিন অপবিত্রা হয়? তাই বলে ত্রিস্রোতার আধ্যাত্মিক পবিত্রতা কি ক্ষুণ্ন হয়েছে? অযুত-নিযুত মানুষের কাছে ত্রিস্রোতা তো এখনো গঙ্গার মতোই দেবী রূপে পূজিতা। অযুত মানুষ তো গঙ্গার মতো করে ত্রিস্রোতারও স্তব করে অহোরাত্র। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে যে জীবন তোমাকে বয়ে চলতে হচ্ছে, সে জীবনের কোনো দোষ বা পাপ তো তোমার নামে লিপিবদ্ধ হতে পারে না।

কিন্তু তবু আমি কিছুতেই সইতে পারছি না এই দেবদাসীর জীবন। লোকে জানে যে, আমরা দেবদাসীরা পূজার সময় আর দেবতার আরতির সময় নৃত্য করি। লোকে জানে যে আমরা দেব-দেবীর সেবায় নিয়োজিতা। অথচ বাস্তবে আমরা দিবারাত্রি ভোগ্যা হই পুরোহিত, সেবায়েত আর অভিজাতদের। আমার বাবা-মাকে বোঝানো হয়েছে আমি দেবতার দাসী। দেবতার প্রতি নিবেদিতা। কন্যাকে দেবদাসী বানানোর বিনিময়ে তারা পেয়েছে পরকালে অক্ষয় স্বর্গবাসের নিশ্চয়তা। আর আমি জ্বলে মরছি এই নরককুণ্ডে। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মল্ল! আমাকে নিয়ে চলো এই নরক থেকে!

নিয়ে যাব ঊর্ণাবতী! অবশ্যই নিয়ে যাব। যেদিন আমাদের বরেন্দিকে আমরা মুক্ত করতে পারব, যেদিন আমাদের বরেন্দি আবার আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের হবে, সেদিন সেই মুক্ত বরেন্দিতে তুমিও পাবে একটা সত্যিকারের মুক্ত জীবন। সেদিন আমি তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে। নিয়ে যাব আমার মুক্ত বরেন্দিতে।

নির্দ্বিধায় মল্লর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে উর্ণাবতী। এই সময় বোধকরি তার মনে পড়ে পপীপের কথা। মল্লর কাছে জানতে চায়– তোমার সঙ্গের বালকটি কে?

ওর নাম পপীপ। ও তোমার কাছে লেখাপড়া শিখবে।

আমার কাছে কেন? তুমি নিজেই তো ওকে লেখাপড়া শেখাতে পারো!

তোমাকে তো বললামই যে আমাকে অবিলম্বে বরেন্দিতে যেতে হবে।

মৃদু হাসে উর্ণাবতী– আমি কী আর তোমার মতো করে ওকে শেখাতে পারব!

পারতেই হবে উর্ণাবতী!

মল্লর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে এতক্ষণের তরল পরিবেশ হঠাৎ ভারি হয়ে যায়। আর মল্লর কণ্ঠস্বর শুনেই উর্ণাবতী বুঝে যায়, পপীপকে লেখাপড়া শেখানোর কাজটি তার কাছে কতটা গুরুত্ববহ। সে সঙ্গে সঙ্গে মল্লর আরও কাছে সেঁটে আসে। কোমল হাতের আশ্বস্তকারী চাপ দেয় মল্লর বাহুতে। মুখে বলে– তুমি কিছু ভেব না! আমি যতটা পারি লেখাপড়া শেখাব পপীপকে। আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারো!

আবার কোমল হয়ে আসে মল্লর চোখের দৃষ্টি– তোমার ওপর আস্থা রাখি বলেই তো তোমার কাছে এসেছি। পপীপ লিখতে-পড়তে শিখেছে বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু যেটুকু শিখেছে, সব মাটিতে আঁক কষে শেখানো। সে কোনোদিন পুঁথির অবয়ব দেখেনি। তোমার কাছে রাখা পুঁথিগুলোর পাঠ তো তুমি ওকে শেখাবেই, সেই সঙ্গে শেখাবে বেদ-রামায়ণ-মহাভারত। মনু-সংহিতা তো অবশ্যই পাঠ করাতে হবে। শেখাতে হবে গণিত। অশ্বঘোষের নাট্যকলার পাঠও দিতে হবে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ উর্ণাবতী। কারণ পপীপ হবে ভবিষ্যতে কৈবর্তজাতির মুখপত্র। পারবে না কাজটা করতে? এক বছর লাগুক, দুই বছর লাগুক, পাঁচ বছর লাগুক– কাজটি করতেই হবে উর্ণাবতী!

তুমি আদেশ করেছ, আর উর্ণাবতী সেটা পালন করবে না– তা কোনোদিন হতে পারে? অবশ্যই তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবে যথাযোগ্য মর্যাদায়। কিন্তু একটা সমস্যা আছে।

কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপ কোথায় থাকে? সে কীভাবে প্রতিদিন পড়তে আসবে আমার কাছে?

মল্লর চোখে-মুখেও এবার অস্বস্তির ছায়াপাত ঘটে। বলে– পপীপ যেখানে থাকে, সেই জায়গা এখান থেকে অনেক দূরে।

কোথায়?

সে থাকে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে। তার বাবা এবং সে রামশর্মার ক্রীতদাস।

মল্লর চোখে-মুখে ঘোর দুশ্চিন্তার ছায়া। এই সমস্যাটা যে কীভাবে সমাধান করবে, তা এখনো ভেবে উঠতে পারেনি সে। একবার ভেবেছে পপীপকে এখানেই লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু তা যে কতদিন রাখা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ রামশর্মার সাম্রাজ্যে একসময় পপীপের খোঁজ পড়বেই। তখন রামশর্মা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেবে যে তার এক বালক ক্রীতদাস পালিয়েছে আখক্ষেত থেকে। ঢ্যাঁড়া শুনে শুনে বালকের অবয়বের বর্ণনা মুখস্ত হয়ে যাবে লোকের। তখন যে কেউ একবার দেখেই চিনে ফেলবে পপীপকে। তখন পপীপকে রামশর্মার লোক ধরে নিয়ে তো যাবেই, সেইসঙ্গে চরম বিপদে পড়ে যাবে ঊর্ণাবতীও।

আরেকটি উপায় ভেবেছিল মল্ল। বরেন্দিতে দিব্যোকের কাছে লোক পাঠিয়ে বা এখানকার কোনো ধনশালী বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পপীপকে রামশর্মার ক্রীতদাসত্ব থেকে ছাড়িয়ে নেবে। অর্থ সংগ্রহ করা মল্লর জন্য খুব কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে রামশর্মাকে সম্মত করানো। সে যদি তার ক্রীতদাসকে অন্যের কাছে বিক্রি করতে না চায়, তাহলে তো কামরূপের রাজারও সাধ্য নেই পপীপকে মুক্তি দেওয়ার।

এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকদিন ধরে ভেবেছে মল্ল। কিন্তু কোন পথে যে এগুবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনো গ্রহণ করতে পারেনি।

এই মুহূর্তে ঊর্ণাবতী বিষয়টিকে ফের উত্থাপন করায় সে আবার সেই চিন্তাতেই ডুবে যায়। তাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করার সুযোগ দেয় ঊর্ণাবতী। তারপর দুই মৃণাল বাহুতে পেঁচিয়ে ধরে মল্লর কণ্ঠ। এই হঠাৎ বেষ্টনীর চাপে একটু চমকে ওঠে অন্যমনস্ক মল্ল। তারপর সম্বিত পুরোপুরি ফিরে পেয়ে হেসে ফেলে।

হাসছে ঊর্ণাবতীও– এটি অবশ্যই একটা বড় সমস্যা। কিন্তু তাই বলে এখানে বসে শুধু সেই সমস্যার কথা ভেবে ভেবেই প্রহর কাটিয়ে দেবে, তা তো হতে পারে না প্রিয়তম। আমাকেও একটু ভাবতে দাও। আশা করি আমি কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নবোধক ভুঁরু তুলে তার দিকে তাকায় মল্ল। একটু ম্লান হেসে ঊর্ণাবতী বলে– তোমার নাহয় আমাকে কোনো আকাঙ্ক্ষিতা রমণী বলে মনেই হয় না। কিন্তু জেনো, এই কামরূপ রাজ্যে সকলেই আমাকে তাদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিতা রমণী মনে করে। রামশর্মাও তাদেরই একজন।

হেসে ওঠে মল্ল– কী বললে? রামশর্মাও! এই বুড়ো বয়সেও!

ঊর্ণাবতীর ঠোঁটে এখন তিক্ত হাসি। বলে– একবার কেউ মা বলে ডাকলে কোনো সদ্য তরুণীও তখন মায়ের যথাযোগ্য আচরণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কামমত্ত যুবক তো দূরের কথা, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকেও শতবার বাবা বলে ডাকলেও সে তখন তার কামতৃষ্ণা না মিটিয়ে ছাড়ে না।

একটু লজ্জিত হয় মল্ল। ধীরকণ্ঠে বলে– সত্যিই আমরা পুরুষরা খুবই খারাপ।

তার মুখে হাতচাপা দেয় ঊর্ণাবতী– না! কোনো সত্যিকারের পুরুষ কখনোই খারাপ হতে পারে না। যেমন তুমি। কিন্তু সত্যিকারের পুরুষ আর কয়টা আছে! চারপাশে যারা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, সেগুলি সবই তো কাপুরুষ।

মল্ল আগের প্রসঙ্গ থেকে সরতে চায় না। বলে– পুরুষ-কাপুরুষের আলোচনা এখন থাকুক ঊর্ণাবতী। তুমি বলো, পপীপের শিক্ষা সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়?

ঊর্ণাবতী বলে– সেটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। পথ আমি একটা ঠিকই খুঁজে বের করব।

সত্যি! ঝলমলে হয়ে ওঠে মল্লর মুখ– এবার নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি দায়িত্ব নিলে সমস্যার সমাধান হবেই হবে।

এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ঊর্ণাবতীর মুখের দিকে তাকায় মল্ল। বলে– তোমার ঠোঁটে খুবই রহস্যময় এবং দুষ্টুমিপূর্ণ হাসি দেখতে পাচ্ছি ঊর্ণাবতী!

অস্বীকার করে না ঊর্ণাবতী। শুধু জানতে চায়– কেমন সেই হাসি শুনি!

কেমন হাসি! উত্তর দেবার আগে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তার ভঙ্গি করে মল্ল। তারপর বলে–

প্রাতঃ কালাঞ্জনপরিচিতং বীক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরঙ্গুলীভস্মমুদ্রাঃ।
প্রেমোলাসাজ্জয়তি মধুরং সস্মিতাভির্বধূভির্
গৌরীমাতুঃ কিমপি কিমপি ব্যাহৃতং কর্ণমূলে।।

শ্লোক শুনে হাসে ঊর্ণাবতী। বলে– এবার অর্থ শোনাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্ল বলে– অর্থ তো তুমি নিজেই জানো।

তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

মল্ল রসিয়ে রসিয়ে বলে– অর্থ হচ্ছে–"সকালে জামাইয়ের ঠোঁটে কালো কাজলের দাগ আর কন্যার দুই স্তনে ভস্মমাখা আঙুলের ছাপ দেখে আনন্দে উৎফুল হয়ে বউয়েরা হাসিমুখে গৌরির মায়ের কানে চুপি চুপি যা বলল, তা জয়যুক্ত হোক!"

খিলখিল করে হেসে ওঠে উর্ণাবতী– তার অর্থ তুমি বলতে চাও যে আমি এখন বাৎসায়ন-চর্চার কথা ভাবছি?

না না ঠিক তা বলতে চাইনি।

না বলতে চাইলেও সেটাই সত্য। আমি এখন অন্য কোনো শাস্ত্রের কথা ভাবতেই পারছি না।

হয়! মল্ল কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলে– এরকম কখনো কখনো হয়। হতেই পারে!

হতে পারে নয় মহাশয়! হচ্ছে।

তা হোক।

এবার মল্লর আরও কাছে ঘেঁষে আসে উর্ণাবতী– তোমার এত বড় কাজ করে দেবার অঙ্গীকার করলাম আমি। বিনিময়ে তুমি আমাকে কোনো পুরস্কার দেবে না?

অবশ্যই দেব! বলো কী চাও তুমি?

কথা বলতে বলতেই প্রায় মল্লর গায়ের ওপর উঠে এসেছে উর্ণাবতী। মল্লও তাকে বুকে চেপে ধরেছে। অস্ফুট স্বরে উর্ণাবতী বলে– আগামী পাঁচটি দিন তুমি আমাকে তোমার বক্ষ থেকে বিশ্লিষ্ট করতে পারবে না!

আমি সম্মত।

তাহলে চলো!

পালঙ্কের দিকে মল্লকে আকর্ষণ করে উর্ণাবতী।

মল্ল দুইবাহুতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় উর্ণাবতীর তণু। তাকে পালঙ্কে স্থাপন করে নিজে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেতে। তারপর জোড়করে স্তব করে তার রূপের– হে হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্যধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। তোমার দন্তসকল সমচিক্কন, পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র, নেত্র নির্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত, তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল, উরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয়– উচ্চ, সংশিষ্ট, বর্তুল, কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলংকৃত, এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম। তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার অঙ্গের গন্ধ...

আর কথা বাড়াতে দেয় না ঊর্ণাবতী। কামজ্বরপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান জানায়– দেবী তোমার স্তুতিতে তুষ্ট হয়েছেন। এবার এসো সাধক! তোমার প্রাপ্য বর গ্রহণ করো!

১৩. দর্পণে ঊর্ণাবতী

প্রতিবিম্ব তাকে বলে– দ্যাখো তুমি কী সর্বনাশা সুন্দর! ঊর্ণাবতী তুমি কেন এতটা সুন্দরী? হরিণীর মাংসই যে শত্রু তুমি কেন শুনেও শোনোনি!

এই যে খুলে নিলাম কেয়ূর তোমার। তবু তুমি সমান সুন্দর!

এই যে খুলে নিলাম কণ্ঠিকা তোমার। তবু তুমি সমান সুন্দর!

এই যে খুলে নিলাম দেবচ্ছন্দি হার তোমার। তবু তুমি সমান সুন্দর!

এই যে খুলে নিলাম কানের কুণ্ডল। তবু তুমি সমান সুন্দর।

এলোমেলো করে দিলাম হংসপদিকা সিথিপাটি। তবু তুমি সমান সুন্দর!

বিলুপ্ত করে দিলাম কপালের টিপ। তবু তুমি সমান সুন্দর।

জলঘষে মুছে দিলাম চোখের কাজল। তবু তুমি সমান সুন্দর।

ঊর্ণাবতী! ঊর্ণাবতী এই সৌন্দর্য নিয়ে তুমি কোথায় আশ্রয় পাবে? তোমার পিতাও তোমাকে পারেনি দিতে আশ্রয়। হায় ঊর্ণাবতী তোমার সৌন্দর্যই তোমাকে এনেছে এখানে।

তুমি কেন হতে গেলে তিলোত্তমা সখি?

তিলোত্তমা! তিলোত্তমা!

দেবগণ এবং মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন– তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি করো, যার সৌন্দর্য দেখে সকলেই তাকে কামনা করতে বাধ্য হবে।

বিশ্বকর্মা ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ করে এক অতুলনীয়া রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের সকল উত্তম বস্তু তিল তিল পরিমাণে মিলিত করে সৃষ্ট। তাই ব্রহ্মা এই প্রমদার নাম দিলেন তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা পৃথিবীতে যাওয়ার আগে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করল। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যেদিকে যায়, দেবতারা সব ভুলে সেদিকেই ঘুরে তাকান।

তিলোত্তমা যেদিকে যায়, সেদিকে দেখার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার একটি করে মুখ নির্গত হয়। এইরূপে ব্রহ্মা হয়ে গেলেন চতুর্মুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্র এক মূহূর্তের জন্যও তিলোত্তমা থেকে নয়ন ফেরাতে পারলেন না। তাই তার হয়ে গেল সহস্র নয়ন।

শিব তিলোত্তমাকে দেখামাত্র সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেলেন। তাই তার নাম হলো স্থানু।

সেই তিলোত্তমা তুমি কেন নেমে এলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপে?

মনে আছে, কিশোরী বয়স থেকে তুমি যেখানেই যেতে, সেখানেই শত-সহস্র চক্ষুর ভিড়? মনে পড়ে তোমাকে একটি বার শুধু দেখবে বলে তোমাদের অট্টালিকার সামনে যুবাদের মেলা।

নিজের শরীরের মাংসই হরিণীর মৃত্যু ডেকে আনে। আর তোমার রূপই ঊর্ণাবতী ডেকে এনেছে তোমার সর্বনাশ।

তোমার তো স্বয়ংবরা হওয়ার কথা ছিল। তোমার তো কথা ছিল কোনো যুবাসুন্দরের ঘরণী হওয়ার।

কিন্তু লক্ষজনের কামনার তুমি একজনের কণ্ঠলগ্না হয়ে যাবে, এতে ঘোর অসম্মতি তাদের, যারা সকলেই তোমাকে চায়। নগরীর দিকে দিকে শুধু তোমাকে নিয়েই গুঞ্জন। রাজ্যের কোণে কোণে শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য আলোড়ন।

অবশেষে সবার কামনা তোমাকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে সম্মত হলো। বলা হলো দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কখনো একজনের ভোগ্যা হতে পারে না। তাই তাকে হতে হবে দেবদাসী। পিতা তোমার জানতেন, দেবদাসীর প্রকৃত কাজ কী। তিনি ক্রোধান্বিত হন, সানুনয়ে নিজকন্যার এই সর্বনাশা নিয়তি রোধের জন্য রাজদ্বারে যান। কিন্তু লোলুপের দল তো তোমার পিতার চাইতে অনেক শক্তিমান। তাই তোমাকে শেষাবধি হতে হলো দেবদাসী।

তুমি মন্দিরের দেবদাসী। সেখানে তো দেবতারা থাকেন না। দেবতারা আসেন। শক্তি মদমত্ত দেবতারা। স্বয়ং মহারাজ আসেন, আসে তার কুমার যুবরাজও। শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ আসে, আসে তার যুবক পুত্রও। ব্রাহ্মণ কুলীন আসে, আসে তার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের দলও।

তুমি পালাতে চাইলে এই নরক ছেড়ে।

কিন্তু কে তোমাকে আশ্রয় দেবে! তুমি যার আশ্রয়ে যাও, সে-ই নিজে ভক্ষক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার ওপর।

মনে আছে অবশেষে এল সেই দিন?

সেদিন তুমি ছিলে উপবনের কাছে এক কোষ্ঠকে এক ঋষির আশ্রমে। কিন্তু সন্ধ্যা তার অবগুণ্ঠনে পৃথিবীকে আচ্ছাদন করার আগেই ঋষি এসে চাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সঙ্গম। সঙ্গে তার চারজন যুবক শিষ্য। তুমি অবিশ্বাসে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলে ঋষির দিকে। এরাই তবে ধর্মের সাধক! এরাই তবে জীতেন্দ্রিয় ত্রিলোকে! তুমি ছুটতে শুরু করেছিলে। পেছনে ছুটছিল পাঁচজন ধর্ষক। তারা তোমার শাটকের প্রান্ত ধরে টেনে টেনে খুলে নিয়েছিল তোমার শরীর থেকে। তখন তুমি অবারিত দেহ। তাই তোমাকে দেখে তাদের শিশ্নইন্দ্রিয় শতগুণে বেশি উত্তেজিত। সেই সময় যেন আকাশ থেকে নেমে এল সত্যিকারের দেবতা। ধাওয়ারত ধর্ষকদের বলল তোমার পশ্চাদ্ধাবন না করতে। বলল তোমার লজ্জাবস্ত্র ফিরিয়ে দিতে। ধর্ষকামী ঋষি কানেই তুলল না তার কথা। তখন আহ্বান এল, এসো তবে যুদ্ধ করো! দেবতার হাতে পাঁচ পশুর নিধন দেখলে তুমি ঝোপের একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তুমি অবাক হয়ে দেখলে, দেবতা তোমার এসেছে নিষাদের বেশে।

শত্রুহনন শেষে বস্ত্রখণ্ড তুলে এনে কালো কষ্টিপাথরের দেবতা বললেন– ভদ্রে! আমি অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রয়েছি। আপনি আপনার লজ্জা নিবারণ করে সামনে আসুন। তারপর আপনি যেখানে বলবেন, আমি সসম্মানে সেখানেই পৌঁছে দেব আপনাকে!

তুমি সামনে এলে। দুচোখ ভরে দেখলে দেবতাকে। যাদের আবাল্য ঘৃণা করতে শিখেছ তোমরা, সেই অনার্যদের কেউ এত সুন্দরও হতে পারে! তোমার চোখ সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার চোখের দিকে। তার চোখ মাটিতে নিবদ্ধ। সে আবার বলে– আপনি কোথায় যাবেন?

তুমি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে তোমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

সে তোমার জন্য খুঁজে আনল বুনোফল। কলার মোচায় তুলে আনল ঝরনার জল। তারপর সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই শুনল তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি সব বললে। কথা বললে আর কাঁদলে। কাঁদলে আর কথা বললে। জানালে, তুমি একমাত্র তাকেই ত্রাণকারী বলে মেনে নিয়েছ। এখন তোমার জীবন তার হাতে।

কেন এমন বলছেন ভদ্রে? সে অবাক হয়ে জানতে চাইল।

তুমি বলতে পারলে না সেই সত্য কথাটি। সেই কথা– এই প্রথম তোমার নারীদৃষ্টি একজন সত্যিকারের পুরুষকে দেখতে পেয়েছে। শুধু সকাতরে বললে– আমাকে উদ্ধার করো!

কালো দেবতা বলল– আমি অন্য একটি কাজ নিয়ে বহুদূর বরেন্দি থেকে এসেছি। সেই দায়িত্ব থেকে সরে গেলে স্বজাতির কাছে সত্যভ্রষ্ট হবো। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এই মুহূর্তে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না। তবে আমি কথা দিচ্ছি, আমার কার্য সম্পন্ন হলে, মুক্ত হলে আমার স্বজাতি, আমি অবশ্যই আপনাকে এনে দেব সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ। ততদিন আপনি ধৈর্যধারণ করুন।

তোমার হৃদয় তখন জেনে গেছে, তুমি পেয়ে গেছ তোমার কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে। তাকে তুমি হারাতে চাও না আর। কিন্তু সে যদি তোমাকে ঘৃণা করে! দেবদাসীরূপে বহুভোগ্যা তুমি।

ঘৃণা! সে অবাক হয়ে যায়। অসহায়কে কে ঘৃণা করতে পারে? ঘৃণ্য তো অন্যেরা, যারা এইভাবে অসহায়কে ব্যবহার করে। বরেন্দির প্রকৃত সন্তানরা কখনো কোনো মানুষকে ঘৃণা করে না ভদ্রে!

তাহলে তুমি আমাকে নাও! গ্রহণ করো আমাকে!

সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে। তারপর বলে– আমি তো বলেছি, দায়িত্ববদ্ধ আমি! সে দায়িত্ব সম্পন্ন করার আগে আমি আর অন্য কোনো দায়িত্ব নিতে পারি না।

দায়িত্ব নয়। ভালোবাসা নাও!

সে নিশ্চুপ থাকে।

তুমি তখন পাগলিনী প্রায়। এত বছরের পরে সত্যিকারের দয়িতের দেখা পেয়ে ছাড়তে চাও না তাকে। তাই তোমার আড়ষ্ট জিহ্বা এতখানি প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠে– যদি তুমি আমার ভালোবাসা গ্রহণ না করো, তাহলে বুঝব, আমার দেবদাসী পরিচয় তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারোনি! বহুভোগ্যা নারী বলেই শুধু আমাকে তুমি ঘৃণা করো। অথচ তুমি জানো, আমি অসহায়া। আমি স্বেচ্ছায় এপথে আসিনি। এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না এই পরিচয়ে।

মল্ল তখন হাত বাড়িয়ে দিল তোমার দিকে– আমি তোমার ভালোবাসা গ্রহণ করলাম। স্বদেশের সাথে সাথে মুক্ত করব তোমাকেও। তারপর তোমাকে ফিরিয়ে দেব তোমার সম্মানের স্থান! কথা দিলাম। আর জেনো ভূমিপুত্র কোনোদিন ফিরিয়ে নেয় না প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।

১৪. গাভীন মেঘ ও লোলুপ জ্যোৎস্নার নিচে

গাঁওবুড়োদের মনে ভয় ছিল, দিনব্যাপী ভারি মেঘের বর্ষণ বোধহয় জ্যোৎস্নাকে ঢেকে ফেলবে। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই কমতে কমতে একেবারে থেমেই গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি। আকাশে তখনো মেঘ ভাসছে। পোয়াতি রমণীর মতো জলভরা মেঘ। তবে লগ্ন আসতে না আসতেই জ্যোৎস্না মেঘের ফাঁদ সরিয়ে উঁকি দিল ঠিকই। উৎকণ্ঠিত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল গাঁওবুড়োরা। তাদের ঘোলা চোখগুলো জ্যোৎস্নার আলো খুঁজেছে লগ্ন শুরুর অনেক আগ থেকেই। শেষ পর্যন্ত তারা এল। লগ্ন এবং জ্যোৎস্না– দুই-ই। প্রথমে মলিন মনে হচ্ছিল জ্যোৎস্নাকে। দুর্বলও। যেন তার এই আগমন একেবারেই অনিচ্ছুক আগমন। পানা পুকুরের বেশ তলায় পড়ে থাকা কৈবর্ত-কিশোরীর পিতলের নাকফুল যেমন আবছা দেখা যায়, সেই রকম আবছা ছিল জ্যোৎস্না। খুব ধীরে ধীরে আলগোছে আসছে। এমন সাবধানে হেঁটে আসছে যেন মেঘের সাথে ধাক্কা না লাগে। যেন জ্যোৎস্নার আলো মেঘের পেটকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলে কিংবা বাছুরের মতো গোমাতার পেটে ঢুঁস দিলেই বৃষ্টি গড়াতে শুরু করবে অঝোর ধারায়।

ধামসা বেজে উঠল ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ শব্দে।

শুরু হলো ক্ষেত্রপূজা।

গাঁওদেব-গাঁওদেবীকে সিঁদুর মাখানো হয়েছে। তাদের গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে ছাগদুগ্ধের অর্ঘ্যধারা। ধান-দূর্বা নিবেদন করা হয়েছে মন্ত্রপাঠ করে। কৈবর্তগ্রামের সবগুলি মাঠ-ক্ষেত এখন জলভেজা সবুজ অঘন নরম ঘাসে ছাওয়া। সব ব্যবস্থা দেখে সন্তোষের হাসি গাঁওবুড়োদের মুখে।

শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। যাতে মাদল-ধামসার শব্দে তাদের ঘুম না ভাঙে, সেইজন্য ঘুম গাঢ় করার জন্য ঝিনুকে করে তাদের মুখে তুলে দেওয়া হয়েছে ধেনোমদ। কিশোর-কিশোরীদের বলে দেওয়া হয়েছে আজকের উৎসব তাদের জন্য নয়। অতএব তারা যেন আজ সন্ধ্যা থেকেই ঘরে থাকে। বাইরে বেরুনো তো চলবেই না, বাইরের দিকে উঁকিও দেওয়া যাবে না।

এবার বুড়ো-বুড়িরা গাঁওদেব-গঁওদেবীকে প্রণাম জানিয়ে, মাঠ-ক্ষেত-প্রকৃতিকে প্রণাম জানিয়ে নিজ নিজ ঝুপড়িতে গিয়ে ঢোকে। জ্যোৎস্নার অধিকার ছেড়ে দেয় শুধুমাত্র যুবক-যুবতীদের জন্যই।

ধামসা-মাদল এবার বেজে ওঠে দ্বিগুণ শব্দ নিয়ে। এমন ঝংকারে শরীর দুলে উঠতে বাধ্য। মাঠের মধ্যে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক-যুবতীদের দেহ দুলতে শুরু করে মাদলের তালে তালে। ক্রমেই দ্রুততর হচ্ছে মাদলের ছন্দ। সেই অনুপাতে দ্রুততর হয়ে উঠছে যুবক-যুবতীদের অঙ্গ সঞ্চালনও। জ্যোৎস্না বেড়ে উঠছে। মাদলের শব্দে যেন চাঁদও আড়মোড়া ভেঙে পুরো মনোযোগের সাথে আলো ফেলে সেই আলোতে নৃত্যরত কৈবর্ত যুবত-যুবতীদের দেখছে। সে-ও যেন যোগ দিতে চায় এই উৎসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাতে লগ্ন। একেবারে নিখুঁত সময়ে চাঁদের গায়ে লেপ্টে এল ছোট্ট এবং পাতলা এক টুকরো মেঘ। চাঁদের আলো এর ফলে আরও মসৃণ, আরও মোহনীয় মায়াময়। এই মেঘই যেন সংকেতদাতা। সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে ভেঙে গেল দলীয় নৃত্যের সমাবেশ। নাচতে নাচতেই প্রতিটি জুটি সমাবেশ থেকে পৃথক হয়ে চলে এল নিজ নিজ নির্ধারিত ক্ষেতের মধ্যবিন্দুতে। এবার হবে ক্ষেত্রপূজার চূড়ান্ত পর্ব। প্রতিটি যুবক-যুবতী এখন পরস্পরের মধ্যে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। নাচতে নাচতেই নিখুঁত সঙ্গমাসনে শুয়ে পড়েছে যুবতীরা। শুয়ে শুয়েও শরীর দোলাচ্ছে। আজকের এই মিলন তো শুধুমাত্র দৈহিক মিলন নয়। এই মিলন হচ্ছে শস্যক্ষেত্রকে উদ্বুদ্ধ করার মিলন। যাতে শস্যক্ষেত্রও ঠিক সময়ে গর্ভিনী হয়। প্রসব করে পর্যাপ্ত শস্য-সন্তান। যাতে কৈবর্তরা থাকতে পারে মোটাভাতে-মোটাকাপড়ে বেঁচে-বর্তে। তারা ওলান ঠাকুরকে স্মরণ করে চূড়ান্ত মিলনে অগ্রসর হতে যায়।

দ্রিগ্ দ্রিগ্ দ্রিগ্!

শব্দটি বজ্রাহত করে দেয় পুরো কৈবর্ত উৎসবকে।

এখন কেন এই শব্দ বাজবে গ্রামপ্রান্তে? রাজপুরুষরা এই মধ্যরাতেও কেন এই পবিত্র পূজার লগ্নেও উপদ্রব করবে কৈবর্তদের?

শব্দের পাশাপাশি আলোও দেখা যায় এবার। মশাল জ্বলছে অনেক মানুষের হাতে। তারা এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে।

বিস্ময়ে-ত্রাসে নিথর পড়ে থাকে নারী-পুরুষের দল।

মশালের আলো কাছে এগিয়ে এলে ওরা উঠে দাঁড়ায়। নিজেদের অজান্তেই যেন সমবেত হয় গ্রামের মধ্যসীমার মাঠটিতে, যেখান থেকেই শুরু হয়েছিল ক্ষেত্রপূজা উৎসবের।

মশালের আলো আরও এগিয়ে আসে। কাদামাখা কালো নগ্ন শরীরগুলোতে সেই তীব্র আলো ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফেরত আসে। শুধু চকচকে সাদা চোখগুলো দেখা যায়। সেগুলো ক্রমেই রক্তাভ হয়ে উঠছে। কৈবর্ত যুবক-যুবতীরা নগ্ন দাঁড়িয়ে থাকে। নিথর নিষ্কম্প।

দেখা যায় শুধু রাজপুরুষরাই নয়, তাদের সঙ্গে আছে বড়সড় একটি দল। তাদের মধ্যে ধৌতিক-উড়নি-পৈতাধারী পুরোহিত, যুদ্ধংদেহী আর্য যুবকের দল, এবং তাদের দক্ষিণদেশীয় ভাড়াটে ঠ্যাঙ্গারের দল।

ঘোষক রাজপুরুষ বরাবরের মতো ঘৃণাপূর্ণ উঁচুকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে– ওরে অসুরের দল! তোদের কি ঘোষণা শোনানো হয়নি যে এই দেদ্দাপুরে প্রতিষ্ঠিত হবে ভগবান বিষ্ণুর পুণ্যমন্দির?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? মন্দিরের মতো মন্দির হবে। সেখানে আর্যরা তাদের মতো করে তাদের দেবতার পূজা করবে। আর কৈবর্তরা নিজেদের ব্রত-পার্বন-পূজা নিয়ে থাকবে। মন্দির তৈরি হওয়ার সাথে কৈবর্তদের ক্ষেত্রপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টির সম্পর্ক কী?

রাজপুরুষের কণ্ঠ আরও অধিক ক্রোধে গমগম করে ওঠে– মন্দিরের জন্য এই গ্রামকে দেবোত্তর সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এই গ্রামও এখন দেবতার গ্রাম। ভগবান বিষ্ণুর গ্রাম। সেই পবিত্র গ্রামে যোনীপূজার নামে কোনো ব্যভিচার চলতে পারে না। এখানে চলবে শুধু আর্য দেবতার পূজা-অর্চনা। তোমরা এই দেবগ্রামকে ক্ষেত্রপূজার নামে অপবিত্র করেছ। তাই প্রায়শ্চিত্ত বিধি অনুযায়ী বিষ্ণুমন্দিরের সেবায়েত শ্রীবৎসপালস্বামী তোমাদের প্রত্যেক সক্ষম পুরুষকে এক দ্রম্ম করে প্রায়শ্চিত্ত-পণ নির্ধারণ করেছেন। আগামীকল্যর মধ্যে যে এই পণ পরিশোধ করতে পারবে না, তাকে তার চাষক্ষেত্র হতে উচ্ছেদ করা হবে।

বজ্রাহত নারী-পুরুষ। নারীরা কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে।

এখানেই শেষ নয়।

রাজপুরুষ আবার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে– যেখানে বিষ্ণু মন্দির থাকবে, সেই দেবগ্রামে কোনো অশাস্ত্রীয় পূজা চলতে পারবে না। কোনো মূর্তি বা পাথর পূজিত হতে পারবে না। তাই তোমাদের গ্রামের এই বেলেপাথরদুটিকে নদীতে নিক্ষেপ করার জন্য আমরা নিয়ে যাচ্ছি।

গাঁওদেব-গাঁওদেবী থাকবে না! ওলান ঠাকুরের নাম থাকবে না! ওলান ঠাকুরের চিহ্ন থাকবে না!

দিব্যোক! দিব্যোক! তুমি আমাদের আর কত সহ্য করতে বলবে?

ওলান ঠাকুর! তুমি আর কতদিন এইভাবে সয়ে যাবে?

বরেন্দি মা আর কতদিন সইবে অপমান?

কৈবর্ত জাতি কি নিজেদের রক্তরঙা মাঠিতে নিজেদের পূজা-পার্বনও করতে পারবে না?

দিব্যোক! দিব্যোক!

১৫. মদন-কৃষ্ণ যৌথ আক্রমণ

সূর্য উত্তাপ নিয়ে আকাশে ওঠার আগ থেকেই দরদর করে ঘামছেন রামশর্মা। অথচ পুরো ইক্ষু-সাম্রাজ্য জুড়ে মৃদুমন্দ বাতাস এমনভাবে বয়ে চলেছে, যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বায়ুপ্রবাহকেই মনে হচ্ছে স্বর্গের আনন্দ-প্রবাহন। আজ এমনকি প্রভাতী স্তোত্রপাঠ পর্যন্ত করা হয়নি রামশর্মার। ঘুম থেকে কি তিনি আজ জেগে উঠতে পারেননি ব্রাহ্মমুহূর্তে? কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালে তেমনটি মনে হয় না। অতিরিক্ত নিদ্রার কারণে মানুষের চোখের পাতায় যে ভারি আবেশটা দেখা যায়, তার লেশমাত্র নেই রামশর্মার চোখে। উল্টো চোখের পিঙ্গলা মণির চারপাশের ঘোলাটে-সাদা জমিজুড়ে করমচার মতো টকটকে রক্তাভা একথাই মনে করিয়ে দেয় যে গতরাত তার বিনিদ্রই কেটেছে। কিন্তু তাকে বিরক্ত বা ক্লান্ত দেখাচ্ছে না এতটুকুও। বরং তার লোকেরা তাদের প্রভুকে এতটা উৎফুল দেখেনি কোনোদিন। এতটা চনমনে দেখা যেতে পারে তার মতো এমন রাশভারি মানুষকে, এটা ভাবতেই পারেনি কখনো রামশর্মার লোকেরা। তাহলে তার মাথা বেয়ে ক্ষুর-কামানো গাল বেয়ে যে অবিশ্রাম ঘাম নেমে আসছে, সেই ঘর্মস্রোতের উৎস কী? অবদমিত কাম? দীর্ঘকালের অব্যক্ত প্রত্যাশা পূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে আসা? বোধহয় তাই!

আজ ঊর্ণাবতী আসছে শ্রীরামশর্মার সাম্রাজ্যে।

এমনিতেই শ্রীশর্মার ইক্ষু-সাম্রাজ্য যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। সারিবাঁধা আখের সবুজ সরু দীঘল শরীর যে কোনো মানুষের চোখে প্রশংসার ছাপ ফুটিয়ে তোলে। লম্বমান দুই সারির মাঝখানে বয়ে গেছে জলসিঞ্চনের সুপরিকল্পিত নালা। কিন্তু অবিরল জলস্পর্শের কারণে নালার পাশের মাটি স্যাঁতসেঁতে হয়ে সেখানে পরজীবী জন্মানোরও কোনো অবকাশ রাখা হয়নি। রোজকার নিড়ানি দেওয়া মাটির মতো আখের গোড়ার মাটি ঝকঝকে তকতকে। নালার জলে খুব ছোট প্রজাতির কিছু মৎস্য সন্তরণরত। তবে তাদের ক্ষুদ্র পুচ্ছদেশের সঞ্চালন নয়ন-মনোহারী। সেই কারণেই তাদের সেখানে বিচরণের অধিকার দান করা হয়েছে। রামশর্মার দৃষ্টিতে তাদের কুৎসিত বা ক্ষতিকর মনে হলে তৎক্ষণাৎ নির্বংশ হয়ে যেত সকল নালাচারি মৎস্য প্রজাতি। ভেককূলের আসা-যাওয়া রয়েছে। তবে নেই কোনো স্থায়ী বাসের অনুমতি। পার্শ্ববর্তী ফলদ-উদ্যান থেকে মাঝে মাঝে একছুটে আখসারির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় কাঠবিড়ালির দল। তৃণভূমি থেকে সাবধানী পায়ে মুথাঘাসের সন্ধানে আসে খরগোসরা। তাদের গুহানির্মাণ এবং তৃণভূমিতে বসবাস সহ্য করেন রামশর্মা। যেহেতু তারা সুন্দর। কিন্তু কোনো শৃগালের প্রবেশ এবং মুহূর্তের অবস্থিতিও সহ্য করতে তিনি সম্মত নন। পঙ্গপালের উপস্থিতি তার এই সাম্রাজ্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে প্রজাপতি এবং অন্যান্য রঙ্গিন মথ দেখলে তিনি কুপিত হন না।

যেভাবে নিজের ইক্ষু-সাম্রাজ্য এবং বাসস্থানকে দেখতে চান শ্রীরামশর্মা, সেভাবেই সেগুলিকে বিন্যস্ত এবং সজ্জিত রাখার জন্য প্রাণপাত করে শত শত আত্মবিক্রিত ভূমিদাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত এক সপ্তাহকাল ধরে শ্রীরামশর্মার আয়ত্তাধীন সমগ্র ভূখণ্ডকে আরও ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন এবং সুচারুবিন্যস্ত করে তোলা হয়েছে।

রামশর্মার বাসগৃহ ইষ্টকনির্মিত। তাঁর ইক্ষু-সাম্রাজ্যের এমন এক স্থানে সুপরিকল্পিতভাবে সেই অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে সেটিকে কোনোভাবেই ইক্ষু-উদ্যানের অংশ বলে মনে না হয়: আবার সেই বাড়ি থেকে যেন চতুর্দিকেই দিগন্তবিস্তারী ইক্ষু-সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য এবং ব্যাপক ব্যাপ্তি অনুভব করতে কোনো অসুবিধাও না হয়।

আজ সেই বিশাল অট্টালিকা পুষ্পে সজ্জিত, ধূপসৌরভে আমোদিত। বিশাল অট্টালিকার কোনো প্রত্যন্ততম কোণেও বিন্দুমাত্র ধূলিকণার অস্তিত্ব আজ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। গত সপ্ত দিবস যাবত গোলগোমীরা স্বয়ং শ্রীরামশর্মার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অট্টালিকাটিকে সজ্জিত করছে। প্রত্যেক কক্ষেই, বিশেষ করে, যেসব কক্ষে ঊর্ণাবতীর পা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমন সবগুলি কক্ষেই স্ফটিকস্বচ্ছ ধাতুর তৈরি অন্তত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক দীপাধার স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে সুদৃশ্য তেপায়া। সেখানে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের পানীয়। ডাবের জল, আখের রস, দ্রাক্ষারস, কমলার রস, মৃদু উত্তেজক সোমরস, এবং পরসুক। সবগুলিই রাখা হয়েছে বিশেষ ধরনের ধূসরবর্ণ পাথরের পাত্রে, যাতে সেগুলিতে বজায় থাকে পছন্দনীয় শীতলতা। বাড়িতে কোনো পুরুষ থাকবে না। শ্রীরামশর্মার নিজস্ব দেহরক্ষী দল অবশ্য থাকবে। তবে তারা থাকবে বাড়ির বাহিরে বিশেষ বিশেষ স্থানে, যেখান থেকেই প্রভুর নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। যে গোলগোমী এবং দাসীরা প্রভু এবং অতিথির সেবা করবে, তাদের বেছে নেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে। তারা শিষ্টাচারে, সুমিত ভাষণে এবং নিজেদেরকে সুশ্রীরূপে উপস্থাপনে দক্ষ।

শ্রীশর্মার পরিবারের সকল সদস্যকে সাতদিন পূর্বেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কামরূপের রাজধানীতে। সেখানে তার নিজস্ব বৃহৎ অট্টালিকা রয়েছে। রাজকার্যে এবং বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাকে মাঝে মাঝে রাজধানীতে যেতে হয়। তাই সেখানকার অট্টালিকার বিশালতা এবং সাজসজ্জাও শ্রীরামশর্মার সামাজিক মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তার স্ত্রী-গণ স্বামীর নির্দেশকে দেবতার নির্দেশ স্বরূপ জ্ঞান করে। মনু-সংহিতা তাদের সেটাই শিখিয়েছে। কাজেই স্বামী তাদেরকে দশদিনের জন্য রাজধানীতে গিয়ে থাকার নির্দেশ দিলে তারা বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছে স্বামীর নির্দেশ। তারা এমনকি ব্যাখ্যা বা কারণও জানতে চায়নি। কারণ জানানোর প্রয়োজন মনে হলে স্বামী নিজেই জানাতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী না জানাতে চাইলে তা জানতে চাওয়ার কোনো অধিকার মনু তাদের দেননি। দ্রৌপদী-সীতা-সাবিত্রীর আশীর্বাদ পেতে হলে স্বামীকে বিনাপ্রশ্নে মেনে চলতে হবে, এটাই মনু বারংবার বলে দিয়েছেন। এর অন্যথা মানেই হলো ভ্রষ্টাচার। এর অন্যথা মানেই হলো সতীজীবনের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাই, রামশর্মা যা-ই করেন না কেন, তার গৃহশান্তি সর্বদাই অটুট।

স্বর্ণখচিত ক্ষৌমবস্ত্রে আচ্ছাদিত ঢল্লরিকা পাঠানো হয়েছে গতরাত্রেই। সঙ্গের নিপুণা দাসীকে বলে দেওয়া হয়েছে যে ঊর্ণাবতীকে যেন সে কোনোক্রমেই তাড়া না দেয়। বা এমন কোনো আচরণ না করে, যাতে ঊর্ণাবতী বিরক্ত হতে পারে। পথে ঢল্লরিকার নিরাপত্তার জন্য পাঠানো হয়েছে দশজন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র নিরাপত্তাযোদ্ধা। তারা এই কামরূপ রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে কোনো যুদ্ধকালে কামরূপের রাজা তার অধীনস্থ সকল সামন্তের কাছ থেকে চেয়ে নেন তাদের শ্রেষ্ঠ ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের। এই দশজন বিভিন্ন যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজার কাছ থেকে পদক এবং প্রশংসাবচন অর্জন করেছে। কাজেই এই রকম দশজন যোদ্ধার প্রহরাধীনে ঊর্ণাবতী পথিমধ্যে এতটাই নিরাপদ, যতটা নিরাপদ শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

কিন্তু শ্রীশর্মার প্রতীক্ষার প্রহর আর যে কাটতে চায় না! নিজের ইক্ষু-শস্য-পুষ্প সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য তাকে আর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। শীতল পানীয় তার ভেতরের উত্তেজনাকে চাপিয়ে রাখতে আদৌ সাহায্য করতে পারছে না। তার ভেতরের লোভ, ঊর্ণাবতীকে কাছে পাওয়ার লোভ, সকল ইন্দ্রিয়কে ছাপিয়ে এই মুহূর্তেই যেন ফেটে বেরিয়ে পড়বে। শ্রীশর্মা এই নিয়ে কতবার যে পথের দিকে তাকালেন, তা গণনা করে রাখতে গেলে করণীকের লেখ্যপুস্তকের সকল সাদা পৃষ্ঠা অংকের পর অংকে সমাকীর্ণ হয়ে যেত। আর এখন তো এমন অবস্থা, রামশর্মা ঊর্ণাবতীর আসার পথ ছাড়া আর কোনো দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। এত দেরি হচ্ছে কেন? এত দেরি করছে কেন ঊর্ণাবতী? হঠাৎ একটি আশংকা মনে উদয় হওয়ামাত্র থরথর করে কেঁপে উঠলেন শ্রীশর্মা। যদি ঊর্ণাবতী আজ তার এই উদ্যানে আগমন কোনো কারণে স্থগিত করে ফেলে! তাহলে? তাহলে হায় কৃষ্ণ, তোমার সেবক রামশর্মাকে কামানল থেকে রক্ষা করবে কে! এখন তো রামশর্মার কেবলমাত্র ঊর্ণাবতীকেই চাই। তার পরিবর্তে পিতৃলোক থেকে স্বর্গবেশ্যা উর্বশী-মেনকা-রম্ভাকে পাঠালেও রামশর্মা প্রশমিত হতে পারবেন না। কারণ, হা কৃষ্ণ তুমি তো জানো না– ঊর্ণাবতীর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্ত হয় না! হা মদন দেব তুমি আমাকে আর কত দগ্ধশরে বিদ্ধ করবে! ঊর্ণাবতী! ঊর্ণাবতী তুমি এখনো আমার দৃষ্টিসীমায় ধরা দিচ্ছ না কেন! হা মদন দেব আমি যে আর পারছি না!

১৬. কট্টলি! কট্টলি!

দিব্যোকের কৃষ্ণকালো চোখমণির চারপাশ বেষ্টনকারী সমস্ত সাদা অংশ টকটকে লাল হয়ে গেছে। সেই চোখ থেকে কালো গণ্ডদেশে যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, সেই ফোঁটাগুলিকেও চোখের রক্তাভার কারণে রক্ত বলেই ভ্রম হয়। এই অশ্রু ক্রোধের। এই অশ্রু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার। এই অশ্রু ঘৃণার। কথা বলার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছে দিব্যোক। কিন্তু ঠোঁট এতটাই কম্পমান যে কোনো শব্দ পূর্ণ আঙ্গিক নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি মুখ-নিঃসৃত হয়ে। তাকে এতক্ষণ ক্রোধে কম্পমান দেখেছে সমবেত কৈবর্তরা। আর তখন তারা নিঃশংসয়ে অনুভব করেছে যে তাদের নেতা নির্বাচন ভুল হয়নি। আর কারো মনের মধ্যে কৈবর্ত জাতির জন্য এত ভালোবাসা জমা হয়ে নেই। আর কারো বুকের মধ্যে বরেন্দির জন্য এত হাহাকার জমা হয়ে নেই। আজ সমবেত কৈবর্তরা নিশ্চিত, দিব্যোকের মধ্য দিয়ে এবার কট্টলি কথা বলবেই!

নিজেকে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে দিব্যোক। এটাই রীতি। নিজের ক্রোধ, নিজের উচ্ছ্বাস, নিজের ভীতি, নিজের আবেগ কখনোই নেতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবে না। এই জ্ঞান দিব্যোক কোনো শাস্ত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেনি। কোনো চাণক্য কিংবা কৌটিল্য তাকে এই রীতি শিক্ষা দেয়নি। দিব্যোক নিজে নিজে নিজের জীবন থেকেই অর্জন করেছে এই শিক্ষা। কারণ সে জন্ম থেকেই নেতা। কট্টলি নিজেই তাকে তৈরি করেছে। কৈবর্ত জাতির পুরুষ থেকে পুরুষান্তরের সকল প্রজ্ঞা লোহিত সদানীরা-বাহিত হয়ে জমা হয়েছে দিব্যোকের মধ্যে। সেই প্রজ্ঞা পূর্ণ ভাস্বরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশের জন্য খুঁজে নিয়েছে আজকের দিনটিকে।

অমানুষিক প্রচেষ্টায় অবশেষে নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় দিব্যোক। এবার সে ভেবে-চিন্তে কথা বলতে পারে। নিজের পাশে দাঁড়ানো সহচরদের উদ্দেশ্যে অকম্প্র নির্দেশ জানায়– ক্ষেত্রপূজার রাতে কৈবর্তদের ওপর আক্রমণে যে কজন রাজপুরুষ অংশ নিয়েছিল, তাদের ধরে নিয়ে এসো! অশ্বশালা থেকে যে কয়টা প্রয়োজন দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে যাও। সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র। অশ্ব ছোটাবে বায়ুবেগে। ওদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করবে মধ্যাহ্নের আগেই।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠে আসে সমাবেশের মর্মস্থল থেকে। সেদিকে তাকিয়ে দিব্যোক সতর্ক করে সবাইকে– শোনো, এখানে কোনো সহিংস ঘটনা ঘটবে না। মহারাজের রাজপুরুষদের আমি যে শাস্তি প্রদান করব, তা এই সাম্রাজ্যের রীতি এবং শাস্ত্র মেনেই। তোমরা এমন কিছু করবে না, যাতে পালসম্রাট মনে করেন যে, কৈবর্তরা বিদ্রোহ করেছে!

এবার ক্রুদ্ধ একটা কণ্ঠ ভেসে আসে– বিদ্রোহ কাকে বলে তা আমরা জানি না। তবে আমরা জানি, মোদের লিজেদের বরেন্দিকে আমরা আবার লিজেদের করে নিব। অন্য ভূমি থেকে যারা এসেছে, তাদের তাড়িয়ে দেব। বলব, যা তোরা তোদের লিজেদের মাটিতে গিয়ে থাক!

পালসম্রাটের দৃষ্টিতে সেটাকেই বিদ্রোহ করা বলে। সেই কাজ আমরা এখন করব না।

এবার একাধিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠ যোগ দেয় পূর্বের কণ্ঠের সঙ্গে– না দিব্যোক তোমার এই বিবেচনা ন্যায্য লয়। আমরা আর কত সহ্য করব! আমাদের ক্ষেত গিয়েছে, ঘর গিয়েছে, বন গিয়েছে, নদী গিয়েছে। মোদের স্বজনরা হারিয়ে গিয়েছে কামরূপ নামের অজানা দেশে। সেখানে তারা দাসত্ব করছে আর্য দস্যু-তস্করদের। আমরা এখন কট্টলি মায়ের নামে একাট্টা হয়েছি। মোদের কট্টলি মোদের কাছে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

দিব্যোক মাথা নাড়ে– হ্যাঁ। মোদের কট্টলি আবার মোদের লিজেদের কট্টলি হবে। কিন্তু তার জন্য এখনই, এই আজকেই ঝাঁপিয়ে পড়া চলবে না। সব কাজের জন্য একটা লগ্ন লাগে। লাগে না?

এবার সকলেই স্বীকার করে– হ্যাঁ লাগে।

ঠিক বলেছ এবার! দিব্যোক প্রশংসার স্বরে বলে– সেই লগ্নের আর বেশি দেরি নাই। কিন্তু তোমরা কেউ আগ বাড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার এতদিনে তিলে তিলে গড়া পরিকল্পনা নষ্ট করে দিও না।

তাই বলে কি আমরা দেদ্দাপুরের এতবড় অন্যায় মুখ বুঁজে সইব? তার কোনো প্রতিকার হবে না।

অবশ্যই হবে। কিন্তু সেই প্রতিকার তোমরা আমাকেই করতে দাও।

সমাবেশ থেকে চাপা কণ্ঠে বোধহয় কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশিত হয়। দিব্যোক কণ্ঠ উচ্চগ্রামে নিয়ে বলে– আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে যায় সমাবেশ। সম্ভবত এই ধরনের কোনো প্রশ্ন আসতে পারে তা ভাবতে পারেনি কেউ। তাই উত্তর দিতে একটু দেরি হয়। কিন্তু উত্তর আসে ঠিকই– আছে।

আছে।

প্রথমে একটা কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই শব্দটি। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটি কণ্ঠ উচ্চারণ করে একই শব্দ। তারপরেই সমস্ত সমাবেশ একসাথে ঘোষণা করে– আছে! আছে!

তাহলে আমি যেভাবে বলব, সেভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকো। লগ্ন এলে আমি তোমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে বলব। আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

লগ্ন এসেছে কি না, তা আমরা বুঝব কীভাবে?

দিব্যোকের মুখে ফুটে ওঠে অপূর্ব একটুকরো হাসি। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে– লগ্ন যখন আসবে, তখন আমরা সবাই তা ঠিকই টের পাব। বরেন্দি মা তার সকল সন্তানকে জানিয়ে দেবে।

তখনই অশ্বক্ষুরের শব্দ ওঠে। সবাই তাকায় শব্দের উৎসের দিকে। লাল ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে দিব্যোকের সহচরবৃন্দ। সমাবেশের মধ্যস্থলে এসে থেমে দাঁড়ায় অশ্বারোহীরা। কয়েকটি অশ্বের পিঠে দুইজন করে আরওহী। তাদের মধ্যে একজন দিব্যোকের কৈবর্ত-সহচর, অপরজন পালসম্রাটের রাজপুরুষ। রাজপুরুষদের টেনে-হিঁচড়ে নামায় দিব্যোকের সহচরবৃন্দ। দাঁড় করিয়ে দেয় প্রাদেশিক অমাত্য দিব্যোকের সামনে।

ভয়ে কাঁপছে বীরপুঙ্গবরা। তাদের দিকে রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় দিব্যোক। জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে– কৈবর্তদের পবিত্র ক্ষেত্রপূজার রাতে তাদের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছিল তোমাদের?

কারো মুখ থেকে কোনো উত্তর আসে না।

দিব্যোক এবার ধমকে ওঠে– তোমরা আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চেষ্টা করো না। শীঘ্র বলো তোমাদের নির্দেশদাতার নাম। তা নাহলে এই সমাবেশ তোমাদেরকেই সার্বিক অপরাধী ধরে নিয়ে তোমাদের বিচার করবে। তাই নিজেরা বাঁচতে চাইলে তোমাদের নির্দেশদাতার নাম সর্বসমক্ষে জানিয়ে দাও!

রাজপুরুষরা একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় দিব্যোকের দিকে। এরপর তাদের দৃষ্টি পড়ে সমাবেশের মানুষগুলোর দিকে। কালো পাথরের মতো মুখগুলোতে তীব্র জিঘাংসা জ্বলজ্বল করছে। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণার আগুন। শিউরে ওঠে রাজপুরুষরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কঠোর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– এই শেষবারের মতো তোমাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শেষবারের মতো তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। কে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিল আক্রমণ করার?

এবার উত্তর আসে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়– শ্রীবৎসপালস্বামী।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি ওঠার মতো সমাবেশে উচ্চারিত হতে থাকে নামটি– বৎসপালস্বামী! বৎসপালস্বামী!

দিব্যোক আবার হাত উঁচু করে। সঙ্গে সঙ্গে সমাবেশে নেমে আসে পালকপতন স্তব্ধতা। দিব্যোক এবার বলে– তোমরা কি জানো না পালসম্রাটের প্রাদেশিক অমাত্য ছাড়া আর কারো এমন ধরনের কোনো নির্দেশ প্রদানের অধিকার নেই?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে রাজপুরুষরা।

দিব্যোক আবার বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে– জানো? নাকি জানো না?

একজন বলে– আমরা ভেবেছিলাম, শ্রীবৎসপালস্বামী হয়তো আপনার অনুমতি নিয়েছেন।

চমৎকার! তীব্র শ্লেষের সাথে বলে দিব্যোক– আমার স্বজাতির পবিত্রতম পার্বন পণ্ড করার নির্দেশ বা সেই নির্দেশের অনুমোদন দেব আমি! তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে, ভট্টবামন তার ভগবান বিষ্ণুর যজ্ঞ নির্বাপিত করার নির্দেশ দিচ্ছেন? অথবা এটাও কি কল্পনা করতে পারো যে মহারাজাধিরাজ মহীপাল নির্দেশ দিচ্ছেন প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠান পণ্ড করার?

প্রশ্নের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে ওঠে রাজপুরুষরা।

বিরতি দেয় না দিব্যোক– তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে বৎসপালস্বামী আমার অনুমোদন ছাড়াই তোমাদের দিয়ে এমন একটি দুবৃত্তসুলভ পাপকার্য করিয়ে নিয়েছেন? বুঝতে পারছ?

একবার মাথা তুলে দিব্যোকের দিকে তাকিয়েই আবার মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় রাজপুরুষদের এই দলটির অধিকর্তা। মৃদুকণ্ঠে বলে– হ্যাঁ বুঝতে পারছি অমাত্যপ্রবর!

তাহলে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে শ্রীবৎসপালস্বামী এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়ে পালসাম্রাজ্যের রাজকীয় নীতিমালা ভঙ্গ করেছেন?

এবার পুরো হতভম্ব হয়ে পড়ে রাজপুরুষের দল। এমন যুক্তিজালে একজন কৈবর্ত যে আর্যদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে, এটি তাদের কারো কল্পনাতেই আসেনি কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথামোটা রাজপুরুষদের কথা নাহয় বাদই দেওয়া গেল, কূটবুদ্ধি-দেবতার বরপুত্র ভট্টবামন স্বয়ং কি কোনোদিন ভাবতে পারবেন? ভাবতে পারবে পালসাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগর্বী অমাত্যবর্গ?

এবার আসে চরম আঘাতটি। দিব্যোক বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করে– শ্রী বৎসপালস্বামী মহান পালসাম্রাজ্যের নীতিমালা ভঙ্গ করে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের রাজকীয় কর্মচারিদের ব্যবহার করেছেন, রাজশক্তিকে কুপথে পরিচালিত করেছেন। তাই শাস্তি হিসাবে এই মুহূর্ত থেকে তাকে বিষ্ণুমন্দিরের সেবায়েত পদ থেকে অপসারণ করা হলো। সেই সঙ্গে তিনি যে অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছেন, তার শাস্তি হিসাবে তাকে দশ বৎসরের জন্য প্রাদেশিক বন্দিশালায় বন্দি করে রাখার নির্দেশ প্রদান করে রাখা হলো। যদি তিনি বন্দিত্ব না চান, তাহলে অবিলম্বে তাকে বরেন্দি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর কখনোই তিনি বরেন্দিতে পা রাখতে পারবেন না।

দিব্যোকের সহচররা উৎসাহের সঙ্গে শ্রীবৎসপালস্বামীকে বন্দি করার জন্য যাওয়ার উদ্যোগ করতেই হাতের ইঙ্গিতে তাদের নিরস্ত করে দিব্যোক। বলে– শ্রীবৎসপালস্বামীকে বন্দি করে বন্দিশালায় নিয়ে আসার দায়িত্ব রাজপুরুষদের। তাদের কর্তব্য তারাই পালন করুক। তোমরা তাদের এই কর্তব্য-পালনে যথোচিত সাহায্য করবে। শ্রীবৎসপালস্বামীর লোকেরা যদি রাজপুরুষদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে, তবে পালসাম্রাজ্যের প্রাদেশিক অমাত্য হিসাবে আমি তোমাদের এই অধিকার প্রদান করছি যে, রাজকীয় নীতিমালা প্রতিপালনের জন্য তোমরা যতটা প্রয়োজন, ততটাই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে শ্রীবৎসপালস্বামীর পোষা ঠাঙ্গাড়েগুলোকে হত্যা করার অনুমতিও তোমাদের দেওয়া হলো।

এবার রাজপুরুষদের দিকে তাকিয়ে উদার হাসি হাসে দিব্যোক। বলে– তোমরা নিশ্চিন্ত মনে রাজকীয় কর্তব্য পালনে এগিয়ে যাও। আমার সহচরবৃন্দ তোমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। যদি তোমরা ঠিকমতো প্রাদেশিক অমাত্যের নির্দেশ মেনে শ্রীবৎসপালস্বামীকে বন্দি করতে সক্ষম হও, তাহলে বৎসপালস্বামীর অন্যায় নির্দেশে তোমরা নিজেরাও যে অন্যায় কর্ম করেছ, সেই অপরাধের শাস্তি হিসাবে তোমাদের যাতে সবচেয়ে লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা আমি করব।

দ্রিগ্ দ্রিগ্ দ্রিগ্...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই একই জয়ঢাক বাজছে। সেই একই রাজপুরুষ ঘোষণা করছে রাজকীয় নির্দেশ। তবে এবারের ঘোষণাটি কৈবর্তদের কানে যেন মধুবর্ষণ করছে–

শুন হে দেদ্দাপুরের মানুষজন!

বিষ্ণুমন্দির স্থাপনের জন্য এই দেদ্দাপুরসহ যে চারটি গ্রামকে দেবোত্তর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, প্রাদেশিক অমাত্য দিব্যোকের নির্দেশে পুস্তপাল ভাণ্ডারি দেব সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছেন। আর একই সঙ্গে সেবায়েত শ্রী বৎসপালস্বামীকে তার পদ থেকে আপসারণ করা হয়েছে। ফলে এখন আর বৎসপালস্বামীর কোনো নির্দেশ মেনে চলতে এইসব গ্রামের মানুষ বাধ্য নয়। বৎসপালস্বামীর যে কোনো নির্দেশ এখন থেকে অকার্যকর বলে গণ্য হবে। প্রাদেশিক অমাত্যের কার্যালয় থেকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সকল গ্রাম যথাবিধি মহারাজাধিরাজ মহীপালের শাসনাধীন পালসাম্রাজ্যের রীতি এবং পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হবে। কেউ কোনোরূপ বাড়তি কর আরোপের অধিকার থাকবে না। কেউ কোনো কৈবর্ত-কোল-ভিল-কোচ নর-নারী-শিশুকে বিষ্টি প্রদানের জন্য বাধ্য করতে পারবে না। বন, নদী, খাল, গোবাট ইত্যাদির ওপর কেউ কোনো কর আরোপ করতে পারবে না।

দ্রিগ দ্রিগ দ্রিগ...

ঢাকের তালে তালে ততক্ষণে কৈবর্ত নরা-নারীরা উল্লাসনৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

সেই রাতেই আক্রমণ এল।

ঘুমন্ত কৈবর্তরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা কৈবর্তদের ঝুপড়ি ঘরগুলিকে গিলে খেয়ে আকাশে কিংবা বাতাসের শূন্যতায় মিলিয়ে দিতে শুরু করল। প্রত্যুষের পূর্বেই দেখা গেল দেদ্দাপুর নামে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব আর বরেন্দিতে নেই। শ্রীবৎসপালস্বামী নিজে আর্য হয়ে একজন কৈবর্তের কাছে হেরে যাবে, তা তো কিছুতেই হতে পারে না। দিব্যোক, তুমি প্রাদেশিক অমাত্য হও, আর যা-ই হও, তুমি কোনোদিন অতি সাধারণ একজন আর্যেরও সমকক্ষ হতে পারবে না!

১৭. ঊর্ণাবতী ঊর্ণাবতী...

প্রধান দ্বারে অতিথির আগমনসূচক আনন্দ-শঙ্খ বেজে ওঠে। আর রামশর্মার হৃৎপিণ্ড আনন্দের আতিশয্যে তার বুকের মধ্যে এত জোরে লাফিয়ে ওঠে যে মনে হয় এই বুঝি বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সেটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে! উর্ণাবতী এসেছে! অবশেষে প্রতীক্ষার হয়েছে অবসান।

শ্রীরামশর্মার ইক্ষু-সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বারে রাখা হয়েছে কচি ডাব, আখের রসসহ নানাবিধ পানীয়। সেখানে খাটানো হয়েছে বর্ণালী একটি তাঁবুও। যদি সেখানে বসে উর্ণাবতী পথশ্রম শেষে হাত-মুখ প্রক্ষালনের পরে দু'ঢোক পানীয় পান করতে চায়! কিন্তু উর্ণাবতীর ঢল্লরিকা সেখানে শ্লথগতি হয় না। এত দূর থেকেও শ্রীরামশর্মা পুলকিত হয়ে দেখেন, উর্ণাবতীর ঢল্লরিকা সোজা চলে আসছে তার দিকে। শ্রীরামশর্মা পুলকিত বোধ করেন। কারণ তার মনে হয়, উর্ণাবতীও পথে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করতে চায় না। বরং যত শিঘ্র সম্ভব শ্রীরামশর্মার সান্নিধ্যে পৌঁছাতে চায়। প্রথম যেদিন উর্ণাবতীর পত্রবাহিকা দাসী এখানে এসে রামশর্মার হাতে তার কর্ত্রীর পত্র তুলে দেয়, সেদিন আনন্দে ও বিস্ময়ে বিভোর হয়ে পড়েছিলেন শ্রীরামশর্মা। এ-ও কী সম্ভব! যে উর্ণাবতীর অধরোষ্ঠের একটু হাসি দেখার জন্য এই রাজ্যের সকল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য তরুণ ও যুবকের দল দিনের পর দিন হা-পিত্যেশ করে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরপ্রাঙ্গণে পড়ে থাকে, সেই তাদের বঞ্চিত করে পুরো একটি অহোরাত্রির জন্য উর্ণাবতী আসতে চায় শ্রীরামশর্মার ইক্ষু-সাম্রাজ্যদর্শনে। পত্রদূতী বিনিতস্বরে জানতে চায়, তার কর্ত্রীর ইচ্ছা কি পূরণ হবে? শ্রীরামশর্মা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দেন– এই ইক্ষু-উদ্যান, এই অট্টালিকা, এই উদ্যানের কর্মীসকল এবং তাদের প্রভু শ্রীরামশর্মা এখন থেকে প্রতিটি উদগ্রীব প্রহর কাটাবে উর্ণাবতীর আগমন-প্রতীক্ষায়। নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট ক্ষণে এই উদ্যানে পা রাখলেই উর্ণাবতী দেখতে পাবেন, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সকলেই প্রস্তুত।

আজ উর্ণাবতীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারেন না শ্রীরামশর্মা। এর আগে মন্দিরে গিয়ে উর্ণাবতীকে অন্তত কয়েকবার শয্যাসঙ্গিনী করার সৌভাগ্য তার হয়েছে। দেবদাসী উর্ণাবতীকে তো শ্রীরামশর্মার মতো লোকদের যৌনলালসা মেটানোর জন্যই মন্দিরে রাখা হয়েছে। তাই উর্ণাবতী তার কাছে সদা কামনার হলেও একেবারে আনকোরা নতুন নয়। কিন্তু সে যে এমন অলোকসুন্দরী, তা আজ পূর্ণ সূর্যালোকে এই মনোহর পরিবেশে না দেখলে বোঝা যেত না। তার ইক্ষু-উদ্যানে উর্ণাবতী নিজ উদ্যোগে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে বলে শ্রীরামশর্মার এখন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়। আর সেই সাথে মনে হয়, আজ তার এই ইক্ষু-সাম্রাজ্য যথার্থ ধন্য হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম বিনয় এবং পুলকের সঙ্গে চল্লরিকা থেকে উর্ণাবতীকে নিজে হাত ধরে নামিয়ে আনেন শ্রীরামশর্মা। তার মুখে ফুটে ওঠে যথার্থ আর্যব্রাহ্মণের ভাষা– ভদ্রে! সব সংবাদ কুশল তো? পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

কষ্ট! মুক্তাসদৃশ দন্তরাজির ঝলকানি দেখা যায় উর্ণাবতীর মুখে– আপনার ব্যবস্থাপনায় কষ্ট নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব কোনোদিন থাকতে পারে!

প্রশংসা মাথা পেতে নিলেন শ্রীরামশর্মা। মুখে বলেন– আজ ধন্য হলো আমার এই উদ্যান! আমার এই অট্টালিকা! এত এত বছর ধরে আমি যে বিপুল শ্রম ব্যয় করে এই উদ্যান তৈরি করেছি, আজ মনে হচ্ছে বৃথা যায়নি আমার পরিশ্রম। মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ সাফল্যধন্য আমার শ্রম। ধন্য আমি।

উর্ণাবতী নিরস্ত করে তাকে– সে কী বলছেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার মতো একজন সামান্যা নারীকে আপনি সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনার সাম্রাজ্যে, তাতে আমি নিজেই বরং ধন্য।

এবার আর এই তর্ক এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হন না শ্রীরামশর্মা। বরং উর্ণাবতীকে আহ্বান জানান তার অতিথিনিবাসের দিকে। এখানে কিছু জলখাবার গ্রহণ এবং বিশ্রামের পরে উদ্যান ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

জলখাবারের সময় লোকলজ্জা ভুলে গিয়ে নির্নিমেষে উর্ণাবতীর মুখের দিকে এবং শারীরিক সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকেন শ্রীরামশর্মা। তার কাছে উর্ণাবতীকে মনে হয় উর্বশীর সমতুল্য। মহাভারতের সেই আখ্যানের কথা তার মনে পড়ে যেখানে উর্বশী যাচ্ছে অর্জুনকে সেবা করতে। মহাভারতকার কী অপূর্ব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন উর্বশীর! "উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমাল্য ধারণ করলেন এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হলে অর্জুনের ভবনে যাত্রা করলেন। তার কোমল কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশ পুষ্পমালায় ভূষিত, মুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান করছে, চন্দনচর্চিত হারশোভিত স্তনদ্বয় তার প্রতি পদক্ষেপে লক্ষিত হচ্ছে। অল্প মদ্যপান, কামাবেশ এবং বিলাসবিভ্রমের জন্য তিনি অতিশয় দর্শনীয়া হলেন।"

এই মুহূর্তে উর্ণাবতীর দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে শ্রীরামশর্মার মনে প্রশ্ন জাগে– উর্বশী কি উর্ণাবতীর চাইতেও দর্শনীয়া এবং আকাঙ্ক্ষিতা ছিলেন? মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তার উর্বশীকে নিয়েই থাকুন, এই মুহূর্তে শ্রীরামশর্মার কাছে উর্ণাবতীর তুলনায় ত্রিলোকের আর কেউ কামনীয় নয়। এখন থেকে সান্নিধ্যের প্রতিটি পল-অনুপল তিনি উর্ণাবতীকে উপভোগ করবেন। উপভোগ করবেন দৃষ্টি দিয়ে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর রাত্রিকালে...। রাত্রিকালের কথা মনে আসতেই তিনি সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বলেন– সূর্যদেব, আজ আপনি নিজেকে যদি আগে আগে গুটিয়ে নেন, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব!

ঊর্ণাবতীর কথায় তার চমক ভাঙে। ঊর্ণাবতী উচ্ছলা কণ্ঠে বলে– কই! আপনি কি আমাকে এই অতিথিভবনেই বসিয়ে রাখবেন? উদ্যান দেখাতে নিয়ে যাবেন না? আমি কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্যান ঘুরে দেখতে চাই! লোকমুখে কত শুনেছি এই উদ্যানের কথা! আজ পুরো উদ্যান পরিদর্শন করে নিজের দুই চোখকে ধন্য করতে চাই।

হেসে ফেলেন শ্রীরামশর্মা– পুরো উদ্যান তুমি ঘুরে দেখতে চাও, এ তো আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ তাহলে তোমাকে অনেক বেশিদিন ধরে আমার কাছে রাখতে পারব।

ঊর্ণাবতী বুঝতে পারে না এই কথার তাৎপর্য। জিজ্ঞেস করে– আপনার কথার অর্থ?

অর্থ অতি পরিষ্কার। তুমি যদি সূর্যালোকের প্রতিটি মুহূর্তও কাজে লাগাও, তাহলেও আমার এই ক্ষুদ্র উদ্যান সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করতে তোমাকে অন্তত একটি সপ্তাহ ব্যয় করতে হবে। তুমি চাইলে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে তোমাকে এক সপ্তাহের আতিথ্য প্রদানে তৈরি আছি।

ওরে বাবা! কপট বিস্ময়ে অপূর্ব এক ভ্রূভঙ্গি করে ঊর্ণাবতী। আর সেই সৌন্দর্য দেখে আরও একবার নতুন করে মোহিত হন শ্রীরামশর্মা। ঊর্ণাবতী বলে– তার যে উপায় নেই, সে কথা তো আপনিও জানেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ। মন্দিরের দেবতা তাহলে আমাকে ভস্ম করে দেবেন। সেই সাথে হয়তো আপনাকেও। তার চাইতে চলুন, আপনিই আপনার পছন্দমতো অংশ আমাকে দেখান।

স্মিত হাসির সাথে শ্রীরামশর্মা জানতে চান– কখন থেকে পরিদর্শন শুরু করতে চাও?

এই মুহূর্ত থেকেই। কোনো অসুবিধা আছে?

ঊর্ণাবতীর প্রশ্নে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসেন শ্রীরামশর্মা– আমার সাম্রাজ্যে আমার অসুবিধা! মুখে বলেন– এই যে চার অশ্বের রথ প্রস্তুত তোমার জন্য। আমরা ইঙ্গিত করামাত্র রথ আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করবে।

রথের পেছনের যে যাত্রী অংশ, তাতে দুই জনের বসার ব্যবস্থা। পালকের আসন বিছানো সেখানে। এত আরামদায়ক রথে পূর্বে কখনো ওঠেনি ঊর্ণাবতী। আসনের সামনে-পেছনে, বামে-দক্ষিণে খোলা। যেদিকে তাকাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবারিত দৃষ্টি চলে যায়। আর সেইসঙ্গে চতুর্দিক থেকে মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ এসে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা করে চলে যাত্রীকে। মাথার ওপরে রৌদ্র প্রতিরোধক আচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনবস্ত্রও কার্যকর এবং অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন।

রথ চলতে শুরু করে। রথচালককে পূর্বাহ্নেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে রেখেছেন শ্রীরামশর্মা। তাই দেখা যায়, রথ চলতে শুরু করে ধীর সুচারু এবং নিয়মিত গতিতে। জোরে ছুটলে হয়তো পথের পাশের এমন কোনো অংশ দ্রুত পেরিয়ে চলে যাওয়া হবে, যা ঊর্ণাবতীর ভালো করে দেখা হবে না। এমন গতিতে চলছে রথ, যাতে মনে হয় মৃদুমন্দ বায়ুসেবন করতে চলেছেন রথযাত্রীরা। মনে মনে শ্রীরামশর্মার প্রশংসা করতে বাধ্য হয় ঊর্ণাবতী। সত্যিই লোকটার ব্যবস্থাপনা খুবই সুচারু।

তার পাশে বসে আছেন শ্রীরামশর্মা। ঊর্ণাবতীর শরীরের যতটা নিকটে বসা যায় ততটাই নিকটে তার অবস্থান। ঊর্ণাবতীর শরীরের একটা পাশ পুরোপুরি সার্বক্ষণিক স্পর্শ করছেন তিনি নিজের শরীর দিয়ে। পথ চলতে চলতে রথ সামান্যতম ঝাঁকি খেলেও তিনি সুযোগটা ছাড়ছেন না। ঊর্ণাবতীর শরীরের সাথে নিজের শরীরটাকে ঠেসে ধরছেন অন্যমনস্কতার ভান করে। ঊর্ণাবতী কোনো বিরক্তি প্রকাশ করে না। বাধা তো দেয়ই না। ঊর্ণাবতীর এই মৌন সম্মতিকে তার প্রতি সত্যিকারের অনুরাগের প্রকাশ ভেবে মনে মনে আরও বেশি পুলকিত হতে থাকেন শ্রীরামশর্মা।

রথচালককে নির্দেশ দেওয়া আছে, সে প্রথমে যাবে উদ্যানের সেই অংশে, যেখানে সবচেয়ে উন্নত মানের ইক্ষুর চাষ করা হয়। সেইসব নধরকান্তি সবুজ রসে ভরপুর ইক্ষু-শরীর দেখলে যে কেউ মোহিত হয়ে যায়। মৃদুমন্দ বাতাসে সেই ইক্ষুগুলো এমন মধুর ভঙ্গিতে শরীর দোলায়, যা দেখলে প্রথমেই মনে আসে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রশিক্ষিত রাজনর্তকীদের কথা। সেই দিকেই চলছে রথ।

কিন্তু সেই পথে এগুলে আগে পেরুতে হয় সব্‌জি-উদ্যান। এই কথাটি মনে ছিল না শ্রীরামশর্মার। মনে থাকার কথাও নয়। এমনিতেই সেই অংশটিকে তিনি কখনো নিজের উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গণ্য করেন না। তিনি নিজে কালে-ভদ্রে পা রাখেন সেখানে। দ্বিতীয়ত এখন পাশে বসে আছে ঊর্ণাবতীর মতো অপ্সরা, যে কিনা তার স্পর্শকেলীকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে মধুর হাসি ওষ্ঠে নিয়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে কোনো সমর্থ পুরুষের মন কি অন্যদিকে যেতে পারে? তাই ঊর্ণাবতী যখন নিজের কনকচাঁপা তর্জনি উঁচিয়ে উচ্চস্বরে বলে ওঠে– ওটা কী? সব্‌জি-উদ্যান বুঝি? ইস কী সুন্দর! আমি এখানে নামব!– তখন তার কথা শুনে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে হয় শ্রীরামশর্মাকে। ঊর্ণাবতীর মতো কোনো উদ্ভিন্নযৌবনা পরমাসুন্দরী নারী পুষ্পোদ্যানের কথা না ভেবে সবজির ক্ষেত দেখে যে রথ থামিয়ে দিতে পারে, এমন কথা কস্মিনকালেও মনে উদয় হয়নি শ্রীরামশর্মার। বিশেষ করে এমন প্রাগঅভিসার লগ্নে। কিন্তু শ্রীরামশর্মার ধাতস্থ হয়ে উঠতে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই রথ ছেড়ে সবজি ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ে ঊর্ণাবতী। বাধ্য হয়ে নামতে হয় তাকেও।

সবজি উদ্যানের মধ্যে কিশোরী এক বহুবর্ণা প্রজাপতির মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ঊর্ণাবতী। কখনো বাতিঙ্গন গাছের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনো অলাবুর জাংলার নিচে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনো গিয়ে হাত বোলাচ্ছে কুষ্মাণ্ডের গায়ে। আবার কখনো ছুটে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বঙ্গাসোনা ফুলের (বকফুল) কাণ্ডের নিচে। ক্ষেত পরিচর্যারত গোলগোমী মেয়েরা মুখে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাদের দৃষ্টিতেও মুগ্ধতা। কোনো মানবী যে এমন সৌন্দর্যের অধিকারিনী হতে পারে, তা তারা নিজেরা নারী হয়েও কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি। সেই গোলগোমীদের কাছে হাসিমুখে এগিয়ে যায় ঊর্ণাবতী। তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে। এই সময় বাধ্য হয়েই কিছুটা দূরে দাঁড়াতে হয় শ্রীরামশর্মার। কারণ, ক্রীতদাস বা দাসীদের, অন্তত দিনের আলোতে, অত নৈকট্যে আসার সুযোগ দান করাটা শাসনকার্যের জন্য সুফলদায়ক নয়। তার পরিবারের কোনো সদস্য গোলগোমীদের সাথে এমন ঘনিষ্টভাবে বাক্যালাপ করার সাহসই পাবে না। অন্তত শ্রীরামশর্মার সামনে তো নয়-ই। কিন্তু ঊর্ণাবতীর কথা স্বতন্ত্র। তার জন্য এখানে সবকিছুই বৈধ। তাই মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও শ্রীরামশর্মাকে মুখে হাসি নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গোলগোমী মেয়েরাও যেন বুঝতে পেরেছে, এই যুবতীর সন্তুষ্টিতেই তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি। তাই তারাও অন্য কাজ ফেলে ঊর্ণাবতীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকাটাকেই আপাতত প্রধান কাজ ধরে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঊর্ণাবতী অবশ্য এই বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও ভুলে যায়নি শ্রীরামশর্মার কথা। সে একটু পরপরই বৃত্তের মেয়েদের পাশ দিয়ে গ্রীবা বাড়িয়ে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে শ্রীরামশর্মার দিকে।

হঠাৎ মৃদু একটা চিৎকার ভেসে আসে। সেদিকে তাকায় সবাই। পপীপ। পাশের নালা থেকে ঘড়ায় জল ভরে আনছিল সব্জির গোড়ায় সিঞ্চনের জন্য। জলের ঘড়াটা তার ছোট্ট দেহের তুলনায় বেশ বড়ই বলতে হবে। সেটাকেই কাঁধে তুলে নিয়ে বহু কষ্টে এক পা এক পা করে জল আনছিল পপীপ। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ঘড়াসমেত নিজে আছড়ে পড়েছে ক্ষেতের মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটিতে পড়ে থাকা পপীপের দিকে এগিয়ে যায় জনা দুই গোলগোমী। কিন্তু তাদের পেছনে ফেলে দমকা বাতাসের মতো একছুটে পপীপের কাছে পৌঁছে যায় ঊর্ণাবতী। হাত ধরে টেনে বসায় শিশুটিকে। হা হা করে ছুটে আসেন শ্রীরামশর্মা। ঊর্ণাবতীর কী মাথা খারাপ হয়েছে! এমন একটা অসুর গোত্রের সন্তানকে সে স্পর্শ করে বসেছে! শ্রীরামশর্মার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পপীপের ওপরে। কাছে গিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন– এই অসুরনন্দনকে কে এখানে কাজ করতে বলেছে?

সবজি-উদ্যানের দ্বারপ্রহরী ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে প্রভুকে– প্রভু আপনার নির্দেশেই এই শিশুটিকে এখানে কাজ দেওয়া হয়েছে! কিন্তু শিশুটি দারুণ অশক্ত। এতটুকু জলও সে বইতে পারে না।

শ্রীরামশর্মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই ঝংকার শোন যায় ঊর্ণাবতীর কণ্ঠের– এতটুকু শিশুকে এমন কঠিন কাজ দিয়ে রেখেছেন! আপনার কি হৃদয়ে দয়া-মায়া নেই!

ঊর্ণাবতীর এই কথা যেন চপেটাঘাত করে শ্রীরামশর্মাকে। তিনি কোনো রকমে সম্মান বাঁচানোর জন্য দ্বাররক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বলেন– বালকটিকে তাদের থাকার জায়গাতে নিয়ে যাও! আর ওর বাপকেও ডেকে বলো সে যেন ছেলেকে একটু পরিচর্যা করে। আজকে ওদের পিতা-পুত্র দুজনারই কোনো কাজ করতে হবে না।

ঊর্ণাবতী তবু বালকের কাছ থেকে সরে না। জিজ্ঞেস করে– তোমার নাম কী বাছা?

প্রশ্ন করার সময় বুক কাঁপছিল ঊর্ণাবতীর। যদি পপীপ বলে ফেলে যে সে তাকে চেনে, তাহলেই সর্বনাশ! কিন্তু মল্ল চমৎকারভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছে পপীপকে। সে যে ঊর্ণাবতীকে চিনতে পেরেছে, এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না তার আচরণে। সে মাথা নিচু করে ঊর্ণাবতীর প্রশ্নের উত্তরে নিজের নাম জানায়– পপীপ।

তোমার বাবার নাম?

বট্যপ।

তোমাদের দেশ কোথায়?

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেন না শ্রীরামশর্মা। একটু রূঢ়কণ্ঠেই বলেন– যথেষ্ট হয়েছে ঊর্ণাবতী। এমন একটা অসুর অনার্য গোষ্ঠীর সন্তানের কুল-ঠিকুজি না জানলেও তোমার চলবে।

এই একটাই শুধু ছন্দপতন। বাদবাকি সারাটা দিন খুবই চমৎকার কাটে শ্রীরামশর্মার। ঊর্ণাবতীও যেন সবজি উদ্যানের বালকটিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার কারণে একটু লজ্জিত। শ্রীরামশর্মার সুন্দর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য একটু যেন অনুশোচনাতেও ভুগছে। তাই সে পুষিয়ে দিতে চায় শ্রীরামশর্মার এই মানসিক ক্ষতিটুকু। শ্রীরামশর্মা তার শরীরের সাথে সেঁটে এলে সে-ও নিজেকে আরও সংলগ্ন করে দিতে চায় শ্রীরামশর্মার শরীরের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কতার ভান করে শ্রীরামশর্মা তার কদলীবৃক্ষের মতো উরু, হরিণীগ্রীবার মতো কোমর, এমনকি কখনো কখনো সমুদ্র-শঙ্খের মতো স্তনে কাঁপা কাঁপা হাত ছোঁয়ালেও সেই হাতকে শাসন-বারণ কিছুই করে না। মোটকথা চমৎকার স্বপ্নের মতো কাটে শ্রীরামশর্মার দিনটি।

এখন রাত।

নৈশভোজপর্ব শেষ হয়েছে। কত যে চর্ব চষ্য লেহ্য পেয়-র আয়োজন করে রেখেছিলেন শ্রীরামশর্মা। কিন্তু দেখা গেল উর্ণাবতী এতই পরিমিত আহারী যে তাকে স্বল্পাহারী বলাই শ্রেয়। একে তো সে কোনো আমিষ স্পর্শ করে না, তদুপরি ঘৃতান্ন এবং মিষ্টান্ন থেকেও নিজের হাত গুটিয়ে রাখে। অল্প একমুষ্টি সরুচালের ভাত, কিছু নিরামিষ তরকারি, কয়েক টুকরা ফল দিয়েই শেষ হয় তার রাতের আহার। সঙ্গীরা অবশ্য খাওয়ার আসন থেকে সহজে নড়েনি। তারা সব রকমের সুস্বাদু খাদ্যে উদরপূর্তি করেছে। খাওয়ার প্রতিযোগিতাতেও নেমেছিল কেউ কেউ। তাদের যুক্তি, আজকের সুখাদ্য আসলে দেবী উর্ণাবতীর প্রসাদ। সেই প্রসাদের অবমূল্যায়ণ করে কেউ পাপের ভাগী হতে সম্মত নয়। যুক্তি শুনে মনে মনে হাসেন শ্রীরামশর্মা। আবার মনে মনে খুশিও হন খাদ্যগুলির সদ্‌গতি হতে দেখে। তদুপরি রন্ধনের প্রশংসা এবং তার আতিথেয়তার প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে একটু গর্বও অনুভব করেন তিনি।

এখন রাত।

উর্ণাবতীর সঙ্গিনীরা চলে গেছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে। উর্ণাবতীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সব চাইতে সুন্দর এবং আরামদায়ক কক্ষটি। সচরাচর শ্রীরামশর্মা নিজে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন এই শয়নকক্ষটি। একবার কামরূপের মহারাজা স্বয়ং আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামশর্মার প্রাসাদে। মহারাজাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এই কক্ষে। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন যে, এমন সুসজ্জিত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরামদায়ক শয়নকক্ষ তার প্রাসাদে একটিও নাই। তিনি এই কক্ষে যে তৃপ্তিময় নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পেরেছেন, তা বহুদিন তার মনে থাকবে।

সেই কক্ষ আজ ধন্য হচ্ছে উর্ণাবতীর নিশিযাপনের আশ্রয় রূপে।

রাত্রি এগিয়ে চলে গভীরতার দিকে। আর কামাবেগে অস্থিরতা বেড়ে চলে শ্রীরামশর্মার। তিনি ভাবছেন কোনো-না-কোনো সংকেত আসবে উর্ণাবতীর কাছ থেকে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো সংকেত না পেয়ে নিজেই এগিয়ে চললেন শ্রীরামশর্মা। কক্ষদ্বারে এসে দেখলেন ভেতর থেকে দ্বার রুদ্ধ। নিদারুণ হতাশায় ছেয়ে গেল তার হৃদয়। হায় উর্ণাবতী এই ছিল তোমার মনে! ভগ্নহৃদয়ে সেই কক্ষের দ্বারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীরামশর্মা। একবার ইচ্ছা হলো দুয়ারে মৃদু করাঘাত করেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নেন। কামনার আগুনে যতই তিনি পুড়তে থাকুন না কেন, মদন দেবের শরাঘাতে যতই তিনি জর্জরিত হন না কেন, উর্ণাবতী তাকে অনাহূত মনে করলে তিনি কিছুতেই তার সকাশে যেতে পারেন না। তার আভিজাত্য, তার অবস্থান কিছুতেই তাকে এমন কাজ করতে দেয় না। কামতপ্ত কম্পমান শরীর নিয়ে তিনি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সেই অলঙ্ঘনীয় দরজার সামনে। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করেন।

ঠিক তক্ষুণি তার শরীরে এসে ঝাপ্টা মারে মৃদু একটু বাতাস, খুব মৃদু আলোর রেখা এসে পড়ে গায়ের ওপর, আর অপার্থিব একটি সুগন্ধ আছড়ে পড়ে তার নাসারন্ধ্রে। তিনি চমকিত হয়ে দেখতে পান, দুয়ার অবারিত হয়েছে। কপাটে হাত দিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্ণাবতী। মনে হয়, এতক্ষণে পুনরায় নিজের জীবন ফিরে পেয়েছেন শ্রীরামশর্মা। আহ্বানের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দেয় উর্ণাবতী। শ্রীরামশর্মা হাত বাড়িয়ে দেন সেই মৃণাল দুই বাহুর দিকে। তার হাতের স্পর্শ পাওয়ামাত্র উর্ণাবতীর নৃত্যপটিয়সী দেহ সুললিত ছন্দে চলে আসে শ্রীরামশর্মার দুই বাহুর মধ্যে। মুহূর্ত পরেই শ্রীরামশর্মা টের পান, তার বুকের সাথে লেপ্টে রয়েছে কুসুমের চেয়েও কোমল একটি অপেক্ষা-থরথর নারীদেহ।

উর্ণাবতীর শরীরকে নিজের বক্ষসংলগ্ন রেখেই কক্ষে প্রবেশ করেন শ্রীরামশর্মা। শয্যা প্রস্তুত। শুধু প্রস্তুতই নয়, শয্যা যেন আহ্বান জানাচ্ছে তাদের। দীপাধানে একটি মাত্র ঘৃতের প্রদীপ। সেটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় উর্ণাবতী। কিন্তু বাধা দেন শ্রীরামশর্মা। আদর-কামনাময় কণ্ঠে বলেন– থাকুক না একটি প্রদীপ! আমি তোমাকে অবলোকন করতে চাই! অনাবৃত

পিতৃগণ– ১০ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ণাবতীর লীলায়িত যৌবন চোখে দেখে দৃষ্টিকে ধন্য করতে চাই। আমি তোমাকে অবলোকন করতে চাই প্রিয়ে!

অবলোকন না কি দৃষ্টিলেহন? রিনরিন হাসির সাথে বেজে ওঠে ঊর্ণাবতীর কণ্ঠস্বর।

হেসে ওঠেন শ্রীরামশর্মাও। সকল ধরনের দ্বিধা-জড়তা-লজ্জাবোধ অন্তর্হিত হয়ে গেছে দুজনের মন থেকে। এখন শুধু পরস্পরকে প্রদানের জন্য উন্মুখ পরস্পর। শ্রীরামশর্মা বলেন– আচ্ছা! তোমার কথাই ঠিক। আমি দৃষ্টিলেহন করতেই চাই তোমাকে। শুধু দৃষ্টিলেহনই নয়, সর্বপ্রকারে লেহন করতে চাই তোমাকে।

তীব্র আবেগে শ্রীরামশর্মা জড়িয়ে ধরেন ঊর্ণাবতীকে। মুখ ঘষতে থাকেন ঊর্ণাবতীর বুকে। হাত তার বিচরণ করে ঊর্ণাবতীর শরীরের যত্রতত্র। তীব্র শীৎকারে নিজেই কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকেন শ্রীরামশর্মা। তার নিজের গতমান যৌবন সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। তিনি পাঁজাকোলা করে ঊর্ণাবতীকে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলেন পুষ্পশয্যায়। শয্যায় একটি গড়ান দিয়ে এমন আহ্বানের ভঙ্গিতে কাত হয়ে আধাশোয়া-আধাবসা অবস্থান গ্রহণ করে ঊর্ণাবতী যে শ্রীরামশর্মার সমস্ত শরীরে আবার আগুন ধরে যায় দপদপ করে। তিনি ক্ষিপ্র টানে নিজের পরিধেয় বস্ত্র মোচন করতে থাকেন। সেদিকে তাকিয়ে থাকে ঊর্ণাবতী ঠোঁটে কামনাকাতর আহ্বানের হাসি নিয়ে। নিজেকে সকল পরিধেয় থেকে মুক্ত করা শেষ হলে শয্যার দিকে এগিয়ে যান শ্রীরামশর্মা। সেই সময় ঊর্ণাবতী বলে ওঠে– আমার একটি প্রার্থনা রয়েছে। বলুন, আপনি পূর্ণ করবেন আমার প্রার্থনা?

একটু থমকে গিয়ে রামশর্মা জানতে চান– কী তোমার প্রার্থনা?

আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি পূর্ণ করবেন আমার প্রার্থনা!

এই সময়ে বিলম্ব কী সহ্য হয়! শ্রীরামশর্মা বলেন– তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই প্রিয়ে। আমার সাধ্যের মধ্যে যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে তোমার প্রার্থনা। বলো কী চাও তুমি?

আমি চাই আপনার সবজি-উদ্যানের নেই বালকটিকে।

কোন বালক?

ঐ যে সেই বালকটি, যার নাম পপীপ।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে শ্রীরামশর্মার– মাত্র একটি ক্রীতদাস বালককে চাও তুমি! একাধিক ক্রীতদাস চাইলেও দিয়ে দিতাম আমি তোমাকে। যাও দিয়ে দিলাম তোমাকে। কাল প্রাতঃকালে তোমার মন্দির প্রত্যাবর্তনের সময় অন্যান্য উপহারসামগ্রীর পাশাপাশি ঐ বালকটিকেও দিয়ে দেওয়া হবে তোমার সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু কথা শেষ হয় না ঊর্ণাবতীর। বলে– আমার অপরাধ মার্জনা করবেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি জানি আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। তবু আমি চাই, আপনি একটি লিখিত অনুজ্ঞা প্রদান করুন!

এই অসময়ে এই আব্দার! মনে মনে যথেষ্ট অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শ্রীরামশর্মা। বলেন– এখন কোথায় পাব লিখার সামগ্রী।

চোখ নাচায় ঊর্ণাবতী– ঐ যে আপনার সুদৃশ্য ত্রিপদীর ওপরে রাখা আছে লিখার যাবতীয় সামগ্রী।

শ্রীরামশর্মা এগিয়ে যান ত্রিপদীর দিকে। খাগের কলম তুলে নিয়ে খস খস করে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কিন্তু দ্রুত লিখে ফেলেন পপীপের হস্তান্তরপত্র। তুলে দেন ঊর্ণাবতীর হাতে। বলেন– এখন তুমি সন্তুষ্ট?

হ্যাঁ। তবে পুরোপুরি নয়। হস্তান্তরপত্রে চোখ বুলিয়ে বলে ঊর্ণাবতী।

আর কী করতে হবে?

একটু সংশোধন করতে হবে এই হস্তান্তরপত্রটি।

সে আবার কী?

এই যে আপনি লিখেছেন, ক্রীতদাস বালক পপীপকে বিনামূল্যে হস্তান্তর করছি ঊর্ণাবতীর কাছে।

শ্রীরামশর্মা কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বলেন– হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ভুলটা কোথায়?

ঊর্ণাবতী হাসে– আপনি কি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বালকটিকে হস্তান্তর করছেন?

অবশ্যই।

মূল্য নিচ্ছেন না? আমি কি কোনো মূল্য পরিশোধ করছি না?

ঊর্ণাবতীর এমন রহস্যময় বাক্যের কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারেন না শ্রীরামশর্মা। বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। ঠোঁটের রহস্যময় হাসি আরও পুরুষ্ট হয় ঊর্ণাবতীর। দুই হাত তার এগিয়ে আসে নিজের বক্ষের দিকে। দুই হাত ধীরছন্দে অবারিত করে বক্ষের বসন। সেই বক্ষসৌন্দর্য চোখে পড়ামাত্র আবার প্রবল কামে কেঁপে ওঠে শ্রীরামশর্মার সমস্ত দেহ। তার দৃষ্টি যেন পুরোপুরি আটকে গেছে ঊর্ণাবতীর উন্মুক্ত বক্ষে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের অনাবৃত বুকের দিকে একবার তাকায় ঊর্ণাবতী। আবার বলে– আমি কি কোনো মূল্যই পরিশোধ করছি না?

হেসে ওঠেন শ্রীরামশর্মা। হস্তান্তরপত্রটি হাতে নিয়ে 'বিনামূল্যে' শব্দটি কেটে দিয়ে লেখেন 'যথাযথ মূল্যে'। এগিয়ে দেন ঊর্ণাবতীর দিকে– একবার ঠিক আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্তান্তরপত্রটি পাঠ করে উর্ণাবতী। যত্ন করে রেখে দেয় মাথার দিকের একটি দীপাধারের তলায়। তারপর হঠাৎ ত্বরিতে দুই হাত ধরে শ্রীরামশর্মার। সেই হাত দুটিকে স্থাপন করে নিজের বুকের ওপর। মুহূর্ত পরেই তার দেহের সম্পূর্ণ সত্ত্ব-স্বামীত্ব আজকের সারারাত্রির জন্য চলে যায় শ্রীরামশর্মার অধিকারে।

১৮. খণ্ডযুদ্ধের কাল

নাম উগ্র। কিন্তু মস্তিষ্ক তার এতই শীতল যে দিব্যোক পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। চরম উত্তেজনা কিংবা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাকে দেখলে মনে হবে সে আরও বেশি শান্ত হয়ে পড়ছে। যে রকম পরিস্থিতিতে পড়লে মানুষ সাধারণ বোধবুদ্ধি এবং স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে, সেই সময়ে যেন উগ্র আরও বেশি চিন্তাশীলতায় মগ্ন হতে পারে। তার চিন্তার তীক্ষ্ণতা তত যেন বাড়তে থাকে। আবার যুদ্ধের মাঠে তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। যুদ্ধকালে সে এত নিখুঁতভাবে অস্ত্র চালায়, যেন মনে হয় কোন অস্ত্র সে কোনদিকে এবং কখন প্রয়োগ করবে, আগে থেকেই সবকিছু তার পরিকল্পনা করা ছিল।

প্রত্যাঘাত-পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব তাই উগ্রর কাঁধেই ন্যস্ত করা হয়েছে।

আঘাত এমনভাবে করা হবে, যাতে মনে হয়, দেদ্দাপুরসহ চারটি গ্রামের বিক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ কৈবর্তরাই প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছে। আক্রমণে অংশ নেবার জন্য এমন সব যুবকদের বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে দিব্যোক বা তার সাথীদের কোনো সংস্রব আছে, এমন দাবি সপ্রমাণ করা অসম্ভব হয়। সৈন্যদল বা দিব্যোকের দেহরক্ষীদের হাতে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র থাকে, সেসব অস্ত্র এই আক্রমণে আদৌ ব্যবহার করা হবে না। কোনো দেবগ্রামে সার্বিকভাবে আক্রমণ চালানো হবে না। সাধারণ হিন্দু বা বৌদ্ধদের ওপর কোনো অস্ত্রাঘাত করা হবে না। কোনো নারী বা শিশুর ওপর তো নয়-ই। খুঁজে খুঁজে তালিকা করা হয়েছে শ্রীবৎসপালস্বামীর অপকর্মের সঙ্গীদের। তাদের আবাসস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে। দিব্যোকের অনুচররা জানে সেই আক্রমণকারীদলের সদস্যরা কে কোথায় অবস্থান করছে। শুধু তাদেরই বেছে বেছে তুলে আনা হবে। যদি তারা বন্দিত্ব বরণ না করে, তবে সেখানেই তাদের হত্যা করা হবে। সেই হত্যাকাণ্ডে মুগুর ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। মুগুরের আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মস্তক। আর যাদের বন্দি করা সম্ভব হবে, তাদের তুলে আনা হবে দেদ্দাপুরে। যেখানে এখন ভস্মস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। সেখানে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে তাদের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। যারা অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের জীবন ভিক্ষা দেওয়া হবে। তবে তারা যেন আর কোনোদিন কৈবর্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে না পারে, সেজন্য তাদের হাত এবং পা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে মুষলাঘাতে। অন্যেরা, যারা এই দুষ্কর্মের মূল হোতা, তাদের বলি দেওয়া হবে গাঁওদেব-গাঁওদেবীর থানে।

সম্পূর্ণ অভিযান এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মনে হবে যে এটি বিক্ষুব্ধ একটি কৈবর্তগোষ্ঠীর কাজ। এমন বিক্ষুব্ধ কয়েকটি দল অনেক আগ থেকেই কাজ করছে বরেন্দিতে। তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালায় রাজপুরুষদের ওপর, কেড়ে নেয় আদায়কৃত রাজকীয় কর, মাঝে মাঝে হত্যাও করে অত্যাচারী কোনো কোনো রাজপুরুষ এবং রাজকর্মচারীকে। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ভল্লর দস্যু-বাহিনী। ভল্ল একসময় ছিল একজন দশগ্রামিক। তার লোকদের বিষ্টি দেবার জন্য ধরে নিয়ে হতো জাগদল বিহারে। তখন জাগদল বিহার নির্মাণ করা হচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বিষ্টি দেবার জন্য দশগ্রামের প্রায় সকল সক্ষম লোককেই মাসের পর মাস বাধ্য করা হতো। নিজেদের ক্ষেতের কাজ করার অবকাশই জুটত না কারো। ফলে ক্ষেতে ফলানো গেল না ফসল। দশগ্রামের মানুষ খেতে পায় না। তারা এসে হাত পাতে ভল্লর কাছে। ভল্ল কোত্থেকে অন্ন দেবে তাদের। তার নিজের ক্ষেতও তো পড়ে আছে চাষের অভাবে ফসলরিক্ত হয়ে। সে তখন সঙ্গীদের নিয়ে গিয়েছিল বিহারের অধ্যক্ষের কাছে। নিবেদন জানিয়েছিল, যত চড়া সুদই লাগুক না কেন, তাদের খাদ্যঋণ দেওয়া হোক। নইলে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে মরে যাবে। কিন্তু বিহার থেকে তাদের এককণা খাদ্যও দেওয়া হলো না। সেই রাত্রেই ভল্ল তার সঙ্গীদের নিয়ে বিহারে অভিযান চালাল। তারা কাউকে হত্যা করেনি। শুধু নিজেদের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য কেড়ে এনেছিল বিহারের গোলাঘর থেকে। প্রতিশোধ নিতে দেরি করেনি রাজকীয় সৈন্যরা। পরের দিনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভল্ল সতর্ক ছিল। গ্রামের প্রবেশপথে একটা মোটামুটি উঁচু টিলা। সেই টিলার মাথায় দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টির গোচড়ে আসে। সেখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় লোক রেখেছিল ভল্ল। তারা অনেক দূর থেকে আসতে দেখেছিল আক্রমণকারী সৈন্যদলকে। সময়মতো সংকেত পেয়ে গ্রামের নারী আর শিশুরা কাছের পাহাড়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ভল্ল নিজের সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিহত করতে গিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজপুরুষদের। তবে কিছুক্ষণের খণ্ডযুদ্ধের পরেই আর টিকতে পারেনি তারা বিপুল শত্রুপক্ষের সাথে। বন্দি হয়েছিল ভল্ল। তাকে এনে রাখা হয়েছিল প্রাদেশিক অমাত্যের বন্দিশালায়। সেখান থেকে তাকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয় দিব্যোকের দেহরক্ষী বাহিনীর লোকরা। পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আর বনে আশ্রয় নেয় ভল্ল। গড়ে তোলে একটা দুর্ধর্ষ দস্যুদল। সেই দল নিয়ে গত কয়েক বছরে বরেন্দির বিভিন্ন দেবগ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে ভল্ল। অনেক দেবগ্রামে এখন মায়েরা ঘুমাতে অনিচ্ছুক শিশুকে ঘুম পাড়ায় ভল্লর ভয় দেখিয়ে– চুপ! চুপ! ঐ আসছে ভল্ল ডাকাত। কোনো শিশুকে কাঁদতে শুনলে সে তুলে নিয়ে যায়, আর পাথরের গায়ে আছড়ে শিশুদের মাথা গুঁড়ো করে দেয়। শ্ শ্ শব্দ কোরো না সোনা! ঘুমাও শিগগির!

ভল্ল তার ত্রাস সৃষ্টিকারী দল নিয়ে থাকবে অভিযানের একেবারে সম্মুখভাগে। তার পেছনে থাকবে চারটি গ্রামের যুবকের দল। তবে তারা থাকবে মুখে মুখোশ পড়ে। যে মুখোশ জোটাতে পারেনি, তার মুখে কালি-ঝুলি লেপ্টে দিয়ে এমন ভয়ংকর আনন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ঘুমভাঙ্গা চোখে এমন অবয়ব চোখে পড়ামাত্র আঁতকে উঠবে মানুষ। আর সবার পেছনে থাকবে উগ্র-র নেতৃত্বাধীন দিব্যোকের অনুচরদের যুদ্ধ-প্রশিক্ষিত একটা দল। তারা পারতপক্ষে নিজেদের অবয়ব দেখাবে না। তারা নিজেরা ঢুকবে না কোনো দেবগ্রামে। গ্রামে ঢোকার পথগুলিতে অবস্থান গ্রহণ করবে। অবরুদ্ধ করে রাখবে গ্রামকে। ইত্যবসরে নিজেদের কাজ করবে ভল্লর দল। যদি কোনো কারণে ভল্লর নেতৃত্বাধীন যুবকরা পরাজয় কিংবা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র তখনই, সংকেত পেলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

১৯. ভট্টবামনের ক্রোধ

বেশ কিছুদিন ধরে বরেন্দ্রীর কোনো সংবাদ পাচ্ছেন না ভট্টবামন। সেখানে কর্মরত খোলদের (গুপ্তচর) বলে দেওয়া হয়েছে যে বরেন্দ্রী যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর স্থান, তাই যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তার কাছে এসে পৌঁছাতেই হবে। রাজকীয় খোলদের পাশাপাশি ভট্টবামন নিজস্ব উদ্যোগে আরও কয়েকজন খোল নিযুক্ত করেছেন। তাদের কেবলমাত্র ভট্টবামনের নিকটেই সংবাদ পৌঁছে দিতে হয়। এরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। এদের পক্ষে দ্রুততর গতিতে বরেন্দ্রী থেকে রাজধানীতে সংবাদ বহন করে আনা সম্ভব। এদের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর পর একটি করে গোপন জায়গাতে সতেজ ঘোড়া রাখা হয়েছে। এরা বরেন্দ্রী থেকে রওনা দিয়ে চলে আসবে প্রথম জায়গাটিতে। এখানে এলেই পাবে বিশ্রামের সুযোগ, খাওয়ার সুযোগ, এবং তাৎক্ষণিকভাবে ক্লান্ত অশ্বের পরিবর্তে অন্য একটি তরতাজা অশ্ব পাওয়ার সুযোগ। কাজেই ক্লান্ত ঘোড়াকে বিশ্রাম দেবার জন্য তাকে সেখানে একটি রাত্রি বা একটি বেলা অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। ফলে অন্য যে কারো চেয়ে অন্তত দুইদিন পূর্বে রাজধানীতে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ তার থাকছে।

কিন্তু এত সুচারু ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক দিন হলো বরেন্দ্রীর কোনো সংবাদ এসে পৌঁছেনি ভট্টবামনের কাছে।

সেই সংবাদ আজ এল। কিন্তু কোনো খোলের মাধ্যমে আসেনি সংবাদ। এসেছে মন্দিরের সেবায়েত শ্রীবৎসপালস্বামীর মাধ্যমে। অবশ্য শ্রীবৎসপালস্বামীকে এমন বিধ্বস্থ এবং বিস্রস্থ অবস্থায় দেখে মনে হচ্ছে তিনি এখন নিজেই একটি সংবাদ।

ভট্টবামন তাকে জিজ্ঞেস করেন– আপনি কবে যাত্রা শুরু করেছেন বরেন্দ্রী থেকে?

মনে মনে করাঙ্গুল গুণে শ্রীবৎসপালস্বামী বলেন– এগারো দিবস পূর্বে।

ভ্রূ কুঁচকে ওঠে ভট্টবামনের– এত সময় কেন লাগল আপনার রাজধানী পৌঁছাতে?

ওরা আমাকে পদব্রজে আসতে বাধ্য করেছে।

ওরা কারা?

ওরা। মানে কৈবর্ত দস্যুদের দল। ওরা আমাকে দিনের পর দিন হাঁটিয়েছে। আমি তো জোরে হাঁটতে পারি না। আমার হাঁটার অভ্যেস নেই। উচ্চবংশের কোন ব্রাহ্মণেরই বা হাঁটার অভ্যেস থাকে! কিন্তু ওরা আমার কোনো কথাই শোনেনি। আমাকে হাঁটতে বাধ্য করেছে এত দিনের পথ। হাঁটতে অস্বীকার করার সাথে সাথে শারীরিক প্রহারের ভীতি প্রদর্শন করেছে। কখনো কখনো...

আর বলতে পারেন না শ্রীবৎসপালস্বামী। বিগত দিনগুলোর অত্যাচার, অবমাননা এবং লাঞ্ছনার কথা মনে আসায় কেঁদে ফেলেন হুঁ হুঁ করে। কিছুক্ষণ কাঁদার পরে ফুলে ফুলে বলতে থাকেন শ্রীবৎসপালস্বামী– মহান পালসাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ শ্রীযুক্ত ভট্টবামনের আত্মীয় হয়েও, উচ্চ দ্বিজবংশজাত হয়েও, শত শত যজমানের কুলগুরু হয়েও আমাকে, এই আচার্য বৎসপালস্বামীকে, এইভাবে লাঞ্ছিত হতে হলো... আবার কেঁদে ফেলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ত্বনা জানানোর জন্য শ্রীবৎসপালস্বামীর বাহু আলতোভাবে স্পর্শ করলেন ভট্টবামন। এই স্পর্শ পরম শক্তিমান এক সহায়কের স্পর্শ। এই রকম স্পর্শ জানিয়ে দেয়, আপনি এখন যার সম্মুখে আছেন, তিনি আপনাকে সকল প্রকারের নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম, এবং তিনি আপনাকে সেই নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছেন। এই রকম স্পর্শ জানিয়ে দেয়, আপনাকে যে কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিগত দিনগুলি কাটিয়ে আসতে হয়েছে, সেই কষ্টের জন্য আপনার প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে, এবং একই সাথে নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে একই ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আপনার জীবনে আর ঘটবে না। এই স্পর্শ আপনাকে এই নিশ্চয়তাও দিচ্ছে যে, স্পর্শকারী আপনাকে এখনো তার নিজস্ব লোক এবং স্বজন হিসাবেই গণ্য করছেন। ফলে আপনাকে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, তার প্রকৃত বিনিময়মূল্য আপনাকে প্রদান করা হবে।

এবার কিছুটা ধাতস্থ হতে পারেন শ্রীবৎসপালস্বামী।

তাকে নিজের সঙ্গে প্রাতরাশের আহ্বান জানান ভট্টবামন।

আহার চলাকালে কোনো বিরূপ প্রসঙ্গ যাতে না ওঠে, সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ সতর্ক রইলেন মহামাত্য ভট্টবামন। খাওয়া শেষে আচমনের পরে আবার ফিরে এলেন বরেন্দ্রী প্রসঙ্গে। সেই আঁধার আবার ফিরে আসে শ্রীবৎসপালস্বামীর অবয়বে। কিন্তু এবার আর ভট্টবামন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন না। বলেন– আপনি এবার সব কথা খুলে বলুন। তিক্ত হলেও বলতে হবে। কারণ সব কথাই আমার জানা প্রয়োজন। আর আপনিও তো সেসব জানানোর জন্যই এত কষ্ট সহ্য করে এখানে এসেছেন। তাই যা জানেন, সব বলুন আমাকে। প্রথমে একবাক্যে বলুন তো, বরেন্দ্রীর প্রকৃত অবস্থা ঠিক কেমন?

উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীবৎসপালস্বামী ইতস্তত করছেন দেখে ভট্টবামন তাকে আশ্বাস দেন– দ্বিধা করবেন না। আপনার দৃষ্টিতে প্রকৃত অবস্থা ঠিক যেমনটি বলে মনে হয়েছে, সেটাই বলবেন।

শ্রীবৎসপালস্বামী দীর্ঘশ্বান মোচন করেন– কী আর বলব মহামাত্য! এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বরেন্দ্রী যেন পাল সাম্রাজ্যের অংশই নয়। মহারাজাধিরাজ মহীপাল কিংবা আপনার কোনো প্রাধান্যই সেখানে বর্তমান নেই। বরেন্দ্রী পুরোপুরি পরিচালিত হয় সেখানকার প্রাদেশিক অমাত্য দিব্যোকের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে। সেখানে দিব্যোকের কথার ওপরে কোনো কথা চলে না। সেখানে আবার ফিরে এসেছে অসুর-শাসন।

মাথা ঝাঁকান ভট্টবামন। তার নিজেরও এমনটাই ধারণা। কিন্তু মহারাজ মহীপালকে কিছুতেই সম্মত করানো যাচ্ছে না দিব্যোকের বিরুদ্ধে কোনো কড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদক্ষেপ গ্রহণে। মনে মনে ছক কষে ফেলেন ভট্টবামন। শ্রীবৎসপালস্বামীকে উপস্থিত করতে হবে মহারাজ মহীপালের সামনে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগীর বক্তব্য শোনার পরে হয়তো মহারাজকে দিব্যোকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত করানো সম্ভব হলেও হতে পারে। শুধু একবার মহারাজের অনুমতি পাওয়া গেলেই হলো! ভট্টবামনের মুখের মধ্যে দন্তসকল একে অপরের সাথে ঘর্ষণে বজ্র উৎপাদন করে ফেলে প্রায়– একবার অনুমতি পেলে পালসৈন্যদের তিনি লেলিয়ে দেবেন বরেন্দ্রীর ওপর। স্বয়ং কীর্তিবর্মাকে পাঠাবেন সৈন্য পরিচালনার জন্য। তাকে জানিয়ে দেবেন, বরেন্দ্রীতে তিনি কোনো কৈবর্তকে জীবন্ত দেখতে চান না। তিনি চান, বরেন্দ্রীতে কোনো এককালে কৈবর্তরা বসবাস করত, সেকথাও যেন ভুলে যায় লোকে। ভট্টবামন মনের কথা কারো কাছে কখনো প্রকাশ করেন না। শ্রীবৎসপালস্বামীর কাছেও গোপনই রাখলেন। শুধু বললেন– আমি চেষ্টা করব আপনি যাতে মহারাজের সম্মুখে আপনার এই কষ্ট এবং লাঞ্ছনা ভোগের কথা নিজের মুখে তুলে ধরতে পারেন। তবে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনি পুনরায় বরেন্দ্রীতে ফিরে যাবেন সসম্মানে। সেখানে প্রতিশ্রুত মহামন্দির প্রতিষ্ঠিত হবেই। এবং সেই মন্দিরের সেবায়েত হিসাবে সেই অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবেন আপনিই!

ভট্টবামনের প্রতিশ্রুতি শ্রীবৎসপালস্বামীকে ঠিক কতখানি প্রভাবিত করেছে, তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। তিনি বোঝেন যে তাকে এখন প্রস্থান করার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এবার উঠে দাঁড়ান তিনি। বলেন– মহামান্য মহামাত্য, আপনার জন্য আমার মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠিয়েছে দিব্যোক।

তাই নাকি? ব্যগ্র মনে হয় ভট্টবামনকে– কী সেই বার্তা?

বলা ঠিক হবে কি না একমুহূর্ত ভাবলেন শ্রীবৎসপালস্বামী। তারপরে মনে হলো এখন তো পিছিয়ে আসার সুযোগ অবশিষ্ট নেই। তীক্ষ্ণ তীরকে ইতোমধ্যেই ধনুকের জ্যা-মুক্ত করা হয়ে গেছে। শ্রীবৎসপালস্বামী যান্ত্রিক কণ্ঠে বলে চললেন– দিব্যোক বলেছে, আপনি যেন মহারানীদের এই বলে অনুরোধ করেন, তারা যেন... তারা যেন...

ভুঁরু কোঁচকান ভট্টবামন– তারা যেন?

একবার ঢোক গিলতে হয়। তারপর গড়গড় করে বলে চলেন শ্রীবৎসপালস্বামী– মাতৃস্বরূপা মহারানীরা যেন বরেন্দ্রীতে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, বা যে কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন একটু কম করে দেখেন! এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘন ঘন স্বপ্ন দেখলে তার কৈবর্ত-সন্তানরা মহাবিপদে পড়ে যাবে। তারা বাস্তুহারা হয়ে পড়বে।

লাফিয়ে ওঠেন ভট্টবামন– এই বার্তা পাঠিয়েছে অনার্য পশুটি! এতবড় দুঃসাহস তার!

পরক্ষণেই তার মনে হয়, মহারাজকে এবার দিব্যোকের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হবে! মহারাজের মহিষীদের সম্পর্কে এমন কটাক্ষ করে বার্তা পাঠিয়েছে দিব্যোক। এবার আর সে ক্ষমা পাবে না মহারাজের। তিনি ব্যগ্র ভঙ্গিতে হাত পাতেন– কই? কোথায় সেই বার্তা?

এই যে বললাম!

আহা তা তো বললেনই। কিন্তু সেই লিখিত বার্তাটি তো আমাকে দেবেন!

কোনো লিখিত বার্তা তো নেই!

লিখিত বার্তা নেই? তাহলে কীভাবে আমি প্রমাণ করব যে ওটি দিব্যোকেরই প্রেরিত বার্তা?

তা তো আমি জানি না। হতভম্ব দেখায় শ্রীবৎসপালস্বামীকে।

ভট্টবামন কুঞ্চিত ভ্রু নিয়ে কড়া চাহনি নিক্ষেপ করলেন শ্রীবৎসপালস্বামীর দিকে– আপনি দিব্যোককে বলতে পারলেন না তার বার্তাটি ভূর্জপত্রে লিখে দিতে?

বলেছিলাম তো। কিন্তু দিব্যোক বলল, আমরা কৈবর্তরা লিখতে-পড়তে জানি না। আমাদের মুখের কথাই সব। কথাটি বলবেন মহামাত্যকে। শুধু এই কারণেই আপনাকে আপনাকে প্রাণ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যেতে দিচ্ছে কৈবর্তরা।

ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে ওঠে ভট্টবামনের মুখাবয়ব। বুদ্ধির খেলাতে তাকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছে দিব্যোক!

২০. প্রত্যাঘাতের সূত্রপাত

ঠিক পাঁচদিন পরে মহারাজের নামাঙ্কিত নির্দেশপত্র নিয়ে একটি রাজকীয় অশ্বারোহী দল এসে পৌঁছে দিব্যোকের কার্যালয়ে। নির্দেশে বলা হয়েছে–

পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ মহীপালের নির্দেশ বরেন্দ্রী ভূক্তির প্রাদেশিক অমাত্য দিব্যোকের প্রতি:–

"আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে বরেন্দ্রীর জনজীবনে অস্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেখানে রাজকীয় কর্তব্য পালনে কিছু কিছু কর্মচারির অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো রাজাদেশ সরাসরি অমান্য করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। এমন কিছু ঘটনা খুবই নিকট অতীতে বরেন্দ্রীতে ঘটে গেছে, যেসব নিয়ে সাম্রাজ্যের রক্ষক হিসাবে মহারাজাধিরাজ নিজেই চিন্তিত। মহারাজাধিরাজ মনে করছেন যে প্রাদেশিক অমাত্য হিসাবে আপনি দায়িত্ব পালনে যথেষ্ঠ শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেই কারণে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাস্য রয়ে গেছে। যদি এই সমস্ত জিজ্ঞাস্যের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতে পারেন, তাহলে আপনাকে আপনার পদে বহাল রাখা হবে।

আপনাকে তাই মহারাজ সমীপে রাজধানীতে আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই পত্রনির্দেশ পাওয়ামাত্র আপনার নিযুক্তক (পরবর্তী পদাধিকারী)-এর নিকট বরেন্দ্রীর শাসনভার অর্পণ করে পত্রবাহক অশ্বারোহী দলের সঙ্গেই রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন। অধিক বিলম্ব আপনার যোগ্যতার পরিপন্থি বলে গণ্য হবে।"

পত্র পাঠ শেষে দিব্যোকের মুখের হাসি অক্ষতই রয়েছে। রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যদের বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য তার ছোট ভাই রুদোককে বলা হলো। অশ্বারোহী দলটির প্রধান নিজের ব্যগ্রতা লুকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়– আমরা কখন যাত্রা শুরু করব মাননীয় প্রাদেশিক অমাত্য?

মৃদু হাসি খেলে যায় দিব্যোকের ঠোঁটে– সবে তো এলেন। একটু বিশ্রাম নিন। আপনাদের মতো অতিথির সেবা করার সুযোগ আমাদের দিন। আপনাদের শ্রান্তি অপনোদন হলে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

আবার রুদোকের দিকে ফিরে বলে– এঁদের আতিথ্যে যেন কোনো ত্রুটি না হয়! সবকিছু যাতে নিখুঁত হয়, প্রয়োজনে তুমি নিজে তার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করবে। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?

রুদোক মাথা ঝাঁকায়। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায় রুদোক। তাদের চলে যাওয়া দেখে দিব্যোক। তার মুখে আবার ফিরে আসে সেই হাসি।

এই অশ্বারোহী দলের আসার কথা পূর্বাহ্নেই জেনেছে দিব্যোক। রাজধানী থেকে দিব্যোকের খোলের মাধ্যমে এই তথ্য তাকে জানিয়ে দিয়েছে বন্ধু পদ্মনাভ। জানিয়েছে যে, মহারাজ মহীপালের নামাঙ্কিত চিঠি গেলেও এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গও জানেন না মহারাজ। এটি ভট্টবামন এবং কীর্তিবর্মার পরিকল্পিত বার্তা। যারা এই বার্তা নিয়ে যাচ্ছে, তারা কীর্তিবর্মার প্রশিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্তঘাতক। এদের সাথে পথে বেরুলে দিব্যোক কোনোদিনই সশরীরে রাজধানীতে পৌঁছাতে পারবে না। পথিমধ্যেই কোনো সুবিধাজনক স্থানে তাকে হত্যা করবে এই পেশাদার খুনীর দল। ভট্টবামন জানেন যে, দিব্যোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে কৈবর্তদের মুক্তি কমপক্ষে আরও একশত বৎসর পিছিয়ে যাবে। কৈবর্ত-পুলিন্দা-শবর-কোচ-ভিল-রাজবংশীসহ বরেন্দির মৃত্তিকা-সন্তানরা আর কোনোদিনই হয়তো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ভট্টবামন এবং তার সঙ্গীরা এখন তাই যে কোনো মূল্যে পৃথিবী থেকে দিব্যোক নামক আপদটিকে অপসারণ করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাদের বর্তমান পরিকল্পনা যদি সার্থক না-ও হয়, তাহলেও তারা নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে আসবে না। প্রয়োজনে তারা মহারাজকে বাধ্য করবে বরেন্দিতে বড় ধরনের সেনা অভিযান চালিয়ে দিব্যোক এবং তার সঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করতে। পদ্মনাভ বার বার জোর দিয়ে জানিয়েছে, প্রেরিত ঘাতক দলের কোনো সদস্যই যেন রাজধানীতে ফিরে আসতে না পারে। তাদেরকে নিরস্ত্র এবং বন্দি করে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে অন্য কোনো বার্তাবাহকের মাধ্যমে রাজধানীতে ভট্টবামনের কাছে সংবাদ পাঠাতে হবে এই মর্মে যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা পার্বণের কারণে দিব্যোকের পক্ষে এই মুহূর্তে বরেন্দি ছেড়ে আসা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তবে এই কাজ বা পার্বণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দিব্যোক রাজধানীতে উপনীত হবে। আজ হোক আর কাল হোক, ভট্টবামন ঠিকই বুঝে ফেলবে কী ঘটেছে। তবু এর ফলে হাতে কিছুটা বাড়তি সময় পাওয়া যাবে, যা নিজেদের প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগবে।

পদ্মনাভের কথা ভাবলে সত্যিই অভিভূত হতে হয় দিব্যোককে। সত্যিকারের একজন মানুষের মতো মানুষ। যে ন্যায়ের জন্য নিজের স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণেও পিছ-পা হতে স্বীকৃত নয়। বরং সে বলে যে এই মাটিকে যারা নিজের জন্মভূমি বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, কেবলমাত্র তারাই তার স্বজাতি। কত শত বৎসর আগে তার পূর্বপুরুষ আর্যাবর্ত থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর মাটিতে। তাদের সবার নিশ্বাসবায়ু একীভূত হয়ে গেছে এই মাটির আদি সন্তানদের নিশ্বাসের সাথে। তাই তারাই তার আত্মার আত্মীয়। যারা এই মাটিতে শত শত বৎসর ধরে বসবাস করেও এই মাটিকে নিজের দেশ বলে মনে করে না, যারা মনে করে যে তারা এই ভূখণ্ডের শাসকমাত্র, যারা নিজেদের দেববংশজাত হিসাবে দাবি করে এই মাটির সন্তানদের অসুর বলে এখনো ঘৃণা করে, যারা মনে করে এই মৃত্তিকার আদি সন্তানদের জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র তাদের সেবা করার জন্য, তাদের প্রতি ধিক্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশে পদ্মনাভ অকুণ্ঠ। বরেন্দির লক্ষ লক্ষ আদিবাসীর মতো সে-ও দিব্যোককে এই যুগের পরিত্রাতা বলে মনে করে। তাই যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, দিব্যোককে সহযোগিতা করতে পদ্মনাভ সবসময়ই প্রস্তুত।

বন্ধু পদ্মনাভের উদ্দেশ্যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে দিব্যোক। তারপর মনে পড়ে, ভট্টবামনের কাছে তো একটি বার্তা প্রেরণ করতে হবে। কী অজুহাত দাঁড় করানো যায়, ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ে কয়েকদিন বাদেই তো বরেন্দির মানুষের প্রিয় তিষ্যা পরব। দুইজন বিশ্বস্ত বার্তাবাহককে ডেকে পাঠায় দিব্যোক। মহারাজ মহীপালের বরাবরে একটি বার্তা প্রেরণ করে। বার্তায় লেখা হয়– মহারাজের আদেশ দিব্যোকের শিরোধার্য। তিষ্যা পরব অতিক্রান্ত হওয়ামাত্রই সে রাজধানীতে উপনীত হবে মহারাজ সমীপে। আর যে অশ্বারোহী দলকে মহারাজ পাঠিয়েছেন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারাও বরেন্দির তিষ্যা পরব দেখার এই দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। বিধায় অন্য বাহকের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠাতে হচ্ছে।

দিব্যোক জানে, এই বার্তা মহারাজের কাছে পৌঁছুবে না। কিন্তু যেখানে পৌঁছানো প্রয়োজন, সেখানে ঠিকই পৌঁছাবে। তার মন বলছে, আর বেশি বিলম্ব নেই। কৈবর্তদের অচিরেই দাঁড়াতে হবে ভট্টবামনচক্রের মুখোমুখি। দুই চোখ বন্ধ করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায় দিব্যোক। মনে মনে বলে– আশীর্বাদ করো পিতা! পিতামহ-প্রপিতামহ আশীর্বাদ করো! তোমাদের বরেন্দিকে আমি যেন তোমাদের সন্তানদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি!

হঠাৎ ধুলো-ওড়ানো একটা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ে ঘরের দরজা-জানালাগুলিতে। বরেন্দি একাত্মতা ঘোষণা করছে কী!

২১. মল্ল-র বিদায়

কত ত্যাগেরই না প্রয়োজন হয় একটা বড় কাজের জন্য! মল্ল নাহয় নিজের মাটির জন্য, স্বজাতির জন্য আত্মত্যাগের পথে নেমেছে। কিন্তু উর্ণাবতী? সে কেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে এই কাজের সঙ্গে? সে কি শুধু মল্লর প্রতি ভালোবাসার কারণে? হায় রে ভালোবাসা! বিনিময়ে কতটুকু ভালোবাসা পাবে বা পায় তার বিন্দুমাত্র পরিমাপও করতে বসেনি উর্ণাবতী। করলে সে দেখতে পেত যে তার দেবার পালা এত ভারি যে প্রাপ্তিকে চোখে প্রায় দেখাই যায় না। প্রাপ্তির হিসাব না করে একপাক্ষিকভাবে দান করে চলেছে উর্ণাবতী। মল্ল বা পপীপ কোনোদিন কি পারবে তার মহত্ত্বময় ভালোবাসার প্রতিদান দিতে? ভাবতে গিয়ে চোখে জল চলে আসে মল্লর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ণাবতী স্নান করতে গিয়েছিল। ভেজা চুল, স্নিগ্ধ অবয়ব এবং পুত-পবিত্র একটা শীতল অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে স্নানাগার থেকে। মনটাও আনন্দময়। কিন্তু বেরিয়ে এসে মল্লর দিকে চোখ পড়ামাত্র থমকে দাঁড়ায়। ঠোঁট থেকে মুহূর্তে উধাও হয়ে আনন্দের হাসি। ছুটে এসে দাঁড়ায় মল্লর পাশে। সমস্ত অবয়ব জুড়ে উদ্বেগ– কী হয়েছে মল্ল? তোমার চোখে জল! বলো মল্ল কী হয়েছে তোমার? আমি কি কোনোভাবে তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

তার দিকে তাকিয়ে চোখে জল নিয়েই হাসে মল্ল। ধরা গলায় বলে– এই জল কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল ঊর্ণাবতী। এই জল ভালোবাসার। ভালোবাসা পাওয়ার। আমি... পপীপ... আমরা কৈবর্তজাতির মানুষরা কীভাবে তোমার ঋণ পরিশোধ করব ঊর্ণাবতী!

ও এই কথা! বুকের পাষাণভার নেমে যাওয়ার স্বস্তি নিয়ে বলে ঊর্ণাবতী– ভালোবাসতে শেখায় যে মানুষ, সেই মল্লর মুখে এ কী ধরনের কথা! ভালোবাসার মানুষের কাছে কেউ কি কোনোদিন ঋণী হয়ে থাকে? প্রেমিক-প্রেমিকা কি কখনো অংক কষে পরস্পরের জন্য কোনো কাজ করে? তারা যা-ই করে, ভালোবাসাই তো সেটা করিয়ে নেয়। আর ঋণের কথাই যদি বলো, তাহলে তোমার ঋণ কি আমি সারাজীবনেও পরিশোধ করতে পারব? এই নোংরা জীবন তো কবেই চিতার আগুনে জ্বলে শেষ হয়ে যেত, আমি নিজের হাতেই এই নোংরা জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দিতাম যদি তোমার ভালোবাসা না পেতাম। এই জীবন তো প্রকৃতপক্ষে তোমারই প্রদত্ত উপহার মল্ল! এই জীবনকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার তো একমাত্র তোমারই রয়েছে।

তবু পপীপের জন্য তুমি যা করলে!

ঠোঁট ফোলায় ঊর্ণাবতী– আমি পপীপের জন্য কিচ্ছু করিনি। যা করেছি তোমার জন্য করেছি। আর তোমার জন্য আমি যা-ই করি না কেন, তার কোনো গাণিতিক নির্ঘণ্ট করে রাখতে সম্মত নই। তুমি নিজে তেমন কোনো কিছু করবে, সেটিও হতে দেব না আমি। কিছুতেই না! কোনোদিনই না! তবে যদি প্রতিদান কিছু দিতে চাও, তাহলে আমাকে কী দিতে হবে তা তো তুমি জানোই!

কী দিতে হবে?

আহা ন্যাকা! কিছুই জানে না! অপূর্ব ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করে ঊর্ণাবতী।

মল্ল তবু জানতে চায়– আহা বলোই না কী দিতে হবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরে ছুটে এসে মল্লর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঊর্ণাবতী। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে– তোমাকে আরও ঘন ঘন আসতে হবে আমার কাছে। আরও বেশিদিন ধরে থাকতে হবে আমার কাছে।

যদি চিরদিনই থেকে যাই তোমার কাছে! তরল কণ্ঠে বলে মল্ল।

মুখটা ম্লান হয়ে যায় ঊর্ণাবতীর– সে কপাল কী আর আমার কোনোদিন হবে!

অবশ্যই হবে! খুব দৃঢ়তার সাথে বলে মল্ল– যদি বরেন্দিকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব ঊর্ণাবতী। চিরদিনের জন্য নিয়ে যাব। বিশ্বাস করো আমার কথা!

তোমাকে বিশ্বাস করব না তো কার কথা বিশ্বাস করব!

এবার একটু পপীপকে ডেকে দাও। ওকে কয়েকটি কথা বলে আমি চলে যাব।

আজকেই?

হ্যাঁ ঊর্ণাবতী। তোমাকে তো বলেছি, দিব্যোক আমাকে যত তাড়াতড়ি সম্ভব বরেন্দিতে যেতে বলেছে। পপীপের একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পারছিলাম না। এখন তো পপীপের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছ তুমি। এবার আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব। বরেন্দিকে মুক্ত করার যুদ্ধে। তোমাকে মুক্ত করার যুদ্ধে।

পপীপকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ণাবতীর কোষ্ঠকের (কোঠাঘর) পেছনের উদ্যানে আসে মল্ল। এদিকে এমনিতেই কোনো লোক সচরাচর আসে না। আর মল্ল এলে ঊর্ণাবতী তার সহচরীদের নিয়ে এমন নিপুণভাবে সবদিকে দৃষ্টি রাখে যে মল্ল-কে বিন্দুমাত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় না। সে পুরো বাড়ি এবং আঙিনা জুড়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে। তদুপরি এখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আঙিনায় দাঁড়ালে কেউ বাইরে থেকে দেখতে পাবে না। ঊর্ণাবতীর সহচরী এসে আসন বিছিয়ে দিয়ে গেল ঘাসের ওপর। কিন্তু বসে না মল্ল। পপীপকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি করে আঙিনা জুড়ে। মনে মনে গুছিয়ে নেয় বলার কথাগুলো। শুরু করে মৃদুস্বরে– পপীপ!

কাকা!

আমি এখন যেসব কথা তোকে বলব, সব কথা তুই বুঝতে পারবি না রে বাপ্। তার দরকারও নাই। তোর মাথা এখনো ছোট্ট। সব কথা তুই মনেও রাখতে পারবি না। মনে রাখারও দরকার নাই বাপ্। যখন দরকার হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখবি ঠিক ঠিক মনে চলে আসছে কথাগুলো। যখন সময় হবে, দেখবি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিস কথাগুলো। বুঝতে পারছিস বটি?

হ্যাঁ কাকা।

হুঁ, এবার তবে একটা প্রশ্নের উত্তর দে দেখি! বল দেখি তুই কেনে মায়ের কোল ছেড়ে এই বিভূঁইতে পড়ে আছিস? আর তোর বাপই বা কেনে নিজের মাটি ছেড়ে এই রামশর্মার মাটিতে খেটে মরতে এসেছে জনমভর?

কেনে কাকা?

কারণ আসলে একটা লয় বাপ। কিন্তু মূল কারণ কিন্তু একটা। একটাই! সেটা হলো মোদের বরেন্দি আর মোদের লিজেদের বরেন্দি নাই। বুঝতে পারছিস?

হ্যাঁ কাকা।

আবার উচ্চারণ করে মল্লু– মোদের বরেন্দি আর মোদের লিজেদের নাই রে সোনা! তাই কৈবর্তের ঘরে ঘরে এত দুঃখ। তাই কৈবর্তের জনম হয়ে গেছে দুঃখের জনম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মল্লু। পপীপ এই সময় হঠাৎ আকুল হয়ে বলে ওঠে– আমি মায়ের কাছে যাব কাকা!

অবশ্যই যাবি বাবা! আমি তোকে তোর মায়ের কাছে নিয়ে যাব। যে কয়দিন যেতে পারছিস না, সেই দিনগুলির জন্যে তোকে তো আরেকটা মা দিয়ে গেলাম। ঊর্ণা মা। ঠিক কি না বল্? ঊর্ণাবতীকে তোর মায়ের মতো লাগে না?

লাগে কাকা। ঊর্ণা মা তো খুবই ভালো।

হ্যাঁ। মনে রাখিস ঊর্ণাবতীও তোর মা। একদিন লিজের মায়ের মতোন এই মায়ের ঋণও তোকে শোধ করতে হবে।

ঋণ শব্দটা শোনামাত্র ভয়ে কুঁকড়ে যায় পপীপ। বলে– আমাকেও কি আবার বিক্রি করে দেবে কাকা?

মল্লু অবাক– কে বিক্রি করবে? কেন বিক্রি করবে?

এই যে তুমি বললে ঋণের কথা! বাবা ঋণ নিয়েঠিল বলেই তো বাবা বিক্রি হলো, আমি বিক্রি হলাম। এখন বলছ ঊর্ণা মায়ের কাছে ঋণের কথা। তাহলে কি আবার আমাকে বিক্রি হতে হবে?

এবার হো হো করে হেসে ওঠে মল্লু– এই ঋণ সেই ঋণ নয় রে পপীপ। এ হলো ভালোবাসার ঋণ। এটি শোধ করতে হয় আরও বেশি ভালোবাসা দিয়ে। ঊর্ণাবতী তোকে যত ভালোবাসা দিয়েছে, তুই তার চেয়ে বেশি ভালেবাসা দিবি তাকে। তাহলেই শোধ হবে তোর ঋণ। বুঝতে পারলি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ দেখে বোঝা যায় পুরোপুরি বুঝতে পারেনি পপীপ। কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে– হ্যাঁ কাকা।

মল্ল আবার বরেন্দির কথায় ফেরে– যে কথা বলছিলাম। মোদের সকল দুঃখের কারণ হচ্ছে

বরেন্দি আর মোদের বরেন্দি লয়। মল্লর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে পপীপ।

ঠিক বলেছিস! মল্ল সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার তাকায় পপীপের দিকে। বলে– এবার আমরা ঠিক করেছি, বরেন্দিকে ফের লিজেদের বরেন্দি বানাব। মোদের বরেন্দিকে আমরা আবার ফিরে নেব।

কিন্তু তার জন্য অনেক কষ্ট করতে হবে পপীপ। তোকে কষ্ট করতে হবে, আমাকে কষ্ট করতে হবে– সবাইকে কষ্ট করতে হবে। আর বলি দিতে হবে। অনেক বলি দিতে হবে। রক্তের বলি। বরেন্দি মায়ের অনেক অপমান হয়েছে। সেই অপমান মুছে ফেলতে হবে মোদের রক্তের বলি দিয়ে। বলির কথা শুনে ভয় পাচ্ছিস পপীপ?

না কাকা!

তাহলে শোন! বরেন্দি মা তোকে বেছে নিয়েছে খুব বড় একটা কর্মের জন্য।

কী কর্ম?

যে কর্মের জন্য ঊর্ণাবতী লিজের মূল্যে তোকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে এখানে এনেছে। আমি তোকে যে কর্মের জন্য রেখে যাচ্ছি ঊর্ণাবতীর কাছে।

পড়া শিখা?

হ্যাঁ পড়া শিখা। এই অক্ষরের মধ্যেই রয়ে গেছে সাদা চামড়ার দস্যুদের সমস্ত শক্তির প্রাণভোমড়া। তোর কাজ হবে সেই প্রাণভোমড়ার কুল-ঠিকানা খুঁজে বের করা। আবার সেই শক্তি কীভাবে কৈবর্তদের পক্ষে ব্যবহার করা যায়, সেই পথও খুঁজে বের করতে হবে।

একটু বিভ্রান্ত দেখায় পপীপকে– কীভাবে আমি পারব কাকা? কীভাবে পারব?

আশ্বস্ত করার হাসি মল্লর মুখে– ঐ যে বললাম। সময় হলে সব বুঝতে পারবি। এখন তোর একমাত্র কাজ হচ্ছে ঊর্ণাবতীর কাছে পড়া শিখা। যত পুঁথি আছে ঊর্ণাবতীর কাছে, সব সে তোকে পড়াবে, কণ্ঠস্থ করাবে। সেগুলো পড়া শেষ হলে মন্দির আর পুরোহিতদের কাছ থেকে এনে দেবে আরও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ। সব তোকে কণ্ঠস্থ করতে হবে পপীপ। আর লিখতেও শিখতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোকে। কৈবর্তরা লিখতে পারে না বলে তাদের পূর্বপুরুষের অনেক জ্ঞান হারিয়ে গেছে। আর আমরা আমাদের কোনো জ্ঞান-সম্পদ হারাতে চাই না।

কীভাবে আমি এত কাজ করব কাকা!

এখন তোর পড়া আর লেখা শিখার কাজ। সেই কাজ করতে থাক মন দিয়ে। বাকি কাজের সময় ওলান ঠাকুর তোকে পথ দেখাবে। বরেন্দি মা তোর পূজা নিলে কোনো কর্মই আর অসম্ভব থাকবে না। মনে রাখিস কথাগুলো। এবার আমি আসি পপীপ!

পপীপ বুভুক্ষুর মতো আবার বলে ওঠে– মায়ের কাছে যাব কাকা!

রহস্যময় হাসি মল্লর ঠোঁটে– মায়ের কাছে তুই লিজেই যেতে পারবি পপীপ। আরও কত শত জনকে তুই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবি তাদের মায়ের কাছে। তখন দেখিস! এবার আমি চলি।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় মল্লর সুঠাম দেহটা। কিন্তু তার উচ্চারণ করা শব্দগুলি বাজতে থাকে পপীপের কানে। বাজতেই থাকে।

২২. রাজায় রাজায়...

মহারাজ মহীপালের আবাল্য অভ্যাস প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই একপাত্র পানা (শরবত) খাওয়া। বিভিন্ন মৌসুমে এই পানার প্রকারভেদ হয়। কোনো মৌসুমে চোচ-পানা (ডাবের জল), কখনো মোচ-পানা (একরকম ফলের রস), কখনো কুলক-পানা (কাঁকুড়ের শরবত), কখনো খর্জুর-পানা (খেজুরের রস), কখনো পরসুক-পানা (দ্রাক্ষারস)। তাঁর অন্তরঙ্গ (ব্যক্তিগত চিকিৎসক) ভানু দত্ত দাবি করেন যে এই পানা পানের কারণেই মহারাজ কোষ্ঠ্যকাঠিণ্য থেকে চিরমুক্ত। আর সেই কারণেই যাবতীয় রাজকীয় কর্মকাণ্ডে তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ভানু দত্তের দাবিকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। কারণ তিনি ভূ-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য চক্রপাণি দত্তের সহোদর ভাই। জনশ্রুতি আছে, চক্রপাণি দত্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যতখানি জানতেন, তার পুরোটাই তিনি দান করেছেন তার অনুজ ভানু দত্তকে। মহারাজ মহীপাল ভানু দত্তের উপদেশ মেনে চলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। কখনো কখনো মহারাজ পরিহাসছলে বলেন– আমি আমার কীসের রাজা! প্রকৃত রাজা তো আমার অন্তরঙ্গ ভানু দত্ত। পাল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় আমার নির্দেশে। কিন্তু আমি পরিচালিত হই ভানু দত্তের নির্দেশে। তাহলে কে আসলে বড়? নিশ্চয়ই ভানু দত্ত। আমি রাজা হলে ভানু দত্ত হচ্ছে রাজাধিরাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা নির্ধারণ করে দেন ভানু দত্ত। তিনি এই খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করেন তার গুরু ও বড় দাদা চক্রপাণি দত্তের শিক্ষার আলোকে। "প্রথমে দুগ্ধ পান করতে হবে। তারপরে ভালো করে সিদ্ধ ঝরঝরে শালি চালের ভাত। তাতে প্রচুর ঘি দিতে হবে। আর পক্ষি-মাংসের সহযোগে খেতে হবে। মাংসের পরিবর্তে নির্দোষ বড় মাছ হলেও চলবে। যেমন মাগুর রুই শোল ইত্যাদি। এসব মাছ ভালো ভাবে সিদ্ধ করে খেলে প্রায় মাংসেরই মতো উপকারী।

পানিফল কেশুর কলা তাল নারিকেল ইত্যাদি এবং অন্য যে সব বলকারী মিষ্ট ফল, যেমন কাঁঠাল খুবই ভালো। কেচুক (কচু), ওল (ওল), তালের মেথি, বাতিঙ্গন (বেগুন), পটল, ডাঁটা, মুগ, মসুর, আখের রস– এইসব নিরামিষ আনাজ প্রশস্ত। রুচির জন্য অল্প-স্বল্প বাস্তুক (বেথো শাক) খাওয়া যাবে।

দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে তৈরি দধিকূর্চিকা এবং ঘোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে প্রস্তুত তক্রকূর্চিকা খাওয়া যাবে। তাবে তা আধা বাটির বেশি নয়।"

মহারাজ এবং তার মহিষীরা ভানু দত্তের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন অক্ষরে অক্ষরে।

তবে তাদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পানা-প্রস্তুতিতে।

মহারাজের জন্য পানা প্রস্তুত করা হয় অতি যত্নে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে প্রধান রাজকীয় পাচক এই পানা তৈরির কাজে মনোনিবেশ করে। অতি সতর্কতার সাথে বাছাই করা হয় ফল বা ডাব। পানা তৈরি শেষ হওয়ার পরে বারবার ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে তা থেকে পৃথক করা হয় সূক্ষ্মতম আঁশটিকেও। তারপর পিতলের পানপাত্রে পানা ঢেলে নিয়ে তাকে রাখা হয় ছিদ্রযুক্ত পাথরের কুলুঙ্গিতে। রাত্রির বাকি অংশজুড়ে সেই পাথরের কুলুঙ্গির মধ্য দিয়ে অবিরাম প্রবাহিত করা হয় শীতল জল। প্রভাতে যখন মহারানী নিজহাতে মহারাজকে পরিবেশন করেন পানা, তখন সেই তাম্র-পানপাত্রের গায়ে স্বেদবিন্দুর মতো জমে থাকে স্ফটিকস্বচ্ছ জলের কণা। এই পানপাত্র মহারাজকে যেন দিন শুরুর শুভাশিস জানায়। মনে করিয়ে দেয় মহান পাল সাম্রাজ্যের অধীনে আরও একটি দিন শুরু করতে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। প্রত্যুষের পাখির কাকলির মধ্যে এই পানা পান করতে খুবই পছন্দ করেন মহারাজ মহীপাল।

কিন্তু আজ সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত শেষের আগেই মহারাজের সবথেকে বিশ্বস্ত খোল (গুপ্তচর) এসে মহারাজের দর্শন প্রার্থনা করেছে। এই অধিকার কেবলমাত্র তার মতো গুটিকয় ব্যক্তিরই রয়েছে। নিশ্চয়ই সে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় মহারাজের গোচরে আনার জন্য রাত্রিব্যাপী অশ্ব ছুটিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছেছে।

সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ! এবং বিপজ্জনকও!

দাক্ষিণাত্যের শক্তিমান রাজা রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীর কুক্ষিগত করার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিয়ে ধেয়ে আসছে পাল সাম্রাজ্যের দিকে। আর হয়তো বড়জোর চারটি দিন। তারপরেই রাজেন্দ্র চোলের পরাক্রান্ত সৈন্যদল পৌঁছে যাবে পাল সাম্রাজ্যের সীমানায় এবং আক্রমণ চালাবে কালবিলম্ব না করে।

অতএব অবিলম্বে সর্বোচ্চ পরিষদের সভা আহ্বান করা হোক!

সংবাদ পাওয়ামাত্র রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেলেন মহামাত্য ভট্টবামন, মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ, এবং মহাপ্রতিহার কীর্তিবর্মা। বোঝা যাচ্ছে তারাও এমন তাৎক্ষণিক সভার উদ্যোগের কারণে কিছুটা তটস্থ।

মহারাজ সবার সামনে তাঁর খোলকে ডাকলেন। নির্দেশ দিলেন যে সংবাদ সে বয়ে এনেছে তা সবার সামনে আরেকবার জানাতে।

খোলের মুখে সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে যেন মুখ থেকে রক্ত সরে গেল পদ্মনাভের।

মহারাজ প্রথমে পদ্মনাভকেই জিজ্ঞেস করেন– তামিল নৃপতি রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাই না?

হ্যাঁ মহারাজ।

কী ছিল সেই চুক্তিতে?

তামিল রাজ্যের চোল-সম্রাটদের সাথে পাল-সম্রাটের প্রথম মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আমাদের মহামহিম দিগ্‌বিজয়ী রাজ-চক্রবর্তী দেব পালের সময়ে। তখন থেকে এই মৈত্রী অটুট ছিল। প্রতি বছর দুই সাম্রাজ্যের মহারাজ পরস্পরের মধ্যে উপঢৌকনাদি বিনিময় করে থাকেন পারস্পরিক মৈত্রীর স্মারক হিসাবে। এই বৎসরও সেই রকম উপহারাদি বিনিময় হয়েছে। সে বিষয়ে মহারাজ জ্ঞাত রয়েছেন।

তাহলে আজ হঠাৎ রাজেন্দ্র চোল সেই মৈত্রীর পরিবর্তে বৈরিতার পদক্ষেপ নিচ্ছেন কেন? আপনার কী মনে হয় মহাসান্ধিবিগ্রহিক? হঠাৎ তিনি কেন যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে চান?

পদ্মনাভ এদিক-ওদিক মাথা নাড়েন– আমার জানা নেই মহারাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ বলেন– আমি খোলের মুখে শুনেছি যে রাজেন্দ্র চোল এই অভিযান পরিচালিত করছেন গঙ্গাজলের অধিকার দাবি করে। এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

পদ্মনাভ বলেন– প্রথম মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের কালে চোল-সম্রাট এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যের প্রায় সকল প্রজা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের নিত্য পূজাকর্মে গঙ্গাজল অপরিহার্য। অথচ তাঁর রাজ্য সীমানায় গঙ্গার কোনো প্রবাহ নাই। সেই কারণে তিনি গৌড়াধিপতিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এমন একটি ব্যবস্থা করতে যাতে তাঁর রাজ্যের সকল পূজামণ্ডপে গঙ্গাজলের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মহারাজ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পদ্মনাভের দিকে। এটুকু শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন– তারপর?

গৌড়াধিপতি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তামিল নৃপতির এই আবেদন বিবেচনা করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, দাক্ষিণাত্য থেকে গঙ্গানদী পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করা হবে। সে পথের প্রস্থ এমন হবে যাতে পাশাপাশি দুইটি গো-শকট নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা তামিল রাজ্যের যে কোনো মানুষ সেই পথে গঙ্গাজল আনা-নেওয়া করতে পারবে। গৌড়াধিপতির কোনো সৈন্য-অমাত্য বা প্রজা এই জল পরিবহনে কোনো বাধা সৃষ্টি করবেন না। তবে পথের সত্ত্ব-সার্বভৌমত্ব থাকবে সম্পূর্ণরূপে গৌড়ের অধীন।

এত সুন্দর একটি ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেন রাজেন্দ্র চোল যুদ্ধ করতে আসছেন এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে?

সকলেই অস্বস্তি বোধ করছেন মহারাজের এই প্রশ্নে। অবশেষে আবার মুখ খুললেন পদ্মনাভই– এতদিন এই ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে প্রতিপালিত হচ্ছিল। কিন্তু গত ছয় মাসাধিক কাল ধরে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

কী সেই জটিলতা?

এতদিন এই পথে জল পরিবহনের জন্য কোনো শুল্ক দিতে হতো না তামিলবাসীদের। কিন্তু ছয় মাস হলো প্রতি গো-শকটের জন্য এক কার্ষাপণ করে শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই আজ তামিল-ভূপতি ক্রোধান্বিত হয়ে সমরসজ্জায় ব্যাপৃত হয়েছেন বলে আমি ধারণা করছি।

আশ্চর্য! মহারাজ রুষ্টকণ্ঠে বললেন– এমন একটি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হলো অথচ আমি কিছুই জানলাম না! আমাকে না জানিয়ে কে এই ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কক্ষে পরিপূর্ণ স্তব্ধতা নেমে এল। কেউ উত্তরটা দিতে চাইছেন না। শেষ পর্যন্ত ভট্টবামন বললেন– এই শুল্ক আরোপ করেছেন গঙ্গাতীরস্থ তিন সামন্তরাজ্যের শাসক। তারা তাদের রাজকোষের আয় বৃদ্ধির জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মহারাজ সক্রোধে স্বভাববিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন– কিন্তু সেটি আমাকে জানানো হলো না কেন? অন্য একটি সাম্রাজ্যের সাথে কোনো সন্ধিচুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করার আগে যে মহারাজের অনুমতি নিতে হবে, সেই রাজকীয় রীতির কথা কি ভুলে গেছে আমাদের সামন্তরাজরা? তারা কেন আমাকে বা সর্বোচ্চ পর্ষদকে জানায় নি? এত দুঃসাহস তারা কোত্থেকে পেল!

ভট্টবামন মৃদুকণ্ঠে বলেন– আমাকে জানিয়েছিলেন তারা।

মহীপাল আশ্চর্য হয়ে গেছেন– আপনাকে জানিয়েছেন তারা, অথচ আপনি আমাকে জানাননি! আপনি নিজেই তাদের এই কাজের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন!

ভট্টবামনের চেহারা টকটকে লাল হয়ে গেছে। তার কপালে ঘাম। মৃদু মৃদু কাঁপছেও শরীরটা।

তার অবস্থা দেখে মহীপাল সামলে নেন নিজেকে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন– আপনি যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রনৈতিক কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। আপনি জেনে-বুঝে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন এমনটি আমি মনে করি না। শুধু যদি জানাতেন যে আপনার এই সিদ্ধান্ত প্রদানের পেছনে যুক্তিটা কী ছিল!

আমতা আমতা করে কিছু বলতে চাইলেন ভট্টবামন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না বলেই থেমে গেলেন।

মহীপাল নাছোড়– বলুন মহামন্ত্রী! আমরা সবাই শুনতে চাই। তাতে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান অন্তত কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে।

আমি মনে করি ঐ মৈত্রীচুক্তিটি আমাদের দিক থেকে শুধু অসম্পূর্ণই নয়, বলা চলে অসম্মানজনকও। কারণ আমাদের ভূমি আমরা তাদের ব্যবহার করতে দিচ্ছি। কিন্তু বিনিময়ে কিছু নিচ্ছি না বা পাচ্ছি না। কিন্তু নিজের সত্ত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রমাণের জন্য স্মারক আকারে হলেও কিছু তারা আমাদের প্রদান করবে নিয়মিত, এটাই রীতি। তাই আমাদের সামন্ত রাজন্যবর্গ যখন তাদের ওপর জলশুল্ক আরওপ করলেন, তখন আমি এই শুল্ক নির্ধারণের বিরোধিতা করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মনাভ আপত্তির সুরে বলেন– কিন্তু এই কর আরোপের বিষয়টি রাজা রাজেন্দ্র চোলকে জানিয়ে এবং তার মতামত নিয়েও তো করা যেতে পারত!

ভট্টবামন অস্বীকার করেন না। বলেন– তা হয়তো করা যেত। তবে আমি চেয়েছিলাম প্রস্তাবটি তাদের দিক থেকেই আসুক। সেই জন্যই পরীক্ষামূলকভাবে এই শুল্কের সূত্রপাত করা হয়েছিল।

পদ্মনাভ বিড়বিড় করে বললেন– তার ফলাফল হিসাবে আজ আমাদের একটা সর্বাত্মক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে!

ভট্টবামনের মুখ অপমানে আরও লাল হয়ে ওঠে। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন– তা যদি হয়েও থাকে, তাহলে মাননীয় মহাসান্ধিবিগ্রহিককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে পরাক্রান্ত পাল সাম্রাজ্য তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যে কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হতে কখনোই পরাঙ্মুখ নয়।

এই পর্যায়ে নিজেই মধ্যস্থতার ভূমিকা নেন মহারাজ মহীপাল– এখন আপনাদের বিবেচনায় আমাদের কী করা কর্তব্য?

পদ্মনাভ বললেন– তামিল-নৃপতির কাছে দূত পাঠিয়ে জানানো হোক যে এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়। আমরা আলোচনায় বসতে পারি। মহারাজ অনুমতি দিলে আমি নিজেই রাজা রাজেন্দ্র চোলের কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারি। তাঁকে জানাতে পারি যে, বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমরা আলোচনার দরজা খোলা রেখেছি। আমাদের যে আলোচনায় বসার পূর্ণ সদিচ্ছা রয়েছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা এই মুহূর্ত থেকে গঙ্গাজলবাহী গো-শকটের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

অসম্ভব! প্রায় চিৎকার করে ওঠেন কীর্তিবর্মা– তা করলে তামিল-নৃপতি ধরে নেবেন যে তার সৈন্যসামন্তের ভয়ে আমরা নতি স্বীকার করেছি। একথা তিনি সগর্বে প্রচার করে বেড়াবেন। এর ফলে অন্য রাজ্যের মানুষের কাছে তো বটেই, পাল সাম্রাজ্যের অধীন সকল মানুষের কাছেও গৌড়াধীপের মস্তক হেঁট হয়ে যাবে।

পদ্মনাভ তবুও চেষ্টা চালিয়ে যান– শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে কখনো কারো মস্তক হেঁট হয় না মহারাজ! যে কোনো যুদ্ধেই লোকক্ষয়, সম্পদক্ষয় ছাড়াও প্রজাদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা। আমরা ইচ্ছা করলেই এই অনাবশ্যক যুদ্ধ এড়াতে পারি। তাতে আমাদের লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতির আশংকা তো দেখি না। তাছাড়া যেহেতু শান্তিচুক্তির প্রথম শর্ত ভঙ্গের বিষয়টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দিক থেকেই শুরু হয়েছে, তাকে পুনর্নবায়নের উদ্যোগ নিতে কোনো দোষ আছে বলে আমি মনে করি না।

কীর্তিবর্মা ব্যঙ্গের স্বরে বলেন– শান্তির কথা বলবে দুর্বলরা। তামিলদের শৌর্য-বীর্য এতটা বাড়ল কবে যে তারা পাল-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে! দিগবিজয়ী রাজ-চক্রবর্তী দেব পাল সেই সময় তার যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রাম দেবার জন্য তামিলদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আমাদের সেই সমস্যা নেই। আমরা কেন যুদ্ধে পিছ-পা হবো?

তাহলে? মহারাজ মহীপাল নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

যুদ্ধযাত্রায় যখন রাজেন্দ্র চোল এগিয়েই এসেছেন, তখন যুদ্ধই হোক। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করার করার পরেই মাত্র আমরা আলোচনার জন্য তাদের আহ্বান করতে পারি। বিজয়ীর ঔদার্য দেখিয়ে তখন হয়তো আমরা জলশুল্ক কমিয়েও দিতে পারি।

পদ্মনাভ বলেন– আমি আবার সবাইকে এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই যে যুদ্ধ করার জন্য রাজা রাজেন্দ্র চোল এগিয়ে এসেছেন বটে, তবে প্রথম সূত্রপাতের জন্য যদি কারো ত্রুটি থেকে থাকে, তা আমাদেরই।

সেক্ষেত্রে রাজেন্দ্র চোল নিজেও তো গৌড়াধিপতির কাছে দূত পাঠিয়ে শুল্কের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন। তা না করে তিনি সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন। এখন তার মুখোমুখি না দাঁড়ালে আমাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে।

মহারাজ মহীপালকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে– তাহলে আপনারা বলছেন যুদ্ধই শ্রেয়?

অবশ্যই মহারাজ! ভট্টবামন এবং কীর্তিবর্মা একসঙ্গে বলে উঠলেন– কেউ আমাদের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে যদি, আমরা তা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কেউ যদি সৈন্যদল নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে আসে, তাহলে তাকে উচিত শিক্ষা না দিলে সে চিরকাল উত্যক্ত করতে থাকবে আমাদের।

পদ্মনাভ কিছু একটা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মহীপাল। এই মুহূর্তে তার মনে-মস্তিষ্কে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নাই। জেগে উঠেছে রাজকীয় অহম। জেগে উঠেছে ক্ষত্রিয় রক্ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন চাইছিলেন না স্বজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে ক্ষত্রিয়-ধর্মের কথা বলে তার রক্তে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এখন মহীপালের রক্তে সেই যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছেন দুই পারিষদ ভট্টবামন এবং কীর্তিবর্মা। মহীপাল ইতোমধ্যেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন যে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তামিল জয় করে সেই রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করছেন। দিকে দিকে পরম শক্তিমান মহারাজ মহীপালের জয়ধ্বনি। তামিল প্রজারা দলে দলে আসছে নতমস্তকে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে। শ্রুতকীর্ত মহারাজ দেবপালের পরে পাল-সম্রাটরা আর কোনো যুদ্ধযাত্রা করেননি। তাই পাল-সাম্রাজ্যের সীমানাও আর বর্ধিত হয়নি কোনো দিকে। আজ যখন সুযোগ দোরগোড়ায় এসেই গেছে, তখন হোক যুদ্ধ। তিনিও পূর্বতন দিগবিজয়ী রাজ-চক্রবর্তী দেবপালের মতো স্বীয় জয়স্কন্ধ্যাবার স্থাপন করবেন রাজেন্দ্র চোলের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্বীয় বাহুবলে জয় করে নিয়ে।

পদ্মনাভের কথা এখন আর মহারাজের কানে ঢুকছেই না। কীর্তিবর্মার মতো তারও মনে হচ্ছে যে পদ্মনাভ মানুষটা নিতান্তই কাপুরুষ। 'শান্তি' 'শান্তি' মন্ত্র জপ করে চলেন। কিন্তু স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে যে শক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন রয়েছে, একথাটি তার মনেই থাকে না। মহারাজ মহীপাল এবার পুরোপুরি উপেক্ষা করেন পদ্মনাভকে। কীর্তিবর্মার দিকে তাকিয়ে বলেন– আপনি অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করুন। রাজধানীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যতগুলি সৈন্য রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সেই কয়েকজনকে রেখে বাকি সকল সৈন্যকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করুন। ঝাঁপিয়ে পড়ুন রাজেন্দ্র চোলের ওপর। তাকে দেখিয়ে দিন যে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পরিণাম কত ভয়ানক! পালসৈন্যদের তরবারি অনেকদিন শত্রুর শোনিত পান থেকে বিরত রয়েছে। সেই কারণে রাজেন্দ্র চোলের মতো একজন ক্ষুদ্র নৃপতি পাল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেয়েছে। আপনি এগিয়ে যান সৈন্যবাহিনী নিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ুন রাজেন্দ্র চোলের ওপর! সপ্তাহান্তেই আমি বিজয়ের সংবাদ শুনতে চাই।

কীর্তিবর্মার দুই চোখ চকচক করছে যুদ্ধের উন্মাদনায়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান মহারাজকে। তার মনে স্বপ্ন। এবার সুযোগ পাওয়া গেছে। মহারাজকে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ তিনি দেখাবেন অবশ্যই।

২৩. ভূমিযাত্রা... যুদ্ধযাত্রা...

দিব্যোকের ঠোঁট নড়ে ওঠে। উচ্চারিত হয় একটিমাত্র শব্দ– চলো!

দিব্যোকের কপালে জ্বলজ্বল করছে ওলান ঠাকুরের থানে দেওয়া বলির রক্ত মাখা বরেন্দির লাল মাটির টীকা। ধান-দূর্বা মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে গেছে গ্রামের মাতৃস্বরূপা রমণীরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁওদেব-গাঁওদেবীর মূর্তিকে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে চলতে শুরু করে দিব্যোক। তার ঠিক পেছনে মল্ল। বাকি সঙ্গীরা তার একধাপ পেছনে। তারা গাঁয়ের সীমানায় এসে পৌঁছুতেই আবার উলুধ্বনি করে মহিলারা।

এবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে দলটি।

গ্রাম পেরিয়ে এসে একবার পেছনে ফিরে তাকায় দিব্যোক। তার পেছনে সক্ষম কৈবর্তপুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে। শিকার পরবের সাজ তাদের। আজ তারা বনে পশু শিকারে যাচ্ছে না। আজ তাদের এই যাত্রা নিজেদের ভূমি আর নিজেদের জীবনকে ফিরিয়ে আনার যাত্রা।

দিব্যোক উঠে দাঁড়ায় কাছের টিলার মাথায়। চিৎকার করে বলে– আমরা মোদের বরেন্দিকে ফিরিয়ে আনব! লয়তো সবাই ওলান ঠাকুরের নামে মরব!

অস্ত্র উঁচিয়ে সঙ্গীরা চিৎকার করে প্রতিধ্বনি তোলে– আমরা মোদের বরেন্দিকে ফিরিয়ে আনব! লয়তো ওলান ঠাকুরের নামে মরব!

দিব্যোক আবার বলে– যারা বরেন্দির নামে মরতে ভয় পায় তারা ফিরে যাক!

কথাটা বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দিব্যোক। তাকিয়ে থাকে সমবেত কৈবর্তদের দিকে। কিন্তু কেউ তার জায়গা ছেড়ে নড়ে না। সে তখন জোরে চিৎকার করে– আমরা সবাই মোদের বরেন্দির জন্যে জীবন দিব!

সমস্বরে প্রত্যুত্তর আসে– হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জীবন দিব!

টিলা থেকে নেমে ফের হাঁটতে শুরু করে দিব্যোক।

কিছুক্ষণ এগিয়ে আবার পেছনে ফিরে তাকায়। প্রায় নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে হাজার হাজার কৈবর্ত। একজনও ফিরে যায়নি।

আনন্দিত এবং গর্বিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের হাঁটতে থাকে সে। পরবর্তী গ্রামের মুখেও দঁড়িয়ে আছে শত শত মানুষ। তারা মাথা নিচু করে অভিনন্দন জানায় দিব্যোককে। তারপর দিব্যোকের পেছনে হাঁটতে থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিজেরাও হাঁটতে থাকে।

প্রত্যেক কৈবর্তগ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছামাত্র একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। দলে দলে মানুষ যোগ দিচ্ছে দিব্যোকের রাজধানীমুখী পদযাত্রায়।

এইভাবে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে মানুষগুলোর সমষ্টি রূপ নেয় জনসমুদ্রে। গর্জন নেই। কিন্তু ফুঁসছে সেই সমুদ্র। সেই ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ বুকে নিয়ে রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছে জনসমুদ্র।

কোনো যোদ্ধাদল যুদ্ধযাত্রাকালে সঙ্গে থাকে পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয়, থাকে বৈদ্য-চিকিৎসক, থাকে শুশ্রূষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট করা থাকে দিনশেষে আশ্রয় বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্রাম নেবার জায়গা। থাকে অস্থায়ী শিবিরের (তাঁবু) ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।

কিন্তু কৈবর্তদের সঙ্গে তেমন কিচ্ছু নেই। তারা সারাদিন পথ চলে। যেখানেই রাত সেখানেই তাদের নিদ্রার স্থান। পথ চলতে চলতেই তাদের কেউ কেউ বনে ঢুকে শিকার করে আনে। কেউ কেউ চলতে চলতে পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে নেয় খাওয়ার মতো কোনো কন্দ বা মূল। আর জলাশয় দেখলেই সেখান থেকে আঁজলা ভরে খেয়ে নেয় জল। দিব্যোকের জন্যও একই ব্যবস্থা। তাকেও রাত নামলে শুতে হয় মাটি-ঘাসের শয্যাতেই। জল খেতে হলে তাকেও নামতে হয় জলাশয়ে। শুধু মল্ল এবং কয়েকজন সঙ্গী তাকে শিকারের জন্য বনে ঢুকতে দেয় না। তারা নিজেরা পালাক্রমে শিকার করে আনে। সেই খাবারের অংশ দেয় দিব্যোককে। দিব্যোক অনুযোগ করলে তারা হেসে বলে, যেহেতু অনেকদিন তার শিকারের অভ্যেস নেই, তাই সে বনে ঢুকলে তার আহত হবার কিছু না কিছু আশংকা আছেই। আর দিব্যোক আহত হলে তাদেরকেই তখন তার ভারি শরীরটা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার চাইতে তাকে শিকারের অংশ দেওয়াটা অনেক কম পরিশ্রমের। বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়েছে মল্লরা। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে দিব্যোকও। এবং মেনে নিয়েছে তাদের যুক্তি।

দিব্যোক এমনকি এটাও জানে না তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে কতজন কৈবর্ত পদযাত্রী। মল্ল একবার বলেছিল সংখ্যাটি নিরুপণ করে নেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সংখ্যা, প্রতিদিন যোগ দিচ্ছে নতুন নতুন পথসঙ্গী, তাই সেই কাজটিও ফেলে রাখাই হয়েছে। সে মনে মনে ভেবে রেখেছে রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছে কোনো বড় প্রান্তরে সবাইকে একত্রিত করে লোক গণনার কাজটি সেরে নেবে।

এগারো দিনের দিন তাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা রাজধানীতে। তারা বরেন্দি থেকে যাত্রা শুরুর কয়েকদিন পূর্বে দিব্যোক উত্তর দিকে পাঠিয়েছে উগ্রকে। দক্ষিণ দিকে ছোটভাই রুদোককে। পশ্চিমে গেছে তার বাল্যবন্ধু বুধিয়া। দিনুয়া গেছে পূর্বদিকে। ওরা ঐসব অঞ্চলের কৈবর্তদের তো বটেই, কোল-ভিল-রাজবংশীদেরও আহ্বান জানাবে এই যাত্রায় যোগ দেবার জন্য। দিব্যোক নিজের সঙ্গীদের নিয়ে চলেছে সোজা রাজধানীর পথ ধরে। তবে পথের পাশে যেখানেই কোনো আদিবাসী গ্রাম পড়ছে, সেখানেই দিব্যোক তাদের মোড়লকে অনুরোধ জানাচ্ছে সঙ্গী হতে। অনেকেই যোগ দিচ্ছে এই পদযাত্রায়। রাজধানীর প্রধান প্রবেশদ্বারের বাইরে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা উগ্র, রুদোক, বুধিয়া এবং দিনুয়ার। গতির অংক কষে দিব্যোক বলেছিল রাজধানীর প্রবেশদ্বারে মিলিত হবে তারা তাদের যাত্রা শুরুর দশম দিনে। তাই দিব্যোক শুধু একটি বিষয়ে কড়া লক্ষ রাখে। যাতে তাদের পথচলার গতি কম-বেশি না হয়ে যায়।

তাদের পরিকল্পনা করা আছে সবকিছু।

রাজধানীতে পৌঁছে তারা অবস্থান নেবে চার সিংহদ্বারের বাইরে। সেখান থেকে দিব্যোক লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা করবে মহারাজের দর্শন। মহারাজ যদি তাদের দুই-চারদিন অপেক্ষাও করিয়ে রাখেন, তাতেও আপত্তি থাকবে না তাদের। মহারাজ অনুমতি দিলে দিব্যোকসহ পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল যাবে তাঁর প্রাসাদে। তারা বিস্তারিত জানাবে কৈবর্ত এবং অন্যান্য ভূমিপুত্র প্রজাদের ওপর কী নিপীড়ন চালাচ্ছে রাজপুরুষরা, হিন্দু পুরোহিতরা, বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষরা। তারা বিস্তারিত জানাবে কীভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছে এই বরেন্দির ভূমিপুত্ররা। কোন কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় এই নিপীড়ন চলছে, সেগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানানো হবে মহারাজকে। রাজ্যের কোন কোন রীতি ও বিধানের কারণে ভূমিপুত্রদের সাথে মানবেতর আচরণ করতে অন্যরা সক্ষম হচ্ছে সেকথাও জানানো হবে মহারাজ মহীপালকে। দিব্যোকের দৃঢ় বিশ্বাস, সব কথা মহারাজের গোচরে আনতে পারলে মহারাজ অবশ্যই তার প্রতিবিধান করবেন।

পদযাত্রার পুরো এগারোটি দিন অন্তরে এই আশা পোষণ করেই প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়েছে দিব্যোক। নির্দিষ্ট দিনেই তারা সবাই মিলিত হলো একত্রে। নগর তোরণের বাইরের প্রান্তরে এসে দাঁড়াল হাজার হাজার কৈবর্ত। তারা তাকিয়ে রয়েছে তাদের নেতা দিব্যোকের দিকে।

দিব্যোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মল্ল, উগ্র, ভল্ল। তার সামনে নগর তোরণের প্রহরীরা ভীত বিহ্বল, কিন্তু তীব্র বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কৈবর্ত সমাবেশের দিকে। সাধারণ নিয়েমে দিনের বেলা নগর তোরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকার কথা। কিন্তু আজ দেখা গেল তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত নয়। মল্ল মৃদুস্বরে দিব্যোককে জানাল যে রাজেন্দ্র চোলের বিরুদ্ধে যেদিন যুদ্ধযাত্রায় গেছে পাল সৈন্যরা, সেদিন থেকেই নগর তোরণে লোক চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। আর কৈবর্তদের পদযাত্রা এবং তাদের একেবারে নগরের সন্নিকটে চলে আসার সংবাদ পাওয়ার পরে গতকাল থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লোক চলাচল। একটু শুধু খুলে রাখা হয়েছে তোরণ। তবে প্রহরীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত। মুহূর্তের সংকেতে তারা বন্ধ করে দিতে পারবে পাহাড়ের মতো অটল রাজধানীর এই প্রবেশদ্বার।

দিব্যোক চুপচাপ শুনল মল্লর কথাগুলো। ইশারায় মল্ল এবং উগ্রকে সেখানেই থাকতে বলে নিজে এগিয়ে গেল তিনটি ধাপ। তারপর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুলল নগর তোরণের প্রহরীদের উদ্দেশ্যে। সেই হাত তোলার ভঙ্গিতে অভয়-মুদ্রা। প্রহরীদের কোনো ভাবান্তর নেই। এবার নিজের লোকদের দিকে ফিরল দিব্যোক। কণ্ঠ সর্বোচ্চে তুলে সবাইকে মনে করিয়ে দিল, কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না ঘটায়। সবাইকে মনে রাখতে হবে যে এখানে তারা কোনো অরাজকতা সৃষ্টি করতে আসেনি। তারা এসেছে মহারাজের কাছে নিজেদের কষ্টের কথা বলতে। তারা সবাই বিশ্বাস করে যে মহারাজের কাছে তার কৈবর্ত প্রজাদের দুঃখের কথা জানালে তিনি অবশ্যই তার প্রতিবিধান করবেন। কৈবর্তরা সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে এখানে অপেক্ষা করে। দিব্যোক তার চার সঙ্গীকে নিয়ে যাবে মহারাজের কাছে।

কৈবর্তরা দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল। দিব্যোক চার সঙ্গীসহ এগিয়ে গেল তোরণের দিকে। তাকে এগুতে দেখে তোরণ প্রহরীদের সেনাধ্যক্ষ এগিয়ে এল তাদের দিকে। দিব্যোক নিজে এই সাম্রাজ্যের একজন প্রাদেশিক অমাত্য। তার রাজকীয় পদমর্যাদা অনেক ওপরে। তাই তাকে অভিবাদন জানাল সেনাধ্যক্ষ। দিব্যোক মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। কিন্তু সেনাধ্যক্ষের মুখে হাসি নেই। দিব্যোক তাকে জানাল কেন তারা রাজধানীতে এসেছে। এবং এখন তারা কী করতে চায়।

প্রহরীদের সেনাধ্যক্ষ জানাল, তোরণ দিয়ে লোক চলাচল গতকাল থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দিব্যোক নিজে চাইলে এই মুহূর্তে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। তার মতো পদমর্যাদার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। তবে তিনি যদি সঙ্গীদের নিয়ে নগরে প্রবেশ করতে চান, তাহলে বর্তমানের ভারপ্রাপ্ত নগরপালের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

তার কথায় যুক্তি আছে। দিব্যোক সম্মত হয়। বলে– আমরা অপেক্ষা করছি। আপনি নগরপালের কাছে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জেনে নিন।

সেনাধ্যক্ষ আবার অভিবাদন জানায় দিব্যোককে। বলে– আপনারা বিশ্রাম করুন। জল পান করে পথশ্রম দূর করুন। আমি লোক পাঠাচ্ছি।

লোকটাকে ভালো লাগে দিব্যোকের। কর্মনিপুণ মানুষ। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। আবার রাজকীয় রীতি অনুযায়ী কাকে কীভাবে সম্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাতে হবে সেটাও বোঝে। সেনাধ্যক্ষ আবার আহ্বান জানায় তাকে। দিব্যোককে নিয়ে যেতে চায় তার নিজ দাপ্তরিক প্রকোষ্ঠে। কিন্তু শুধুমাত্র দিব্যোককেই। অন্য কাউকে সে সঙ্গে নিতে সম্মত নয়। দিব্যোক মৃদু হেসে বলে– আপনার সৌজন্য এবং আমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আমার লোকদের ফেলে একা একা আপনার কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারি না। আমি আমার লোকদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। আপনি আপনার কাজ করুন।

সেনাধ্যক্ষ তবু অনুরোধ জানায়– আপনি দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত। আপনি ভেতরে আসুন। এখানে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে একজন প্রাদেশিক অমাত্য রোদের মধ্যে অপেক্ষা করবেন, তা কী করে হয়?

আবার মৃদু হাসে দিব্যোক– আপনি তা নিয়ে ভাববেন না। আলাদা একটি প্রকোষ্ঠে বসে একাকী অপেক্ষা করার চাইতে আমি আমার স্বজনদের মধ্যেই বেশি ভালো থাকব।

আপনার যা অভিরুচি। আর জোড়াজুড়ি করে না সেনাধ্যক্ষ। সে ফিরে যেতে যেতে বলে– আমি এখনই একজন অশ্বারোহী সংবাদ বাহককে পাঠাচ্ছি নগরপালের কাছে।

কিছুটা স্বস্তি নিয়ে সঙ্গীদেরসহ কৈবর্ত সমাবেশে ফিলে এল দিব্যোক। একটি ধাপ অন্তত পার হওয়া গেছে। যে কাজের উদ্দেশ্যে তাদের এখানে আগমন, সেই কাজটি অন্তত শুরুর প্রক্রিয়ায় পা রেখেছে। রাজকীয় কাজে কিছু জটিলতা ও সময়ক্ষেপণের ব্যাপার থাকেই। নগরপাল নিশ্চয়ই একা একা এই সিদ্ধান্ত প্রদানের সাহস পাবে না। সে ছুটবে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে। সেখান থেকে হয়তো প্রাসাদে পৌঁছুবে বার্তাটি। সেখানে কিছুটা বিলম্ব হবে। বিশেষ করে ভট্টবামনের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত মহারাজের কাছে পৌঁছুবে না তাদের বিষয়টি। অন্য সময় হলে হয়তো ভট্টবামনের হাতেই মাসের মাস মাস ঝুলে থাকত বিষয়টি। হয়তো ভট্টবামন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সুযোগই দিতেন না দিব্যোক তথা কৈবর্তদেল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। দিব্যোক মনে মনে ভাবে, পরিস্থিতি যে ভিন্ন তা নিশ্চয়ই ভট্টামনও বুঝতে পারছেন। তাই মনে মনে আশাবাদী হয়ে ওঠে দিব্যোক। এই যুদ্ধকালীন সময়ে এক বিরাট সংখ্যক প্রজার মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, এমন কোনো কাজ করবেন না ভট্টবামন। নিশ্চয়ই তারা মহারাজের সাক্ষাত লাভের সুযোগ পাবে। কৈবর্তদের অনেক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া যাবে। আর যেগুলি সময়সাপেক্ষ, সেইসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস নিয়ে বরেন্দিতে ফিরে যেতে পারেবে কৈবর্তরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পরিণতি হয়ে গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে আগেই কৈবর্তদের এই রাজধানীযাত্রার কথা পৌঁছে গেছে মহারাজ এবং মহামন্ত্রীর কানে। অন্যান্য সময়ের মতো আরও একবার ভট্টবামনের ভুল মন্ত্রণায় ভুল পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়ে অপেক্ষা করছেন মহারাজ মহীপাল।

দিব্যোক তার চার সঙ্গীকে নিয়ে তখনো কৈবর্ত সমাবেশের কাছে ফৌঁছুতেই পারেনি, এমন সময় পেছনে ঘর ঘর শব্দ তুলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল নগর তোরণ।

এটা কী হলো! সঙ্গীদের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দিব্যোক। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। জানলে তো বলবে!

তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সমাবেশের দিকে এগিয়ে চলে।

তারা প্রান্তরে পৌঁছপনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কৈবর্ত সমাবেশের দিকে বৃষ্টির মতো ধেয়ে এল শত শত তীর। নগরীর সিংহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে নগরপ্রাকারে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ছে ধনুর্ধররা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুকে গাঁথা বিষাক্ত তীর নিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন কৈবর্ত যুবক। হতবিহ্বল দিব্যোককে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে শুইয়ে দিল মল্ল। কয়েকজন ছুটে এসে দিব্যোককে ঘিরে তৈরি করল মানব-ঢাল।

তার কিছুক্ষণ পরেই কোনোকিছুই আর দিব্যোকের নিয়ন্ত্রণে রইল না। মল্ল, রুদোক, উগ্র, পরভুর নেতৃত্বে কৈবর্তযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পালসেনাদের ওপর। আর দিব্যোক এতক্ষণে খেয়াল করে যে তার সঙ্গীরাও যুদ্ধের জন্য মোটামুটি তৈরি হয়েই এসেছে। এমনকি তাদের একটি পরিকল্পনাও তৈরি করা রয়েছে। বিস্মিত দিব্যোক দেখতে পায়, তার সঙ্গীরাও তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা শরবর্ষণ শুরু করেছে। আগে অনেকবার অনুশীলন করা হয়েছে এমন ভঙ্গিতে নিচু হয়ে একদল কৈবর্তযোদ্ধা তোরণের দুই পাশের দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে লোহার আংটা পড়ানো দড়ি হাতে। সে বুঝে ফেলে, ওরা যাচ্ছে পেছনের দেয়াল পেরিয়ে নগরে ঢোকার অভিসন্ধি নিয়ে। কিন্তু পুরো প্রাকার জুড়ে মহীপালের সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা তীর ছুঁড়ছে অবিরাম। দেয়ালের কাছে পৌঁছানোর আগেই তো মারা পড়বে তারা। কিন্তু সে ব্যবস্থাও করা রয়েছে। দেয়ালরক্ষক পালসেনাদের ওপর কৈবর্তরা এত মুষলধারায় তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে যে ওরা দেয়ালের ওপর বেশিক্ষণ টিকতেই পারল না। তৎক্ষণাৎ শত শত আংটা লাগানো দড়ি আছড়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে। পাহাড়ি ছাগলের মতো কৈবর্তরা তর তর করে দেয়ালে উঠে পড়ল দড়ি বেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে যুদ্ধ শেষ হতে বেশি সময় লাগল না আদৌ।

মহারাজের পুরো সেনাদল রাজেন্দ্র চোলের সাথে গঙ্গাতীরে যুদ্ধে ব্যস্ত। রাজধানীতে রয়ে যাওয়া সামান্য কয়েক শত সৈন্য বেশিক্ষণ টিকতে পারল না কৈবর্তদের সামনে। দেয়াল পেরিয়ে যে কৈবর্তযোদ্ধারা ঢুকে পড়েছিল নগরের মধ্যে, তারা দ্বররক্ষকদের হত্যা করে সিংহদ্বার হাট করে খুলে দেওয়ামাত্র হাজার হাজার কৈবর্ত স্রোতের মতো ধেয়ে গেল নগরমধ্যে। শত শত বৎসরের নিপীড়ন-লাঞ্ছনা-শোষণ-অমানবিক আচরণের শিকার হওয়া, এবং সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা-অপমান ঘৃণা হয়ে জমে আছে কৈবর্তদের বুকে। আজ সেই ঘৃণা নিজেকে উন্মুক্ত করার পথ পেয়েছে। তাকে আজ রুখবে কে!

কচুকাটা হয়ে গেল গৌড়ের সেনাদল। মত্ত হাতির পায়ের চাপে পিষ্ট হলে যেমন পরিণতি হয়, সেই ভাবে বিধ্বস্থ হয়ে গেল পাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী। লুণ্ঠনে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারাল শত শত নগরবাসী। যারা পারল পালিয়ে বাঁচল। রাজপ্রাসাদ বিধ্বস্থ হলো সম্পূর্ণরূপে। আর কার যেন বল্লম ফুঁড়ে ফেলল মহারাজ মহীপালের বুক।

বিধ্বস্ত নগরজুড়ে কৈবর্তরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জয়ধ্বনি উঠছে দিব্যোকের নামে। তারা ফিরে পেয়েছে তাদের বরেন্দিকে। সাথে পুণ্ড্রও। ওলান ঠাকুর দিব্যোকের বেশে জন্ম নিয়ে এই মাটির সন্তানদের মুক্ত করেছে শত শত বৎসরের দাসত্ব থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব-২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথারম্ভের সূত্র:

বরেন্দির ভূমিপুত্ররা বুকের রক্ত ঢেলে শত শত বছরের সংগ্রামের পরে নিজেদের মাটিকে মুক্ত করেছে দিব্যোকের নেতৃত্বে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই একবারই কোনো ভূখণ্ডের কৃষক-ভূমিপুত্ররা অর্জন করেছিল নিজেরাই নিজেদের জীবন নিজেদের মতো পরিচালনা করার অধিকার।

কিন্তু উদারতাই তো এই মাটির সন্তানদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সেই উদারতার সুযোগ নিয়ে রক্ষীদের যোগসাজসে পালিয়ে গেছে রামপাল। সঙ্গে নিয়ে গেছে রাজকোষের সমস্ত অর্থ আর ধনরত্ন। পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্ঠাংশ মগধ অঞ্চলে বসে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে রামপাল। গৌড়-বরেন্দ্রী-পুণ্ড্রবর্ধন মুক্ত হওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিনের যুদ্ধবিজয়ের উন্মাদনার পরেই শক্তহাতে কৈবর্তযোদ্ধাদের রাশ টেনে ধরেছে দিব্যোক। কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি পালরাজার মহিষীদের, তাদের অমাত্যদের, তাদের অনুরাগীদের। বরং যখন রাজমহিষী এবং অমাত্যমহিষীরা অনুমতি চেয়েছে রাজ্য ত্যাগ করার, তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে সসম্মানে রাজ্য ত্যাগের অনুমতি দিয়েছে দিব্যোক। তারা চলে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন নিজেদের অলংকার, স্বর্ণতৈজস, স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা। একবারও দিব্যোক বলেনি, এইসব স্বর্ণসম্পদ তো এই ভূমির মানুষদের রক্ত-ঘাম এবং জীবনপাত করে ফলানো ফসলেরই রূপান্তর। তার এই উদারতাকে রাষ্ট্রনৈতিক ভুল বলে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে বন্ধু পদ্মনাভ। কিন্তু দিব্যোক কর্ণপাতই করেনি তার কথায়। সে বলেছে বরেন্দির ভূমিপুত্রদের কাছে রাষ্ট্রনীতির চেয়ে মানবনীতি অনেক বড়। ঐসব স্বর্ণালঙ্কার এবং তৈজসের সাথে অধিকারিণী নারীদের অনেক আবেগ জড়িত। সেইসব আবেগসঞ্চারী বস্তু থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা অন্যায়। আর বরেন্দির সাধারণ মানুষের তো ঐসব প্রয়োজন নেই। তারা তাদের মাতৃভূমিকে নিজেদের মতো করে ফিরে পেয়েছে। তারা আবার নির্বিঘ্নে ভূমির সাথে চাষাবাদে সম্পৃক্ত হতে পারবে। তাদের ঘামে-শ্রমে তুষ্ট হয়ে ভূমিদেবী তাদের আঙিনা ভরে দেবেন ফসলের সুগন্ধে। তাদের জলদেবী নদীগুলিতে দেবেন মৎসসম্পদের সমারোহ। তাদের বনভূমি ভরে উঠবে শিকারের পশুতে। তাদের আর কী চাই! তারা কেন অন্যের সঞ্চিত সম্পদের দিকে তাকাবে লোভাতুর দৃষ্টিতে।

এই যুক্তি মেনে নিয়েও পদ্মনাভ বলেছেন, সব সম্পদ নিয়ে অভিজাত মহিষীদের চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই সম্পদ একদিন-না-একদিন ব্যবহৃত হবে কৈবর্তদের বিপক্ষেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মনাভের অনুমান সঠিক। রাজমহিষী এবং অমাত্যমহিষীরা তাদের সমস্ত সম্পদ এনে তুলে দিয়েছে রামপালের হাতে। এইসব সম্পদের সাথে রাজকোষ থেকে চুরি করে আনা সম্পদ মিলিত হয়ে রামপালের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। এখন লক্ষ সৈন্যের দল গঠনে রামপালের কোনো অর্থাভাব নেই। সৈন্যদলের জন্য অস্ত্র, অশ্ব, বর্ম, সাজপোশাক কিনতে রামপালের অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হয় না।

বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর কি কখনো সেই স্থান ত্যাগ করতে চায়? পালরাজা রামপালও বরেন্দিকে ঘিরে হায়েনার মতো সুযোগ খুঁজে চলেছে আক্রমণ শানানোর। দিব্যোকের পরিচালনা আর কৈবর্তদের বীরত্ব বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে তাকে।

দিব্যোকের পরে রুদোক। তারপরে ভীম।

ভীমের মতো এমন নৃপতি-নেতা আর কী কখনো জন্মাবে বাংলা-বরেন্দির মাটিতে!

কিন্তু এবার যে মরণ-কামড় দিতে মরিয়া রামপাল! তার সাথে আরও কত রাজ-রাজন্য! তাদের প্রশিক্ষিত সৈন্যদল! রথী-অশ্বারোহী-পদাতিক লক্ষাধিক! তার সাথে হস্তীযুথ! অঙ্গদেশাধিপতি মথন দেব, মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব, রাজা কাহ্নুর দেব, রাজা সুবর্ণ দেব, পীঠীর রাজা দেবরক্ষিত, মগধের অধিপতি ভীমযশাঃ, কোটাটবীর রাজা বীরগুণ, উৎকলরাজ জয়সিংহ, দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের মহারাজা লক্ষ্মীশূর, তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশিখর, কুজবটীর শূরপাল, উচ্ছালের রাজা ময়গলসীহ, ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসীহ, কজঙ্গলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ আর কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্ধন– এই আঠারো সামন্ত-মহাসামন্তের সাথে রামপালের মিলিত বাহিনী যায় বরেন্দি অভিযানে ভীমের বিরুদ্ধে। তাদের আর্যরক্ত মেনে নিতে পারে না ভূমিপুত্রদের কাছে বারংবার পরাজয়। আর তাদের হয়ে বীরগাথা রচনা করে চলে কবিশ্রেষ্ঠ সন্ধ্যাকর নন্দী। তার কাব্যে আগ্রাসী পালরাজাই সঠিক, আর ভূমিপুত্র কৈবর্তরা ধিকৃত। এইভাবে বিকৃত হয়ে যাবে ইতিহাস। কেউ জানবে না ভূমিপুত্ররা যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাই ন্যায়যুদ্ধ। বরেন্দির মাটি ছুঁয়ে বয়ে চলে যে বাতাস, আর ভূমিপুত্র কৈবর্তদের রক্তে পুষ্টির আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে যায় যে বাতাস, তারা এক এবং অভিন্ন।

কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস বিকৃত হবে।

কারণ ইতিহাসের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দীদের মতো মানুষ, যারা আগ্রাসী পালরাজা আর সহযোগী আঠারো সামন্তের অন্নভোগী।

তাহলে কোনোদিন ভূমিপুত্রদের উত্তরাধিকারী কেউ কি কোনোদিন জানবে না তাদের পিতৃপুরুষের গৌরবের ইতিহাস?

জানবে।

সেই জন্যই তো দাসজন্মের শৃঙ্খল দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে মাতৃভূমিতে ফিরে আসছে কৈবর্ত-কবি পপীপ। সেই জন্যই তো পুঁথি, ভূর্জপত্র, খাগের কলম আর ভূষামাটি-লাক্ষার কালি ফেলে কবি পপীপ চলে যুদ্ধযাত্রায়।

০১. জন্মমাটির বুকে আবার

মাটি কী তাকে আর চিনতে পারছে না!

আর কত হাঁটবে সে! সে তো হেঁটেই চলেছে অবিরাম। গত কয়েকটি দিন একনাগাড়ে হাঁটছে সে। কিন্তু যেখানে পৌঁছুলে তার মন বলে দেবে আর কোনো ভয় নেই, সে এখন পৌঁছে গেছে তার নিজের মাটির নিরাপদ আশ্রয়ে, মনে হচ্ছে, সেখানে পৌঁছুতে তার এখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি। বাধ্য হয়ে সে পথের দূরত্ব আর দিন গণনা করা ছেড়ে দিয়েছে। তাই কতদিন ধরে হাঁটছে এখন আর সেই দণ্ডগণনা-প্রহরগণনা তার মনে নেই।

পিতা বট্যপ তাকে পালাতে বলেছিল। পলায়ন মানেই সবসময় হার স্বীকার করা নয়। কখনো কখনো পলায়ন অন্য রকম তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। তার এই পলায়ন মানে মুক্তি। কোথায় যাবে সে? কোনদিকে যাবে সে পালিয়ে? কোনো পথই তো সে চেনে না। ঊর্ণাবতীর কাছে তিন বছর ছিল সে। তারপর রামশর্মা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে নিজের ইক্ষু সাম্রাজ্যে। যে লিখিত দানপত্র ছিল ঊর্ণাবতীর কাছে, সেটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। ঊর্ণাবতীর কোনো দাবিই তাই শেষ পর্যন্ত আর টেকেনি। তাছাড়া মল্ল সংবাদ পাঠিয়েছিল ঊর্ণাবতীর কাছে। লোক পাঠিয়েছিল, যাদের সঙ্গে ঊর্ণাবতী পালিয়ে চলে যেতে পারবে তার বাঞ্ছিত পুরুষের কাছে। দেবদাসীর কলুষময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে সে চাইছিল তার প্রেমিকের কাছে চলে যেতে মুক্ত জীবনের দিকে। তাই সে পপীপকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছে। নিজে সে মল্লর কাছে যেতে চায়। পপীপকে ফেলে যেতে মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়নি। কিন্তু মল্ল যাদের পাঠিয়েছিল ঊর্ণাবতীকে বরেন্দিতে নিয়ে যাবার জন্য, তারা সম্মত হয়নি পপীপকে সঙ্গে নিতে। কারণ তারা যে পরিকল্পনা করে এসেছে, সেই পরিকল্পনায় সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সেটা নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা। তাদের পথ-পরিকল্পনায় পপীপের কোনো স্থান নেই। তাই পপীপকে ফিরে যেতে হয়েছিল রামশর্মার ইক্ষু-সাম্রাজ্যে। পপীপের মনে হয়েছিল তার আর শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এবার সেখানে এসে সে পেল বাসুবুড়োকে। বাসুবুড়ো হলো তার বাসুখুড়ো। মল্লকাকা যা কিছু শেখানো বাকি রেখে গিয়েছিল, তা সে শিখেছিল বাসুখুড়োর কাছে। বাসুখুড়ো খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছিল তখনই। কিন্তু তার ছিল জীবনব্যাপী সংগ্রাম আর সাধনার নির্যাস। সেই নির্যাস সে দিয়েছে পপীপের হাতে তুলে। তাই গুরু বলতে পপীপ আজ মল্লকাকাকে ভাবে না, গুরুমা বলতে ঊর্ণাবতীকেও ভাবে না, তার কাছে গুরু এখন বাসুখুড়ো। ঊর্ণাবতীর কাছ থেকে চলে আসার পরে আর ইক্ষু-উদ্যানের সীমানার বাইরে পা রাখার তেমন সুযোগ পায়নি পপীপ। তাদের প্রভু রামশর্মার বিশাল দিগন্তছোঁয়া ইক্ষুক্ষেতের চৌহদ্দির বাহিরে তার পা পড়েছে কেবলমাত্র কামরূপের বীথিগুলিতে। সাপ্তাহিক হট্টদিনগুলিতে (হাটের দিনে) সেখানে ভিনদেশী সার্থবাহ আর শ্রেষ্ঠীরা আসে ইক্ষু কিনতে। কখনো কাঁধে বোঝা নিয়ে, কখনো মোষের গাড়িতে সেই বিথীগুলিতে ইক্ষু পৌঁছে দেওয়া, দেশী-বিদেশী মানুষ দেখা, নানা রকম পণ্যসামগ্রীর দিকে অর্থহীন তাকিয়ে থাকা, তারপর হাটের কাজ শেষে প্রভুর নির্দেশে আবার তাদের জন্য নির্ধারিত ঝুপড়িতে ফিরে আসা– এই-ই তার সীমারেখা। এইটুকু ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনো অংশে কোনোদিন পা ফেলেনি সে। রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতই তার মতো সকল ক্রীতদাসের পৃথিবী। এত বিশাল ইক্ষুক্ষেত! রামশর্মা আস্ফালন করে বলে 'ইক্ষু-সাম্রাজ্য'। যখন সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেল পপীপের পলায়ন-বিষয়ে, তখন পথের সন্ধানের জন্য সে আকুল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে বাসুখুড়ো তাকে বলেছে সূর্যের দিকে মুখ করে এগিয়ে যেতে। নিজের মাটিতে পা না পড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে।

নিজের মাটিকে সে চিনবে কেমন করে?

তাকে যখন নিজের মাটি থেকে তুলে নিয়ে কামরূপে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে ক্রীতদাসত্ব করতে পাঠানো হয়, তখন তার শৈশব। কাঁচা শৈশব। সেগুলি এত এত বছর আগের কথা যে শরতের মেঘের মতো আবছা কোনো শৈশব-দৃশ্যও তার মনে পড়তে চায় না। তারপর কেটে গেছে আঠারোটি বৎসর। আঠারোটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌর বৎসর! এতদিন পরে নিজের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গুরু বাসুখুড়ো এবং পিতা বট্যপ তাকে বলেছে তার নিজের মাটিতে চলে যেতে। পালিয়ে যেতে। আমরণ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার এছাড়া আর কোনো পথ নেই। একথা তো তারা সবাই জানে। কিন্তু তার পলায়নের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাকে পালিয়ে যেতে বলার পেছনে রয়েছে বাসুখুড়োর অন্য উদ্দেশ্য। পপীপকে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে যোগ দিতে হবে ভীম কৈবর্তের সাথে। কিন্তু খুড়ো নিজে পালায়নি। পিতা বট্যপও পালায়নি। বলেছে তাদের মতো বৃদ্ধদের আর দরকার নেই বরেন্দির। দরকার পপীপের মতো যুবকদের। তাই তাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হবে।

কোন পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে সে?

তার বুক আর মাথায় কাঁপা কাঁপা আঙুল ছুঁইয়ে বাসুখুড়ো বলেছিল– তোকে যে বিদ্যা দিয়েছে মল্ল, যে সাক্ষরতা দিয়েছে, বর্ণমালা পাঠের সক্ষমতা দিয়েছে, ঊর্ণাবতী তোকে যে শাস্ত্রপাঠ শিখিয়েছে, আর আমি দিয়েছি জীবনের যে পাঠ– সেগুলোই তোর পাথেয়। প্রতিকূল পৃথিবীতে সেগুলোই তোর প্রতিরোধের আয়ুধ। আর নিজের মানুষদের জন্য সেগুলোই তোর সবচেয়ে বড় উপহার-প্রতিদান।

নিজের দেশ চিনব কেমন করে?

বাসুখুড়ো আশ্বাস দিয়েছিল– তোকে কষ্ট করে চিনতে হবে না। নিজের মাটিতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিই চিনে নেবে তোকে।

সেই থেকে সে হাঁটছে। বাসুখুড়োর চিতায় আগুন দেবার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। বাসুখুড়ো বলেছিল তার আত্মা আর আশীর্বাদ পপীপের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। পপীপের বুকের মধ্যে নিশ্বাস হয়ে গুরুর আত্মা তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে নিজের মাটিতে। পপীপ সেখানে তার শেষ নিশ্বাসটুকু পৌঁছে দিতে পারলেই গুরুর আত্মা চিরশান্তি লাভ করবে।

বাবার আশীর্বাণী আর গুরুর আত্মাকে বুকে নিয়ে পপীপ হেঁটে চলেছে।

পালানোর সময় প্রথম লক্ষ্য ছিল দাসপ্রভু রামশর্মার সীমানা থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যাওয়া। দাসপ্রভুর বাড়ানো হাত তাকে যেন ছুঁতে না পারে। এখন কামরূপের দাসপ্রভুরা খুবই সতর্ক। অনেকদিন ধরেই পালিয়ে যাচ্ছে আত্মবিক্রিত কৈবর্তরা। তারা জেনে গেছে যে, তাদের বরেন্দি এখন আবার কৈবর্তদের নিজেদের বরেন্দি হয়ে গেছে। একবার কোনোক্রমে পালিয়ে পুণ্ড্র-বরেন্দির সীমায় পা রাখতে পারলে আর ভয় নেই। এখন আর পালরাজাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিক বা রাজপুরুষরা নেই, যারা পালিয়ে আসা কৈবর্তদের ধরে ধরে আবার কামরূপে ফেরত পাঠাবে। তাই কৈবর্তদের পালিয়ে যাওয়ার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, দাসপ্রভুদের প্রহরাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কামরূপের রাজপুরুষরা। কোনো দাসপ্রভু যদি রাজপুরুষদের জানায় যে তার দাস পালিয়ে গেছে, তাহলে তাকে পুনরায় ধরে আনার জন্য শিকারী কুকুরের মতো পথে নামে রাজপুরুষরা। কেউ কেউ পুনরায় ধৃত হয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার পূর্বতন প্রভুর কাছে। তখন তাদের ওপর যে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়, তা দেখে অনেক কৈবর্ত-দাসই নিজের মন থেকে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঝেড়ে-মুছে বের করে দেয়। তারপরেও পপীপ পালিয়েছে রামশর্মার ইক্ষু-উদ্যান থেকে। তারপর পথে পথে ভয়। তার তো কোনোমতেই ধরা পড়া চলবে না। সেই কারণেই বেশি সাবধানী পপীপ। দিনের আলোতে তাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে কোনো জঙ্গলে, ঝোপে বা বুনোপশুর খোঁদলে। লুকানোর মতো কোনো জায়গা তাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে প্রত্যুষের আগেই। ধলপহর মানেই আলো ফুটে ওঠা আর মানুষের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার আশংকা। তাই পপীপ পথ চলেছে শুধু রাতের অন্ধকারে। রাতের বেলা তস্করের ভয়, বাঘ-সাপ-বুনোমোষের ভয় কামরূপের পথে-প্রান্তরে। কিন্তু এসব ভীতি পপীপকে স্পর্শ করেনি। তার ভয় ছিল মানুষকে। ভূমিপুত্রদের নয়, পুরবাসী মানুষকে ভয়। ভয় সংস্কৃত জানা নিজেদের সুসভ্য দাবি করা মানুষকে। ভিনদেশ থেকে এসে এই সুসভ্য মানুষরাই ভূমিপুত্রদের জমি-জনপদ কেড়ে নেয়, সুসভ্য মানুষরাই অন্য মানুষদের দাস বানায়, বন্দি করে রাখে, মাত্র কয়েক কার্ষাপণ মুদ্রার বিনিময়ে কিনে নেয় মানুষের দেহ, আত্মা আর উত্তরপুরুষকে। সেই মনুষ্যভক্ষক সুসভ্য মানুষদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যই পপীপের দিনের পর দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়া, আর রাতের আঁধারে পথ চলা।

গত দুইদিন আগে বিশাল একটি নদী পাড়ি দিয়েছে সে। বাবা বলেছিল, কামরূপ আর তাদের কট্টলি-বরেন্দি-পুণ্ড্রর মাঝের সীমানায় রয়েছে কূল দেখতে না পাওয়া বিশাল একটি নদী। সেই নদীর এই পারে কামরূপ, ঐ পারে পুণ্ড্রবর্ধন। তারপরে বারো দিনের পথ পেরুলে তাদের নিজের মাটি। তাদের বরেন্দি। পপীপ বুঝতে পারছে না যে নদীটা সে পেরিয়ে এসেছে, সেটাই সেই নদী কি না। তবে এটুকু অন্তত নিশ্চিত যে সে এখন দাসপ্রভুর আয়ত্ত থেকে অনেকটাই দূরে। চাইলেই রামশর্মার লোকেরা এখন অতি সহজে তার নাগাল পাবে না। এখন তার মধ্যে পুনরায় ধৃত হবার ভীতি অনেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমে এসেছে। সে এখন তাই দিনের বেলাতেও পথ চলতে শুরু করেছে। দিনের আলো ছাড়া নদী পার হওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো মাঝি রাতের অন্ধকারে এই উত্তাল নদী পেরুতে চায়নি। বাধ্য হয়ে পপীপকে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি পাড়ানির কড়ি গুণতে হয়েছে। হাতে পুরো একটি রৌপ্য দ্রম্ম আর দশটি কার্ষাপণ নিয়ে তবেই একজন জেলেনৌকার মাঝি তাকে নদী পার করে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। মাঝিকে সে বারংবার জিজ্ঞেস করেছে এই নদীর নাম কী। মাঝি বলেছে নদীর নাম ত্রিস্রোতা। ওপারের জনপদটির নাম বলেছে কোটিবর্ষ। বরেন্দি কতদূর? মাঝি উত্তর দিয়েছে সে জানে না। কোনোদিন সে বরেন্দিতে যায়নি। তবে তার আরওহী বরেন্দিতে যেতে চাইলে ঠিক পথেই এগুচ্ছে। কারণ বরেন্দি যাওয়ার জন্য অনেক শ্রেষ্ঠী তার এই নৌকাতেই নদী পার হয়েছে। তবে বরেন্দি এখান থেকে ঠিক কত দূরে, বা কয়দিনের পথ পেরুলে বরেন্দিতে পৌঁছানো যায়, তা সে জানে না। তাকে পাড়ে নামিয়ে দেবার সময় মাঝি মৃদুকণ্ঠে শুধিয়েছিল– তুমি কি বিক্রি হওয়া মানুষ? কামরূপের ইক্ষুক্ষেত থেকে পালিয়েছ। লয়?

একটু ইতস্তত করে পপীপ স্বীকার করেছে– হ্যাঁ।

তুমি কি বরেন্দির কৈবর্ত?

হ্যাঁ।

মাঝি তাকে বলেছে– ওলান ঠাকুর তুমাক রক্ষা করুক!

আবেগে-কৃতজ্ঞতায় পপীপের গলা বুঁজে এসেছিল। সে প্রশ্ন করেছিল– তুমিও কি কৈবর্ত?

না, আমরা কোচ।

বাসুখুড়ো জানিয়েছিল কৈবর্তদের মতো কোচ আর পোদ-রাও এই মাটির আদি সন্তান। কাজেই মাঝির এই আশীর্বাদ আসলে এক ভূমিপুত্রের জন্য আরেক ভূমিপুত্রের শুভকামনা।

তারপরে আবার হাঁটা। এখন সে দিনের বেলাতেও পথ চলছে। আজ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু হয়েছে তার পথচলা। কিন্তু বেলা যত বাড়ছে, ততই তার মনে হচ্ছে রাত্রিকালে পথচলাই বেশি ভালো ছিল। রোদের এমন ভয়ঙ্কর তীব্রতা সে কখনো কল্পনাই করতে পারেনি। সূর্য মাথার ওপর পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই মাটি থেকে গরম ভাপ বেরুতে শুরু করেছে। গেরুয়া রঙের মাটি প্রতিমুহূর্তে আরও গনগনে আর নিষ্করুণ হয়ে উঠছে। পায়ের নিচে যেন মাটি নয়, কামারের নেহাই। সে এসে পড়েছে আদিগন্তবিস্তৃত বিশাল এক মালভূমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝখানে। যেদিকে যদ্দুর তাকানো যায় কোনো মানুষ চোখে পড়ে না, কোনো বৃক্ষ চোখে পড়ে না, কোনো ঝোপ চোখে পড়ে না, কোনো সরোবর চোখে পড়ে না, কোনো সবুজ চোখে পড়ে না, এমনকি অন্য কোনো প্রাণীও চোখে পড়ে না। পপীপ অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নিচ থেকে আগুন ছুঁড়ে মারা গেরুয়া মাটি, আর মাথার ওপরের আগুনছিটানো জ্বলন্ত সূর্য তাকে দিশেহারা করে ফেলে। পলায়নমুহূর্ত থেকে সে সবসময় মনে মনে কামনা করেছে বরেন্দিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়। সে-ও কোনো মানুষের অবয়ব দেখতে চায়নি পারতপক্ষে। অথচ এখন এই ভয়াবহ নির্জনতা তার সমস্ত সত্তাকে অবশ-বিবশ করে ফেলছে। মাথা থেকে, কপাল থেকে, চিবুক থেকে ঘাম ঝরছে বর্ষার জলের মতো অনর্গল। কিন্তু ঘামের বিন্দু মাটিতে পড়ামাত্র মাটি তাকে শুষে নিচ্ছে নিমেষে। এমনকি মাটিতে ঘামের ফোঁটা পড়ার দাগটি পর্যন্ত টিকে থাকতে পারছে না কয়েক মুহূর্তের বেশি। এই ব্যাপারটি খেয়াল করে সে ভীত হয়ে পড়ে। এই মাটির সঙ্গে কি তাহলে জলের বৈরিতা রয়েছে? জলের কথা মনে আসামাত্র তার অনেক আগে থেকেই জেগে ওঠা তৃষ্ণাবোধ আরও প্রচণ্ড আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার নিজের সঙ্গে কোনো জল নেই। সে জলসন্ধানে আকুল হয়ে দক্ষিণে-বামে, সামনে-পেছনে তাকায়। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে, জল বা জলজ কোনোকিছুর সন্ধান মেলে না; দেখা যায় শুধু তাপতরঙ্গের নাচানাচি। সেই তাপতরঙ্গ আকাশের সূর্য থেকে পায়ের নিচের গেরুয়া মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সে মেঘজীবনের মতো আকুল হয়ে মেঘসন্ধানের প্রত্যাশায় আকাশের দিকে তাকায়। মুহূর্তে তার চোখের পাতা এবং ভুঁরুসমেত পুরো চক্ষুগোলক ঝলসে যায়। সূর্যের চোখে চোখ পড়েছে। সে অন্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। কোনো কিছু না দেখে ধাপ ফেলতে গিয়ে হোঁচট খায় এবরোথেবরো মাটিতে। পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। গরম চুল্লির মতো মাটির স্পর্শ পাওয়ামাত্র সমস্ত শরীর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এতই গরম মাটির স্পর্শ যে মনে হয় তাকে একটি ফুটন্ত শর্ষপ তেলের কড়াইতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই মুহূর্তে সে বুকের মধ্যে একটি অচেনা হীমশীতল অনুভূতির বয়ে যাওয়া টের পায়। সেই অনুভূতির নাম মৃত্যুভীতি। সেই অনুভূতিই তাকে আবার দুই পায়ের ওপর নিজেকে তুলে ধরানোর শক্তি যোগায়। না! সে নিজের মাটিতে পা না রাখা পর্যন্ত মরবে না! কিছুতেই না!

দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। মস্তিষ্ককে আবার নিজের বশে আনার চেষ্টা করে প্রাণপণ। সূর্যের আলোতে নিজের ছায়াকে খোঁজে মাটিতে। ছায়া দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফের মনে মনে ঠিক করে নেয় নিজের গন্তব্যের দিক-নির্দেশনা। তারপর আবার চলতে শুরু করে একটার পর একটা ধাপ ফেলে।

কিছুক্ষণ পরেই তার অন্য সমস্ত বোধ লোপ পেয়ে যায়। রোদের অনুভূতি থাকে না, গরমের অনুভূতি থাকে না, ব্যথার অনুভূতি থাকে না, জলতৃষ্ণার অনুভূতিও নয়। বাসুখুড়োর আত্মা বুকের মধ্যে বসে তার সাথে অবিরাম কথা বলে চলে। বাসুখুড়োর আত্মাই তাকে এখন পথ দেখাচ্ছে, তাকে পথ চলার বিন্দু বিন্দু শক্তি যোগাচ্ছে। এক ধাপ, এইবার আরেক ধাপ, আবার বাম পা, এইবার দক্ষিণ পা, এইবার আরেকটি ধাপ... এবার পরের ধাপ... তারপর আরেক ধাপ...

মাটিতে কীসের যেন ছায়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে পপীপ। কীসের ছায়া হতে পারে! সূর্যের কি ছায়া পড়ে? আকাশের? এতক্ষণের নিঃসঙ্গ পথচলার মাঝে একটি ছায়ার হঠাৎ উপস্থিতি তার আচ্ছন্ন চেতনাকে বড়সড় একটা ধাক্কা দেয়। সে সূর্যকে এড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়। বিশাল একটা শকুন। ঠিক তার মাথার উপর। সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে উড়ে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। শকুনের কুৎসিত দুই লাল চোখে লালসা। কিন্তু পপীপ এখন ভয়-ভীতির উর্ধ্বে পৌঁছে গেছে। এই নির্জন দুপুরের গনগনে রোদঢালা মালভূমিতে মাথার ওপর শকুনের অবিচল ছায়া যে মৃত্যুর প্রতীক, একথা সবাই জানে। কিন্তু পপীপ ভয় পায় না একবিন্দুও। বুকের মধ্যে বসে গুরুর আত্মা তাকে পথনির্দেশ দিয়ে চলে। মনে মনে ভেবে নেয় বাসুখুড়ো সামনে সামনে হেঁটে তাকে পথ দেখাচ্ছে। আর সে বাসুখুড়োর সেই অদৃশ্য নির্দেশ শিরোধার্য করে এগিয়ে চলে– এক ধাপ... এরপর আরেক ধাপ... আরেক ধাপ...

তারপরে, অনেক অনেক পরে, যেন একটি পুরো মানবজীবনের শেষে, যখন সে চোখ মেলে আবার, দেখতে পায় তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে আরেকটি অস্পষ্ট মুখ। প্রথমেই মনে জাগে শকুনটার কথা। কিন্তু না, শকুন নয়। তার ওপরে ঝুঁকে থাকা মুখটিকে মানুষের মুখ বলেই মনে হচ্ছে। একবার মনে হয় এটি বোধহয় তার গুরু বাসুখুড়োর মুখ। সেই একই রকম কালোপাথরে কুঁদে বানানো এদিক-ওদিক ছুটে যাওয়া নদীরেখার মতো অজস্র বলিরেখা আঁকা মুখ, ধূসর ভুঁরু, সাদায়-ধূসরে মেলানো একমুখ অযত্ন দাড়ি, দুই কোণে রক্তজমা বড় বড় দু'টি চোখ যেখানে টলটল করে বেদনা, ফোলা ফোলা মোটা দুই ঠোঁট। আর সেই রকমই শীর্ণ একটি শরীর।

পপীপ একটু অবাক হয়। বাসুখুড়ো এখানে কেন? কেমন করে এল! গুরুর আত্মা কি তার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর চলে এসে পুনরায় দেহধারণ করেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার মনে মনে একটু সমস্যাতেই পড়ে যায় পপীপ। গুরুর আত্মাকে এতদূর বয়ে নিয়ে এসেছে সে, কিন্তু এখন হাত-পা-ধড়-মুণ্ডুসহ পুরো একজন মানুষকে কীভাবে সে বুকের মধ্যে পুরে নেবে! আবার তার একটু অভিমানও হয়। গুরু যদি দেহধারণ করলই, তাহলে এত দেরিতে করল কেন? সে যে গত কয়েকটি দিন একা একা এত পথ আর এত বিপদ পাড়ি দিয়ে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছুল, শুরু থেকেই দু'জন একসঙ্গে চললে তাকে নিশ্চয়ই একাকিত্বের দুঃসহ কষ্টটুকু অন্তত সইতে হতো না। তারা পথে পথে বিপদে-আপদে তাৎক্ষণিক পরামর্শ করে চলতে পারত। বিশেষ করে তার সেই রোদ-তাপ-দাহময় মালভূমির অবর্ণনীয় কষ্টের কথা বার বার মনে পড়ে। গুরু নিশ্চয়ই এই পথের সুলুক-সন্ধান সব জানে। সে নিশ্চয়ই বিকল্প কোনো পথের সন্ধান তাকে জানিয়ে দিতে পারত। অথবা এই মরুপ্রায় মালভূমি পেরুতে হলেও মনে করিয়ে দিতে পারত যে মালভূমি পাড়ি দেবার আগে সঙ্গে অন্তত উপযুক্ত পরিমাণে জল সঙ্গে নিতে হবে।

গুরুর প্রতি তার এই অভিমান অবশ্য কয়েক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হয় না। গুরু একে অনেক বুড়ো, তার ওপর চিররোগী। তার পক্ষে সেই দেহ নিয়ে এমন দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না একেবারেই। সে নিজে পরিশ্রমী পেশল শরীরের যুবক হওয়া সত্ত্বেও রৌদ্রতাপের সন্ত্রাসী আগ্রাসনে মরতে বসেছিল প্রায়। রৌদ্রতাপের কথায় তার মনে আবার সেই অবর্ণনীয় তৃষ্ণার স্মৃতি জেগে ওঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে তৃষ্ণার অনুভূতি ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার। যেভাবে মানুষ স্নানশেষে পরনের ভেজা কপনি চিপে জল ঝরায়, সেইভাবে মোচড়াতে থাকে তার বুক। গুরু বাসুখুড়ো কি বুঝতে পারছে না জলকষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে? শরীরে রোদ-সূর্য-লালমাটির তাপদাহের কামড় এখন আর টের পাচ্ছে না পপীপ। সূর্য হয়তো এখন কোনো মেঘের আড়ালে রয়েছে, তাই চোখও ঝলসে যাচ্ছে না আগের মতো। তবু এই মসৃণ আলোর মধ্যেও হঠাৎ করে তার চোখদু'টি আবার আঁধার হতে শুরু করলে সে অচেতনায় তলিয়ে যাওয়ার আগে কোনোক্রমে তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকা মুখটির কাছে আকুল নিবেদন জানাতে পারে– জল!

জলের অমৃতস্পর্শ তাকে অতলে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সে টের পায় তার ঠোঁট, তার জিভ, মুর্ধ্বা, তালু, কণ্ঠনালী জলস্পর্শের জীবনদায়ী অনুভূতিতে ক্রমান্বয়ে শান্ত ও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। আহ কী শান্তি! নতুন জীবন যেন বরাভয় নিয়ে বিন্দু বিন্দু করে হেঁটে যাচ্ছে তার দেহের প্রতিটি লোমকূপের দিকে। সে আবার চোখ খুলতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার তার দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে শিরাবহুল একটি হাত এবং সেই হাতে ধরে রাখা একটি ঝিনুক। ঝিনুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে তার ঠোঁটের ফাঁকে। সে নিজের অজান্তেই মাথা তুলে বড় হা করে মুখ এগিয়ে দেয় ঝিনুক ধরা হাতটির দিকে। কিন্তু দূরে সরে যায় ঝিনুক ধরা হাত। পপীপের চোখের ওপর তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রুর একটি পাতলা প্রলেপ পড়েছে। সেই প্রলেপের নিচ থেকে সে ঝাপসা হয়ে আসা গুরুর মুখের দিকে তাকায় অনুযোগের দৃষ্টিতে। বাসুখুড়ো কেন সরিয়ে নিচ্ছে জলের ঝিনুক! সে নিজের ঘাড় এবং মাথাকে শক্ত করে উঁচুতে ধরে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। তার মাথা ফের নিচে নেমে এসে ভূমিলগ্ন হয়। তখন আবার সে ঠোঁটে অনুভব করে জলস্পর্শ। তার মুখে আবার ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে জলবিন্দু। এবার অনেকক্ষণ ধরে নিরন্তর চলে তার জলপ্রাপ্তি। ধাতস্থ হয়ে ওঠে পপীপ। সাড়া ফিরে পায় হাতে-পায়ে এবং সমস্ত শরীরে। বামহাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকা অবয়বটির দিকে। ডাকে– বাসুখুড়ো!

এবং তৎক্ষণাৎ-ই সে বুঝতে পারে জলদাতা মানুষটি তার গুরু বাসুখুড়ো নয়। কিন্তু প্রায় তার মতোই দেখতে আরেকজন মানুষ। মস্তিষ্কের এই আধো-জাগরিত অবস্থাতেও পপীপ বুঝে ফেলে, এই মানুষটি তার নিজের জাতিরই মানুষ। সেই জাতি– যে জাতির রক্ত বয়ে চলেছে তার বাবার শিরা-উপশিরাতে, তার গুরু বাসুখুড়োর দেহে, যে রক্ত বয়ে চলেছে তার নিজের দেহে। সে কি তাহলে পৌঁছে গেছে তার নিজের গাঁয়ের মানুষের কাছে? পৌঁছে গেছে তার নিজের মাটিতে? তার বরেন্দিতে? কট্টলিতে? উত্তেজনায় ধড়ফড় করে উঠে বসে পপীপ। তার সামনে বসে থাকা মানুষটির কালোপাথরকোঁদা মুখটিতে আবছা খুশির আলো খেলে যায়। সে জিজ্ঞেস করে– তুই কে রে বাপ্?

আমি কিবাত! নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে উত্তর দেয় পপীপ।

কুথা থেকে আসছিস বটি?

কামরূপ থেকে। আমি বরেন্দি যাব।

প্রৌঢ়ের মুখে তাকে আশ্বস্ত করার হাসি– তুই এখন বরেন্দির মাটিতেই আছিস রে বাপ।

এতক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে ছিল পপীপ। এবার সে উবু হয়ে শোয়। মুখ আর কপাল ঠেকায় বরেন্দির মাটিতে। প্রণাম হে জন্মভূমি!

আর মাটিও যেন তাকে জলদাতা বৃদ্ধের মতো বরাভয় দেয়– হ্যাঁ হ্যাঁ তুই এখন বরেন্দিতেই আছিস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০২. ভাষাই আপন করে

একই মানুষ। কিন্তু জায়গাভেদে কত আলাদা! দুই জায়গাতে পুরোপুরিই দুই রকম। কামরূপে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে অনেক কৈবর্ত। শত শত। হাজার হাজারও হতে পারে। কিন্তু তারা সবাই সেখানে দাস। আর এখানে নিজের দেশে নিজের মাটিতে তারা স্বাধীন কৈবর্ত জাতির মানুষ। কামরূপে কৈবর্তরা থাকে পুত্তলিকার মতো প্রাণহীন হয়ে। যেদিন তারা আত্মবিক্রয়পত্রে আঙুলের ছাপ দেয়, সেদিন থেকে তারা তাদের সমস্ত হাসি-গান-প্রাণচাঞ্চল্যও সমর্পণ করে দাসপ্রভুর ইচ্ছার কাছে। তারা হয়তো তিনবেলা খেতে পায়। দাসপ্রভু নিজের স্বার্থেই তাদের তিনবেলা খেতে দেয়। কেননা দাস অভুক্ত থেকে গেলে শরীরের শক্তি হারায়। তখন তাকে দিয়ে প্রয়োজনমতো কাজ করানো যায় না। আবার দাসের মৃত্যু হলে সে তো পুরোপুরি মুক্তই হয়ে যায়। দাসের মরণে বৈষয়িক ক্ষতি হয় দাসপ্রভুর। তাই তাদের নিয়ম করে তিনবেলা খেতে দেওয়া হয়। এখানে অনেক মানুষ হয়তো তিনবেলা খেতে পায় না, কারো কারো একটার বেশি দু'টি কপনি নাই, শিশুদের পরনে প্রায় কিছুই থাকে না। তবু তাদের হাসি কী প্রাণখোলা বাধাহীন! যুবতীদের শরীরে সুন্দর কাপাসবস্ত্র নাই, কণ্ঠিমালা নাই, কর্ণোৎপল নাই, হাতের আঙুলে কারুয়া (আংটি) নাই; আছে হয়তোবা শুধু একজোড়া মেটে হাঁসুলি, কানের পেছনে গোঁজা হয়তো শুধু করঞ্জের ফুল, কাঁকই পড়ে না চুলে, তবু তারা কত প্রাণবন্ত! এখানে এসেই প্রথম যেন সত্যিকারের কৈবর্ত যুবতী দেখতে পেল পপীপ। যুবক-যুবতীর মধ্যে কী যেন একটা জিনিস থাকতে হয়! তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সেটি না থাকলে বয়সের যৌবন থাকলেও আসল যৌবন থাকে না। তার নাম কী স্বাধীনতা! নিজের জীবনকে নিজের বলে মনে করার অধিকার! এখানে সধবা নারীদের চলনে কী অসাধারণ গোপন গর্ব! তাদের সিঁথির সিঁদুর তো শুধু তাদের বৈবাহিক চিহ্ন নয়, তাদের জাতির সম্ভাবনারও প্রতীক। নিজের অজান্তেই শ্লোক উঠে আসে কবি পপীপের ঠোঁটে–

বন্ধনভাজোহমুষ্যা শ্চিকুরকলাপস্য মুক্তমালস্য
সিন্দূরিতসীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব।।

(এই নারীর মুক্তমালায় আবদ্ধ কেশপাশ যেন সীমন্তের সিঁদুররেখায় বিদীর্ণহৃদয় হয়েছে।)

পপীপ যেখানে শুয়ে আছে, তার থেকে একটু দূরে উঠোনে বসে কাজ করছে একটি যুবতী। যুবতী কাজ করছে, আর কাজের ফাঁকে ফঁকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে পপীপের দিকে। শ্লোকমগ্ন পপীপ লক্ষই করেনি যে সে-ও তাকিয়ে রয়েছে যুবতীর দিকেই। সে যে যুবতীর দিকে তাকিয়ে শ্লোকটি মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ করছে, তার এই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যই হয়তো মেয়েটির কপোলে ডালিম ফুলের লালিমা ফুটে উঠছে। মেয়েটি তার দিকে পপীপকে এত দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। যে কোনো যুবতীর ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটবে হয়তোবা। মেয়েটি উঠোনে বসে ধানের আটি বাঁধছে খড় দিয়ে। তার পাশে তার চেয়ে একটু কম বয়সের এক তরুণী। হয়তো তার বোন। ছোট মেয়েটিও লক্ষ করেছে তার বোনের দিকে পপীপের একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ঘটনাটি। সে সকৌতুকে ঠেলা মারে বোনকে। তারপর দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এবার সচকিত হয় পপীপ। আরে, সে এইভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে তো মেয়েরা অন্য অর্থ করে নেবেই! সে একটু লজ্জিত হয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। তখন আসতে দেখে তার নতুন জীবনদাতাকে। হড়জন। এই গাঁয়ের মোড়ল। হড়জন এসে বসে তার পাশে। সস্নেহ হাত রাখে তার কাঁধে– এখন কি তোর শরীলে কষ্ট আছে রে বাপ?

স্মিত হেসে উত্তর দেয় পপীপ– না বাবা, আমার কোনো কষ্ট নেই।

শরীলে বল ফিরে পেয়েছিস আগের মতোন?

হ্যাঁ পেয়েছি।

তুই তো কৈবর্ত জাতির মানুষ। কিন্তু কথা বলিস বেদী (বেদ পাঠকারী হিন্দু) আর নিগ্‌গন্থুদের (বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিত) মতোন। কোথায় শিখলি বটি এমন ভাষা?

মল্লকাকা, উর্ণাবতী, বাসুখুড়োর মুখ ভেসে ওঠে তখন পপীপের মনে। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেবার আগেই আবার প্রশ্ন আসে– তুই কি কৈবর্তদের ভাষা বলতে পারিস না?

কে বলেছে পারি না! এই যে বলছি বটি!

পপীপ বাক্যটি শেষ করামাত্র, সে এবং প্রৌঢ়, দু'জনেই হেসে ওঠে হো হো করে। তাদের হাসি শুনে উঠোনের মেয়েদুটি চমকে উঠে একবার তাদের দিকে তাকায়, তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করে তাদের হাসির কারণ, তারপর আবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হাসি শেষ হলে অনেকটা সময় কেউ কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ পরে পপীপ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে– এখন বরেন্দির মানুষ কেমন আছে কাকা?

তৃপ্তি এবং প্রশান্তির হাসি হড়জনের মুখে– মোদের দেবতা ফিরে এসেছে হে। এখন আমরা খুব ভালো আছি। ওলান ঠাকুর দেবতা ফিরে এসেছিল দিব্যোকের রূপ নিয়ে। তারপরে রুদোকের রূপে। আর এখন আছে ভীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা কৈবর্তের বরেন্দি কৈবর্তের হাতে ফিরত দিয়েছে বটি। কৈবর্তের নিজের মাটি এখন আবার কৈবর্তের। এই বন এই আকাশ এই বাতাস এই নদী এই লালমাটি– সব এখন আবার কৈবর্তের লিজের। হাজার বছর পরে আবার ফিরে এসেছে বটি কট্টলির সুখের দিন, কৈবর্তের সুখের দিন। এখন রাজার উৎপাত নাই, রাজপুরুষের উৎপাত নাই, বেদী-নিগৃগন্তের উৎপাত নাই, গাঁও কেড়ে নিয়ে মন্দির-মঠ বানানোর উৎপাত নাই। আমরা এখন নদী সেঁচে মাছ আনি, জঙ্গল টুকে টুকে মধু আনি, কাঠ আনি, শিকার আনি, মাঠে মাঠে মুগ-মসুর-শর্ষে ফলাই। আর ধান ফলাই। কত রকম ধান! ওগরা আছে, শালি ধান আছে, তারপর আছে অঞ্জনলক্ষী, আগুনবান, আন্ধারকুলি, আমপাবন, আমলো, আসতির, ককচি, কনকচূড়, গুজুরা, গোহোম, কামরঙ, কোটা, খড়কি, কেসুরকেলী, কৈজুড়ি, ছায়ারত্ন, ছিছরা, গুয়াথুপী, গয়াবালি, চন্দনসাল, কোঙরভোগ, জলরাঙ্গি। যা ফলাই, তার আটভাগের একভাগ দিয়ে দেই ভীমের ভাণ্ডারে। বাকি সব মোদের।

বিড়বিড় করে পপীপ– তাহলে বরেন্দি এখন সত্যিকারের কৈবর্তদের দেশ। নিজের গ্লানি ধুয়ে-মুছে বরেন্দি এখন আবার কৈবর্তজাতির শুদ্ধ মাতা। তার গায়ে শ্বাপদের নখ যেন আর কখনোই থাবা বসাতে না পারে, তার জন্য এই দেশটাকে এইভাবে চিরদিন স্বাধীন রাখতে হবে। ভীমের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাসুখুড়ো সেই জন্যই এখানে আসতে বলেছে আমাকে।

পপীপের বুকের মধ্যে বসে আবার কথা বলতে থাকে বাসুখুড়ো– "তখন কট্টলি একা। একা একাই বরেন্দি বানিয়েছে সে। বরেন্দির লালমাটি তৈরি করা হয়েছে, সূর্যের তাপ থেকে সেই লালমাটিকে রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে গাছ-পাল-ঝোপ-ঝাড়-বন-জঙ্গল। লালমাটির বরেন্দির পা ধুইয়ে দেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে নদ-নদী। সেই নদ-নদীতে কত জলচর, সেই বনে-জঙ্গলে কত বনচর! কিন্তু কট্টলির মনে হয়, এখনো তার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়নি। বরেন্দিকে তার কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হয়। পট আঁকা শেষ করে পটুয়ার যেমন মনে হয় কোথায় কোথায় যেন রং দেওয়া হয়নি ঠিক মতো, সেই রকম কট্টলিরও মনে হচ্ছে কী যেন একটা কাজ করে ওঠা হয়নি! কী যেন করে ওঠা হয়নি! কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না খামতিটা কোথায়। সে তখন সূর্যকে ডাকে– আমার এই বরেন্দি-সৃজন পুরো হচ্ছে না কেন? তুমি সকল দেবতার দৃষ্টিদায়ক দেবতা। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও কোথায় আমার কমতি। তুমি দয়া করে আমার সৃষ্টিকে পূর্ণতা দাও।

সূর্য বলে– তাহলে তোমাকে রজঃস্বলা হতে হবে। মিলিত হতে হবে আমার সাথে। তবে তারও আগে তপস্যায় তুষ্ট করতে হবে আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের এত সাধের সৃষ্টিকে পূর্ণতা দিতে কট্টলি যে কোনো শর্তেই সম্মত। তার রজঃ আসে। পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে লালমাটিতে। লালমাটির চাইতেও লাল তার ক্ষরণ। আর ঝরছে তো ঝরছেই। সেই ঝোরা লালমাটিতে স্রোত হয়ে বইতে শুরু করল। সেই স্রোত নদী হয়ে নামল। সেই নদীর নাম হলো লালনদী। সেই লালনদীতে স্নান করে কট্টলি তাকিয়ে রইল সূর্যের দিকে। দিনের পর দিন এইভাবে কেটে গেল সূর্যপূজায়। অনেক অনেকদিন পরে তার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে নেমে এল সূর্য।

সেদিন হঠাৎ আকাশজুড়ে বজ্রপাত। শোঁ শোঁ কলজে-কাঁপানো শব্দ। আকাশ থেকে নেমে আসছে বিশাল একটি পাখি। কী বিশাল সেই পাখি! তার ডানায় ঢাকা পড়ে গেছে পুরো আকাশ। তার পাখার ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছে পুরো পৃথিবী। পাখার ঝাপটায় নদী উঠে আসতে চাইছে ডাঙায়। কিন্তু কট্টলি নির্বিকার, ভয়ডরহীন। বরং তার মুখে ফুটে উঠেছে অপেক্ষাসমাপ্তির হাসি। শরীরে নৃত্যহিল্লোল তুলে কট্টলি স্বাগত জানাল সেই পাখিকে। কট্টলির দিকে বর্শাফলকের মতো ধেয়ে এল পাখি। কট্টোলি তৎক্ষণাৎ রূপ নিল রূপসী এক পক্ষিণীর। শুরু হলো উড়ে উড়ে লুকোচুরি খেলা। বিশাল পাখি তাকে ধরার জন্য তাড়া করে, আর কট্টলি খিলখিল করে হাসতে হাসতে পাশ কাটিয়ে উড়ে যায়। এই লুকোচুরি খেলা আসলে প্রেমের আগের পূর্বরাগ। সঙ্গমের আগের শীৎকার। এইভাবে উড়ে উড়ে সারা আকাশটাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে কট্টলি অবশেষে ধরা দিল রাজপাখির বাহুবন্ধনে। এবার শুরু হলো শৃঙ্গার। আলিঙ্গনে জাপ্টাজাপ্টি আর দুজনের নিশ্বাসের হল্কায় মাটিতে নুয়ে পড়ছিল আকাশছোঁয়া মহীরুহগুলি। অনন্ত সময় ধরে শৃঙ্গারের পরে পূর্ণ মিলন। সৃষ্টির অমোঘ প্রক্রিয়া। সময়ের নিয়মে দুটি ডিম পাড়ল কট্টলি। সেই ডিম ফুটে বের হয়ে এল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। হাম্‌মা আর হাম্‌মি। প্রথম কৈবর্ত নর-নারী। সূর্য আর কট্টলির সন্তান। কট্টলি তাদের জন্যই বানিয়েছে এই দেশ। এই বরেন্দি। বরেন্দির আরেক নাম কট্টলি। মায়ের নামে নাম।"

হড়জন জিজ্ঞেস করে– তোর গাঁয়ের নাম কী রে বাপ?

দেদ্দাপুর।

সে তো অনেক দূর!

সেই গাঁয়ে কে কে আছে তোর?

গাঁয়ের কথা উঠতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে পপীপ। উত্তর দেওয়া হয় না হড়জনের কথার।

পিতৃগণ– ১৩ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই আবার প্রশ্ন করে হড়জন– সেখানে তোর বাবা-মা আছে?

বাবা কামরূপে। রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে কাজ করে।

আর মা?

মায়ের তো সেই গাঁয়েই থাকার কথা। যদি বেঁচে থাকে এতদিন।

চোখের কোণে নুন জমে বোধকরি চোখ জ্বালা করে ওঠে। যে বয়সে তাকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন তার কোনো স্মৃতি জমাট বেঁধে ওঠারই সময় হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মনে হয় সে এখন তার মায়ের চেহারা, তার মায়ের শরীরের মা মা গন্ধ, তার মায়ের আদরের স্পর্শ, এমনকি তার মাতৃগর্ভে থাকার সময়ের অনুভূতিগুলি পর্যন্ত মনে করতে পারছে। সেইসব স্মৃতি এখন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মনের ওপর। জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি নুনজল হয়ে বেরুচ্ছে তার চোখের পাতার বাধা অতিক্রম করে।

তাহলে তো তোর মাকে খুঁজতে যাওয়া দরকার বাপ!

কিন্তু হড়জন এটাও জানে, এখনই পপীপের পক্ষে এই আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়। মালভূমির তাপদাহ তার শরীরে অসংখ্য ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন সবেমাত্র তার চিকিৎসা-শুশ্রূষা শুরু হয়েছে। বীভৎসভাবে পুড়ে যাওয়া মুখে দেওয়া হয়েছে চন্দনের প্রলেপ। গায়ের চামড়াতে জায়গায় জায়গায় ছোট-বড় ফোস্কা। সেসবে ভেষজ লাগানো হয়েছে। পায়ের তলা ফেটে গেছে, রক্ত ঝরছে একটু নড়াচড়া করলেই। তার পায়ের তলায় পুরু করে লেপে দেওয়া দূর্বাঘাসের ঘন ক্বাথ। কতদিন যে লাগবে তার সুস্থ হয়ে উঠতে!

হড়জন সান্ত্বনা দেয়– বেশিদিন লাগবে না বাবা! ওঝা তোকে যা যা নিদান দিয়ে গেছে কয়দিনের মধ্যেই তুই নিজের পায়ে খাড়া হয়ে যাবি। আর তোর সেবা করছে যে, সে কিন্তু যে সে মানুষ লয়! তার হাতে জাদু আছে!

সে কে?

ঐ যে কুরমি! উঠোনে কাজে ব্যস্ত বড় মেয়েটির দিকে আঙুল তুলে দেখায় হড়জন। তার চোখে রীতিমতো গর্বের ছাপ।

কুরমি এখন ধানের আটি বাঁধার কাজ শেষ করে বারান্দার এক কোণে বসে ঝুড়ি বুনছে একমনে। কিন্তু তার একটা কান বোধহয় এদিকের কথা শোনার জন্যই পেতে রাখা আছে। কেননা হড়জন তার নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে একবার সে মুখ তুলে তাকায় এদিকে আর তখন আরেকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখাচোখি হয় পপীপের সাথে। মনে মনে কুঁকড়ে যায় পপীপ। হড়জন বলার পরে তারও মনে পড়েছে তার চেহারা না জানি এখন কী বিশ্রি দেখাচ্ছে! এবং আশ্চর্য যে এই প্রথম পপীপের মনে হয় তার আরও একটি সত্তা রয়েছে। সেই সত্তাটির নাম যুবকত্ব। সেই সত্তার নিজস্ব কিছু ধর্ম এবং চাহিদা রয়েছে। অনেক সময় তার প্রাবল্য এতই বেশি হয় যে সে তখন তার অধিকারীকে বাধ্য করে অন্য সত্তা-প্রতিজ্ঞা-উদ্দেশ্য স্থগিত রেখে কেবলমাত্র তার চাওয়াকে পূর্ণ করতে। সেই যৌবনত্বের সত্তা রামশর্মার ইক্ষু-উদ্যানের ক্রীতদাসপুত্র পপীপের মনে জেগে ওঠার অবকাশই পায়নি কোনোদিন। তাছাড়া প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমের পরে ছিল বাসুখুড়োর কাছে বিদ্যাশিক্ষার কাজ। সেই কাজটিকে সবচেয়ে বড় ধর্মকাজ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল পপীপ। তাই তার বয়সী অন্যদের বিয়ে হতে দেখেও কোনোদিন সে বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করেনি পপীপ। অনেক যুবক দাসেরও বিয়ে হয়েছে গোলগোমী মেয়েদের সাথে। তার মতো দাসদের বিয়ে হতে দেখেও পপীপের মনের মধ্যে কোনোদিন একটি নারীকে নিজের জন্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। তারপরে বাসুখুড়ো তাকে যে বিশাল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে শিখিয়েছে, সেই দায়িত্বই তার কাছে পরম কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় অন্য কোনো চিন্তা তার মনের মধ্যে ঢোকারই সুযোগ পায়নি। কিন্তু পরিবেশের কী অসম্ভব প্রভাব মানুষের জীবনে! বাসুখুড়ো বলেছিল সে যা শিখিয়েছে পপীপকে তার বাইরে আরও অনেক সত্য আছে মানুষের জীবনে। সে যে জীবন দেখেছে, তার বাইরেও অনেক রকম জীবন আছে পৃথিবীতে। সেগুলি সময়মতো জীবনই তাকে শিখিয়ে দেবে। সেই অনেক সত্যের একটি কি আজ তার সামনে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে? তা নাহলে একটি তরুণীর সামনে নিজের রোদে ঝলসে যাওয়া বিকৃত চেহারা নিয়ে লজ্জা পাচ্ছে কেন পপীপ?

বাসুখুড়ো বলেছিল, তোকে যে আয়ুধ আমরা দিয়ে যাচ্ছি সেই সম্পদ কৈবর্তদের মধ্যে কারো নেই। কৈবর্তদের সমস্ত দুর্বলতার কারণ এটাই। এই আয়ুধের জোরেই ভিনদেশী বেদজ্ঞানী পশুর রাখালরা এসে আমাদের ভূমি আমাদের মানুষ আমাদের সম্পদ হরণ করে নিচ্ছে। সেই অস্ত্রের নাম বর্ণমালা। এই বর্ণমালা দিয়েই ওরা একপুরুষের অর্জিত সব জ্ঞান তুলে দিয়ে যেতে পারে পরের প্রজন্মের হাতে। ওদের অর্জিত জ্ঞানের কণামাত্র অংশও হারায় না। উত্তরপুরুষের সঙ্গে পূর্বপুরুষের জ্ঞান যুক্ত হয়ে তাদের শক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে তাদের মনে হয় অজেয়। তাদেরকে প্রতিহত করতে হলে কৈবর্তদেরও দরকার সেই একই অস্ত্র। মল্লকাকা, বাসুখুড়োরা দেবালয় থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন চুরি করে আনার মতো আত্মসাৎ করেছিল এই বর্ণমালার জ্ঞান। তা তারা তুলে দিয়েছে পপীপের হাতে। দিব্যোক কৈবর্তদের নিজেদের বরেন্দি নিজেদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই অধিকার ধরে রাখতে হলে ভীমের বাহুবলের সাথে যুক্ত হতে হবে পপীপের এই শক্তি। সেই কারণেই তাকে এখানে পাঠানো। এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কর্তব্য আর দায়িত্বের কথা ভোলেনি পপীপ। সে কি এখন এক অজানা অনুভূতির প্রভাবে বিচ্যুত হবে তার দায়িত্ব থেকে! জাতির প্রতি তার কর্তব্য থেকে!

নিজের মধ্যে কুরমি কিংবা নিজের যৌন-যুবক সত্তার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে পপীপ।

তার সামনে একটি ছায়া পড়ে। চোখ তুলে তাকায় পপীপ। কুরমি দাঁড়িয়েছে তার সামনে এসে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই কুরমি কবিরাজের ভঙ্গিতে বলে– সুরুয চড়ে গেছে মাথার উপর। এই তাপে তোমার আর আঙিনাতে থাকা চলবে না। উঠো, ঘরে চলো!

পপীপ কাতরকণ্ঠে জানতে চায়– আর কতদিন লাগবে আমার আগের বল ফিরে পেতে?

কুরমি নিচের ঠোঁট কামড়ে বোধহয় মনে মনে গণনা করে। তারপরে বলে– ওঝা বলেছে অনেকদিন।

শুনেই চমকে ওঠে পপীপ। তারপর নিজেই হেসে ফেলে। তার মনে পড়ে, তারা কৈবর্তরা, দুইয়ের বেশি সংখ্যা গণনা করতে জানে না। তাদের কাছে দুইয়ের বেশি হলেই তা অনেক। তারা গোণে– এক... দুই... অনেক...

সেই 'অনেক' নিশ্চয়ই সংস্কৃত আর বেদজানা মানুষের 'অনেক'-এর সমান হবে না!

০৩. সে কোন অচেনা আমি ছিলাম নিজের গহনে

সূর্য সাতবার ওঠে; সাতবার অস্ত যায়।

এবার মনে মনে একটু তটস্থ হয়ে ওঠে পপীপ। এ যে সত্যি সত্যিই অনেকদিন পেরিয়ে যাচ্ছে। তবে আশার কথা এটাই যে তার শরীরের হারানো শক্তি প্রায় পুরোটাই ফিরে এসেছে। হাত ও বুকের যে অংশটুকু নিজের দৃষ্টিসীমায় আসে, সেখানকার ক্ষতগুলি প্রায় সবই মিলিয়ে গেছে। পায়ের পাতা খরায় কামড়ে-ধরা মাটির মতো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল, নিটোল পাতার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছিল এঁকেবেঁকে ছুটে চলা নদীর মতো অসংখ্য ক্ষতরেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সেগুলি বুঁজে এসেছে প্রায়। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে কিংবা হাঁটলে এখন আর বিদ্যুতের মতো ঝিলকে ওঠে না অসহ্য বেদনা। শুধু বোঝা যায় না তার নিজের মুখের অবস্থা এখন কেমন। কেননা নিজে সে নিজের মুখ দেখতে পায় না। কিন্তু মনে মনে ভাবে বোধহয় বীভৎস দাগগুলি মিলিয়ে যায়নি এখনো। তাই কুরমি সামনে এলেই নিজের কুৎসিত মুখের কথা কল্পনা করে সংকুচিত হয়ে পড়ে পপীপ। অথচ কুরমির মধ্যে কোনো ভাবান্তর চোখে পড়ে না। দিনে-রাতে অন্তত পাঁচবার তার কাছে আসে কুরমি। দুইবার আসে খাবার নিয়ে আর তিনবার আসে দূর্বাঘাসের রস এবং চন্দনবাটা নিয়ে। সহজাত সেবিকার দক্ষতা ও মমতা নিয়ে ওষুধ মাখায় তার ক্ষতগুলিতে। মুখের ক্ষতগুলিকে কেমন দেখাচ্ছে এই প্রশ্ন করলেই সে হেসে বরাভয় যোগায়– এই তো সেরে আসছে!

কিন্তু পপীপের যে পুরো প্রতীতি জন্মেনি তার কথায় এটাও সে বুঝতে পারে।

নিজের চোখে দেখতে চাও?

কীভাবে দেখবে পপীপ। নিজের মুখ দেখতে হলে তাকে তো যেতে হবে পুকুর কিংবা কোনো জলাশয়ের পারে। জলে বিম্বিত না হলে কীভাবে নিজের মুখ দেখতে পারে মানুষ! এখানে তো ঊর্ণাবতীর ঘরের মতো কোনো দর্পণ নেই।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কুরমি। একটু পরেই ফিরে আসে। তার হাতে ঝকঝকে মাজা একটা পেতলের থালা। সেই থালা মেলে ধরে সে পপীপের চোখের সামনে। খুব ভয়ে ভয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায় পপীপ। নাহ খুব বিশ্রি দেখাচ্ছে না তো! নিজেকে দেখতে অনেকদিন পরে তার ভালোই লাগে।

কুরমি চোখে যেন স্নেহ নিয়ে দেখছে পপীপের নিজেকে দেখার প্রতিক্রিয়া। এবার সে হাতে তুলে নেয় কাঁকই– দাঁড়াও তোমার চুলগুলো পাট পাট করে দি। কতদিন চুলে কাঁকই পড়েনি!

ছোট বাচ্চাকে চুল আঁচড়ে দেবার মতো করে একহাতে থুতনি ধরে পপীপের মুখটিকে উঁচু করে কুরমি। মুখ তুলতে গিয়ে পপীপের চোখ আটকে যায় কুরমির বুকে। একটাই শাটিকায় (একহাত মাপের চওড়া কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি শাড়ি) ঢাকা কুরমির শরীর। হাঁটুর উপর থেকে শুরু হয়ে কাঁধের ওপরে গিয়ে পিঠ থেকে বুকের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে শেষ হয়েছে শাটিকার দশতি (আঁচল)। বুকে আলাদা কোনো স্তনবন্ধনী নেই। কুরমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজ্জ্বল কালো পাতলা ত্বকের নিচ দিয়ে কোনো কোনো শিরাপথে রক্তের ছুটে চলা স্পষ্ট বোঝা যায়। কুরমির শরীরের ডানপাশটা প্রায় পুরোই দেখতে পায় পপীপ। তার বক্ররেখার মতো কোমরের ত্বক এত মসৃণ যে সেখানে হাত বুলানোর লোভ নিজের অজান্তেই জেগে ওঠে পপীপের মনে। হরিণ ছুটতে ছুটতে পুরো ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনের দিকে তাকালে তার শরীর, মুখ, গ্রীবা নিয়ে যেমন রেখার সৃষ্টি হয়, কুরমির কোমরের বাঁক সেই রকম মনোহর লাগে পপীপের চোখে। ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকা তার বুকের সর্বশেষ অস্থিটার সমান্তরালে ছুটে চলা একটি অস্পষ্ট শিরার ধুকপুকানি টের পাওয়া যায়। সেখানে কানপাতার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে পপীপের মন। নিজেকে অসম্ভব ইচ্ছাশক্তির বলে নিয়ন্ত্রণ করে চলে সে। এই সময় হঠাৎ যেন পৃথিবীতে ভূকম্পন ঘটে! ভালো করে চুল আঁচড়ানোর জন্য একটু নড়ে উঠেছে কুরমি। সাথে সাথে দুলে উঠেছে তার ডান স্তন। হয়তো বাম স্তনও। কিন্তু পপীপের পুরো চোখ জুড়ে এখন কুরমির ডান স্তন। পাকা গাবফলের সাথে পলিমাটি মিশিয়ে যেন রং করা হয়েছে কুরমির স্তনের। তার গঠন জল-বাতাস-রোদের স্পর্শহীন কদমফুলের মতো নিটোল। এত সুন্দর কোনো দৃশ্য কী এর আগে দুইচোখে দেখেছে কখনো পপীপ! তার পৃথিবী দুলে দুলে উঠছে।

নিজেকে আর সামলাতে পারে না পপীপ। এমনভাবে মুখ গোঁজে কুরমির ডানস্তনে যেন তার মুখ থুবড়ে পড়েছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় কুরমির কাঁকই ধরা হাত। শক্ত হয়ে ওঠে কুরমির শরীর। কিন্তু একটু পরেই ঢিল পড়ে শরীরে। সে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ। ঠেলে সরিয়ে দেয় না পপীপের মুখ, কিংবা সরে যায় না নিজেও। আবার সাড়াও দেয় না পাগলের মতো তার স্তনে মুখ ঘষে চলা পপীপের দেহকামনায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে। যেন অপেক্ষা করে পপীপের উন্মাদনা থিতিয়ে আসার। তারপর আলতো করে হাত রাখে পপীপের মাথায়। তার হাতের ছোঁয়ায় নিষেধের আভাস টের পায় পপীপ। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সে। করঞ্জ ফুলের মতো রক্তজমা দুই চোখ তুলে তাকায় কুরমির চোখে। কুরমির চোখে কোনো রাগ নেই, ভর্ৎসনা নেই, আবার প্রশ্রয়ও নেই। সে নিচু অকম্প্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– তোমার মেয়েমানুষ নাই?

এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকায় পপীপ। তারপর আবার আঁকড়ে ধরতে চায় কুরমিকে। এবার দুইহাতে তাকে একটু ঠেলে দেয় কুরমি। মুখে বলে– আমি মানকুর বউ হবো। বাবা আর মানকুর বাবা কথা কয়ে রেখেছে। সামনের ফাগুয়ায় আমাদের বিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর খুব ধীর অচঞ্চল পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পেছনে রেখে যায় অনুশোচনার আগুনে পুড়তে থাকা পপীপকে।

০৪. আর্য-পাঁচালি

তারা তো কোনোদিন গঙ্গার এই পারে যুদ্ধ করতে আসার সাহস পায়নি। যতবার এসেছে, তাড়া খেয়ে পালিয়েছে লেজগুটানো কুকুরের মতো। তখন তারা এই বরেন্দি আর পুণ্ড্রতে এসেছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে, আশ্রয়ের ছল নিয়ে, আর মনে লোভ ও অসীম পাপ নিয়ে। তারা আশ্রয় চেয়েছে, আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তারা আমাদের কাছে বসতের ভূমি চেয়েছে, চাষের জমি চেয়েছে, আমরা তাদের দিয়েছি। তারা জানত না কীভাবে মাটিতে ফসল ফলাতে হয়। কারণ তাদের কোনো মৃত্তিকাপ্রেম ছিল না। কারণ তারা মাটিকে পূজা করতে জানত না। জানত না ফসল ফলাতে। আমরাই তাদের শিখিয়েছি কীভাবে মাটির কাছে নিজেকে নিবেদন করে ফসল ফলাতে হয়। আমরা আত্মীয়জ্ঞানে তাদেরকে আমাদের সকল সম্পদের অংশ দিয়েছি, বুকে টেনে নিয়েছি। তারা একজন-দুইজন করে আমাদের বরেন্দিতে এসেছে, সংখ্যায় বেড়েছে, সঙ্গে এনেছে বিশ্বাসঘাতকতা আর গোপন সব মারাত্মক অস্ত্র। তারপর একদিন তারা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে আমাদের কুলপতি পৌণ্ড্রবরেন্দিকিরাতের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে। একদিন হঠাৎ দেখলাম আমাদের ভূমি আর আমাদের নাই, আমাদের বায়ু-নদী, আমাদের বন-বনানী, আমাদের নিজেদের জীবন– কিছুই আর আমাদের নাই। আমাদের দেশে তারাই প্রভু, আর নিজেদের দেশে আমরা দাস। হায়, ছলনা ছাড়া আর কী আছে এইসব আর্য লোকদের!

আমাদের ভূমি আমাদের দেশ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করে ওরা চালু করেছে মনুর বিধান। সেই বিধানে বলা হয়েছে যে আমরা নাকি নীচু জাতি!

বাসুখুড়োর আত্মা মনে করিয়ে দিতে থাকে পপীপকে– কানীনস্তু পিতামহঃ সমভবৎ পিত্রাদয়ো গোলকাঃ– যাদের পিতামহ ব্যাসদেব ছিল কুমারী মেয়ের গর্ভজাত পুত্র, আর বাপ-জ্যাঠারা ছিল বিধবার ছেলে (কারণ ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর বাবা বিচিত্রবীর্য অকালে মারা গিয়েছিল, তাই ব্যাসের ঔরসেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম); আবার তাদেরও ছেলে যুধিষ্ঠির-ভীমেরা সব হলো গিয়ে অন্য পুরুষের ব্যভিচারের ফল; যাদের পাঁচ ভাইয়ের একটিমাত্র বউ; এই রকম ব্যভিচারের কালিমাখা বংশের পুরুষ যাদের প্রধান পূজ্য দেবতার মর্যাদা পায়, তারা আবার কীসের সভ্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ যুগের কবি বলেছেন– নদীনাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভারতস্য কুলস্য চ। নদী, ঋষি আর ভরতবংশ– এই তিনের মূল খুঁজতে যেয়ো না। খুঁজতে গেলে বিপদে পড়বে। কারণ পাণ্ডব-কৌরব, কৃষ্ণ, ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ– এতসব মহামতি পুরুষের বংশমূল খুঁজতে গেলে দেব-ভক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভরতের পুত্র বলে যে ভরদ্বাজকে মহাঋষি মহামুণীর সম্মান দেওয়া হয়, সে কিন্তু পুরোপুরি জারজ-সন্তান। জন্মবৃত্তান্ত শুনলেই তা জানা যাবে। দেবরাজ বৃহস্পতির ঔরসে ভরদ্বাজের জন্ম। সেটি কীভাবে?

সেকালে উশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম মমতা। বায়ুপুরাণের বর্ণনামতে উশিজ মারা গিয়েছিলেন, আর অন্য পুরাণের মতে উশিজ বাড়ি ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন। উশিজের ভাই দেবরাজ বৃহস্পতি। মমতা তখন আসন্নগর্ভা। পূর্ণ গর্ভবতী মমতার সৌন্দর্য কীভাবে যেন দেবরাজ বৃহস্পতিকে কামোন্মাদ করে ফেলল। তিনি মমতাকে ডেকে বললেন– তুমি এক্ষুণি খুব সুন্দর ভাবে প্রসাধন করে গহনা পরে আমার সামনে এসো। আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। অলংকৃত্য তনুং স্বাং তু মৈথুনং দেহি মে শুভে।

মমতা বিপদাপন্ন কণ্ঠে বললেন– আমার গর্ভে যে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রসন্তান। তার ওপর আমার প্রসব আসন্ন। আমি একেবারে ভরা পোয়াতি। আর আমার গর্ভস্থ শিশুও সামান্য কেউ নয়। সে গর্ভে থেকেই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। বৃহস্পতি, আমি অনুনয় করে বলছি, তুমি অমোঘবীর্য– যা চাও তা হবেই, আমি শুধু অনুরোধ করছি আমার প্রসবের পরে তুমি যা চাইবে তাই হবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারো না। ন মাং ভজিতুমর্হসি।

মমতার এত অনুনয়ের পরেও বৃহস্পতি নিজেকে সম্বরণ করতে রাজি নন। তিনি বললেন– তুমি আমাকে জ্ঞানদানের চেষ্টা করো না।

এই বলে তিনি ধর্ষমানঃ প্রসহৈনাং মৈথুনায়োচক্রমে– মমতাকে জাপটে ধরে মৈথুনের উপক্রম করলেন।

তখন মমতার গর্ভস্থ ভ্রূণ কাতরকণ্ঠে বলে উঠল– দেবরাজ! আমি তো পূর্বাহ্নেই এই গর্ভে স্থান করে নিয়েছি। আপনার সঙ্গম তো কোনোমতেই ব্যর্থ হবার নয়। কিন্তু নাবকাশ ইহ দ্বয়োঃ– এই গর্ভে তো দুইজনের স্থান সংকুলান হবে না।

ভ্রূণের কথা শুনে বৃহস্পতির বীর্যস্খলনে ব্যাঘাত ঘটল। উন্মাদনার চরম মুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃহস্পতি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন– সমস্ত জীবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখাবহ চরম এই মুহূর্তে তুই আমাকে বাধা দিলি, তাই আমার অভিশাপে তুই অন্ধকার নিয়েই জন্মাবি অর্থাৎ অন্ধ হবি।

এভাবেই চির অন্ধত্ব নিয়ে ঋষি দীর্ঘতমার জন্ম।

আর বৃহস্পতির বীর্যস্খলন হলো মাটিতে, সেখানে জন্ম নিল এক শিশু। মমতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ধর্ষণ করার ফলে বৃহস্পতির পরাবৃত্ত তেজ থেকে শিশুটি জন্ম নিল বলে তার প্রতি মমতার কোনো মমতা ছিল না। তিনি বললেন– ভর দ্বাজং বৃহস্পতে। দ্বাজ শব্দের অর্থ জারজ। এই জারজ সন্তানকে তুমিই লালন করো! বৃহস্পতিকে একথা বলে মমতা শিশুকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

ঠিক এই সময়েই মহারাজ ভরতের যজ্ঞাদি ক্রিয়া চলছিল। যজ্ঞে প্রীত হয়ে দেবতা ভরদ্বাজকে এনে দিলেন ভরতের হাতে। ভরদ্বাজ এখন ভরতের দত্তক পুত্র। তার থেকেই শুরু আর্যদের অনেক বড় বড় শাখা। তাদেরই বংশধররা হচ্ছে এইসব রাজা-রাজরা যারা আমাদের কাছ থেকে আবার পুণ্ড্র-বরেন্দি কেড়ে নিতে চায়।

পপীপকে ঘিরে থাকা মানুষগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল কথাগুলি। শুধু পুরুষরা নয়, বেশ কয়েকজন নারীও বসে আছে খড়ে-বোনো পাটির একধারে। সন্ধে তখন বেশ গাঢ়। তাই খুব ভালোভাবে পড়ে ওঠা যাচ্ছে না কার মুখে কী ভাব খেলে যাচ্ছে সেইসব ভাবের অনুবাদ। কিন্তু জমাট স্তব্ধতা অন্তত এটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের মনোযোগ অখণ্ড। তাদের আরও শোনার আগ্রহ খুব স্পষ্ট। এইসব কদর্য কথা মেয়েদের শোনা উচিত কি না এই প্রশ্ন একবারও ওঠে না কারো মনে। কৈবর্ত সমাজে এমনিতেই নারীরা পুরুষের সকল কাজের সহযাত্রী। নারী-পুরুষ ভেদ কোনোদিনই প্রকট হয়ে ওঠেনি তাদের সমাজে। পুরুষের কাজ পুরুষ করে, নারীর কাজ নারী করে। কার কাজের গুরুত্ব কম, বা কার কাজের গুরুত্ব বেশি তা নিয়ে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। তারা গাঁওদেব-গাঁওদেবীর পূজাও করে একসাথে, ফাগুয়ার পরবেও নাচে-গায় একসাথে, এমনকি রামপালের বিরুদ্ধে এখন যে যুদ্ধ চলছে, সেই যুদ্ধেও অংশ নিচ্ছে শত শত কৈবর্ত-নারী। তাই তাদের কাছে লুকানো-ছাপানোর মতো কোনো কিছু নাই। যে কথা শোনার অধিকার পুরুষের রয়েছে, সেকথা শোনার অধিকার রয়েছে কৈবর্ত-নারীরও।

পপীপের জানার বাসনা তখন প্রবল। কাজেই বাসুখুড়ো বলে চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহস্পতির শাপে চোখে অন্ধকার নিয়ে জন্মাল দীর্ঘতমা। সেই দীর্ঘতমা কেমন দুর্বৃত্ত ছিল জানিস?

সে এক ষাঁড়ের কাছে শিখেছিল যে ধর্ম-কর্ম, নীতি-রীতি সব শুধু দু'পেয়ে মানুষের জন্য। চতুষ্পদীরা যা খুশি তাই করতে পারে। ঋষি দীর্ঘতমা সেই মুহূর্তে দীক্ষা নিয়ে নিল ষণ্ডধর্মে। চতুষ্পদীরা যৌনকর্মে কোনো ভেদাভেদ করে না। মা-বোন-দিদিমা কেউই কারো অগম্যা নয়। দীর্ঘতমা তাই-ই করে বেড়াতে শুরু করল। ছোটভাই গৌতম ঋষির বউকে উত্যক্ত করতে শুরু করায় তাকে বের করে দেওয়া হলো তপোবন থেকে। এবার সে গিয়ে উঠল দৈত্যরাজ বলির রাজ্যে। রাজা বলির স্ত্রী সুদেষ্ণা আবার পুত্রহীনা। কিন্তু বলির যে কোনো মূল্যে পুত্র চাই। তখন ধার করা হলো ব্রাহ্মণ দীর্ঘতমাকে। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য। ক্ষেত্রজ পুত্র মানে গোপনে অন্যের সাথে নিজের স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে নিজে বাহিরে বাহিরে একটি পুত্রের জনকত্ব দাবি করা।

এই প্রথার রীতি হলো, যে পুরুষ গর্ভাধান করবে তাকে কাজটি করতে হবে রাতের অন্ধকারে, কদাপি দিনের আলোতে নয়। সেই পুরুষের নিজের শরীরে মেখে নিতে হবে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, আর মিলনকালে কোনো কথা বলা চলবে না– ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি। এসবের অনেক ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে ঘৃতে জ্যাবজেবে পুরুষের সঙ্গে দেহমিলনে কোনো নারীই প্রত্যাশিত রতি-আনন্দ পাবে না। সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। তার ওপরে তার সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণও যাতে সম্ভব না হয় সেই কারণেই পুরুষটির মৌনী থাকার বিধান।

রাজমহিষী সুদেষ্ণা অন্ধ এবং বৃদ্ধ দীর্ঘতমাকে দেখামাত্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে ফেললেন। তিনি ঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তার এক দাসীকে। ঋষি দীর্ঘতমা এই দাসীর গর্ভে বেশ কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করলেন যারা পরবর্তীতে ব্রহ্মবাদী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে পরিচিত। রাজা বলি এতগুলি প্রাজ্ঞ ছেলে দেখে খুব পুলকিত– বাহ, আমার ছেলেরা তো খুবই জ্ঞানী। দীর্ঘতমা তখন পরিষ্কার করে বলল– না, এরা আমার ছেলে। তোমার স্ত্রী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখে আমার কাছে আসেনি। পাঠিয়ে দিয়েছিল তার দাসীকে। আমি অন্ধ হলেও তপোবলে বুঝতে পেরেছি। তাই এরা তোমার ছেলে নয়– আমারই ছেলে।

রাজা বলি আবার স্ত্রীকে সালংকারে মনোমোহিনী সাজে সাজিয়ে ঋষির কাছে পাঠাতে বাধ্য হলো। সজ্জিতা রমণীকে কাছে পেয়ে দীর্ঘতমা বুঝতে পারল এই সেই রাজমহিষী সুদেষ্ণা। তাকে উপেক্ষা করার জন্য সুদেষ্ণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর চরম প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিল দীর্ঘতমা। তার শরীরে সেদিন ঘৃতের পরিবর্তে লেপন করা ছিল দধি। তার সঙ্গে মেশানো হয়েছিল লবণ আর মধু। সুদেষ্ণা পুত্রকামনায় দীর্ঘতমার কাছে এলে দীর্ঘতমা শর্ত দিল– আগে তোমাকে আমার এই দধি-লবণ-মধু মাখা দেহটি একটুও ঘৃণা প্রকাশ না করে পুরোপুরি লেহন করতে হবে। তবেই তোমার গর্ভে আমি পুত্র উৎপাদন করব।

সুদেষ্ণার উপায় নেই কোনো। ঘৃণা-লজ্জা ফেলে রেখে তিনি জিভ দিয়ে লেহন করলেন দীর্ঘতমার সর্বাঙ্গ। বাদ দিলেন শুধু দীর্ঘতমার উপস্থদেশ। দীর্ঘতমা নাছোড়– আমার লিঙ্গও তোমাকে লেহন করতে হবে। কিন্তু সুদেষ্ণা পারলেন না সেখানে মুখ ছোঁয়াতে। তখন দীর্ঘতমা বলল– বেশ তাহলে তোমাকে যে পুত্র দান করব, তার গুহ্যদেশ থাকবে না।

সুদেষ্ণা তখন তার পায়ে পড়লেন। কাতর অনুনয়ে একটু নরম হয়ে দীর্ঘতমা বলল– আমার শাপ তো ফিরিয়ে নিতে পারব না। তবে এইটুকু করতে পারি যে তোমার পুত্রের বদলে এই অভিশাপকে পাঠিয়ে দিতে পারি তার পুত্রের কাছে। আর তুমি যেহেতু আমার লিঙ্গটি ছাড়া সমস্ত অঙ্গই লেহন করেছ, আমি মোটামুটি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমাকে আমি দান করব একটি নয় পাঁচ-পাঁচটি পুত্র। আর তারা হবে দেবতাদের মতো ধার্মিক এবং সচ্চরিত্র।

ছি!

খুব মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও ধিক্কার-ধ্বনিটির প্রাবল্য এত বেশি যে সবাই সেদিকে তাকাতে বাধ্য হলো। মেয়েদের মধ্য থেকে উচ্চারিত হয়েছে শব্দটি। কে বলেছে যদিও নিশ্চিত বোঝা গেল না, কিন্তু পপীপের মনে হয় এই শব্দটি কুরমির এসেছে মুখ থেকেই।

বিকৃতি নামে কোনো শব্দ নেই কৈবর্তদের ভাণ্ডারে। কারণ তাদের জীবনে প্রকৃতি থেকে কোনো বিচ্যুতি নেই। যা প্রাকৃতিক নয়, এমন কিছু কৈবর্তরা কখনোই মেনে নেয় না। তাই মেয়েদের মধ্য থেকে ছিটকে আসা শব্দটির সাথে পুরুষরা শুধু একটি কথা বলেই তাল মেলাতে পারে– ঘেন্না ঘেন্না!

হড়জন বলে– খারাপ কথা বেশি শুনতে নাই। ছোটকথা শুনলে নিজের মনটাও ছোট হয়ে যায়। কিন্তু এইগুলান আমাদের জানা দরকার। তা নাহলে সত্যি কথা চিরকাল গোপনই থেকে যাবে।

পপীপ তখন আবার বলতে শুরু করে– ছল-চাতুরি-মিথ্যাভাষণ-ব্যভিচার ওদের মজ্জাগত। কারণ ওদের দেব-দেবী সব নিজেরাই ছল-চাতুরিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবসময় মগ্ন। দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি একবার অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের রূপ ধরে এসে অসুরদের প্রবঞ্চনা করেছিলেন। অসুরদের তিনি শেখাচ্ছিলেন অহিংসার ধর্ম, যাতে তারা দেবতাদের হত্যা না করে।

সমুদ্র মন্থন করল অসুর ও দেবতারা মিলে। পরিশ্রম বেশি করেছিল অসুররাই। কিন্তু সমুদ্রমন্থনে যতটুকু অমৃত উঠল, যত সম্পদ পাওয়া গেল, অসুরদের প্রবঞ্চনা করে সবটুকু দিয়ে দেওয়া হলো দেবতাদের ভাগে। ওদের মতে জগতের পালক বলে যাকে মানা হয়, সেই বিষ্ণু কী অপকর্মটাই না করল! সমুদ্র থেকে ওঠামাত্র বিষ্ণু হাতিয়ে নিল স্বর্গসুন্দরী লক্ষ্মীকে। সমুদ্র থেকে ঐরাবত হাতি উঠল, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠল, পারিজাত ফুল উঠল– সবগুলি দেবতারা আত্মসাৎ করল বিষ্ণু আর ইন্দ্রের ছল-চাতুরির সাহায্যে।

আর ব্যভিচার! তার তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই যে এক দেবতা– চন্দ্র! সে পালাল গুরু বৃহস্পতির বউকে নিয়ে। দেবরাজ ইন্দ্র ধর্ষণ করল তারই গুরু গৌতমের সাধ্বী স্ত্রী অহল্যাকে। গুরু বৃহস্পতি, তার নিজের বউ কার সাথে পালাল সে খোঁজ নেই, সে তার ছোটভাইয়ের বউকে গর্ভবতী অবস্থায় বলাৎকার করে অন্ধ ছেলে হওয়ার অভিশাপ দিল।

স্তব্ধতা নেমে আসে হড়জনের আঙিনায়। পপীপ একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত। এবার সে সিদ্ধান্ত জানাতে চায়– এইসব দেবতাদের যারা পূজা করে, এইসব নরাধম মানুষদের যারা বংশধর, তারা এতদিন আগ্রাসন চালিয়ে পদানত করে রেখেছিল আমাদের দেশকে। আমাদের জাতিকে। দিব্যোক আমাদের মুক্ত করেছেন। আমাদের উচিত সবকিছু দিয়ে ভীমকে সহযোগিতা করা। ঐসব আর্য-পিশাচের দল এখনো তৎপর আমাদের দেশকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য। তাদেরকে প্রতিহত করতেই হবে আমাদের।

উসখুস করছিল কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা তারা করেই ফেলল পপীপকে– তুই এইসব কথা জানতে পারলি কীভাবে?

পপীপ যেন জানত এই প্রশ্নটি উঠবে। সে হেসে বলে– ওদের শাস্ত্র পড়ে। ওদের পুঁথি পড়ে।

কে তোকে পড়তে শিখিয়েছে বটি?

আমার গুরু তিনজন। মল্লকাকা, উর্ণাবতী আর বাসুখুড়ো।

বাসু কে?

সে-ও ছিল আমাদের মতোন একজন ইক্ষুক্ষেতের দাস।

সে কার কাছে শিখল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পপীপ– সে অনেক বড় আর কষ্টের গল্প। দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচানোর গল্পের মতো বাসুখুড়োও আর্যদের বিদ্যা চুরি করে এনেছিল কৈবর্ত-কোচ-মেচ-পোদ আর এই মাটির সকল ভূমিপুত্রকে বাঁচানোর জন্য।

আর্যরা সকলেই কি এইসব শাস্ত্রের কথা জানে?

না। জানে শুধু ব্রাহ্মণরা। তারা বিধান দিয়েছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ এই শাস্ত্র পড়লে সে রৌরব নরকে যাবে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ এই শাস্ত্র শুনলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়ার বিধান রয়েছে। সেই কারণে অন্য কেউ শাস্ত্র পড়তে পারে না। আর এই সুযোগে ব্রাহ্মণরা যা খুশি বিধান দিয়ে নিজেদের উঁচু অবস্থান বজায় রাখে।

একটু হেসে বলল পপীপ– আর আমি যে তোমাদের কাছে শাস্ত্রের কথা বললাম, তার শাস্তি হচ্ছে আমার জিহ্বা টেনে বের করে কাঠের সাথে কীলক দিয়ে গেঁথে রাখা।

০৫. অচেনা বাঁধন আজও বাধা হয়ে থাকে

এবার যেতে হবে।

প্রথমে মায়ের খোঁজে দেদ্দাপুর। তারপর ভীমের সাথে সাক্ষাতের জন্য রাজধানীতে। পিতৃভূমিকে রক্ষার জন্য যে আয়ুধ বাসুখুড়ো তুলে দিয়ে গেছে তার হাতে, যার জন্য তার কামরূপ থেকে এই কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বরেন্দিতে পালিয়ে আসা, সেই আয়ুধ ব্যবহার করতে হবে ভীমের পক্ষের যুদ্ধে। যেতে যে হবে, এ ব্যাপারে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু কুরমির ভাবনা কিছুতেই সরে যাচ্ছে না মন থেকে। মাঝে মাঝে কুরমি তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলছে যে নিজের কর্তব্যকর্মগুলিকেও গৌণ বলে মনে হচ্ছে। এ তার জীবনে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতি। এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সে বিষয়ে তাকে বিন্দুমাত্র শিক্ষাদান তো দূরের কথা, কোনোদিন ইঙ্গিত পর্যন্ত করেনি গুরু। বাসুখুড়ো অবশ্য বলেছে জীবনে নানা রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় মানুষকে। তখন বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঠিক কী করা উচিত আর কী করা অনুচিত। কিন্তু সবচেয়ে বিপদের কথা হচ্ছে কুরমির ব্যাপারে পপীপের বুদ্ধি-বিবেচনা আদৌ কোনো কাজ করছে না। বিবেক-বিবেচনা বলছে, তার এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত। কিন্তু কুরমিকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই হাহাকার করে উঠছে তার বুক। কামরূপে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে দীর্ঘ দাসজীবনে কত কিছুর জন্যই তো হাহাকার করে উঠেছে তার বুক। কিন্তু সেগুলি কোনোটাই এখনকার মতো নয়। সেইসব আবেগ এমন তীব্রও ছিল না, এমন যুক্তিহীনও ছিল না।

ঘরে আর ভালো লাগে না পপীপের। বাইরে বেরিয়ে আসে। তাকে উঠোনে নামতে দেখেই আখার পাশ থেকে হড়জনের বউ বলে– কিছু লাগবে রে বাপ?

না না কিছু লাগবে না। আমি বাইরে যাব। একটু ঘুরে আসি গ্রামটা।

এই রোদের মধ্যে যাবি?

কিছু হবে না মা। বৈদ্য তো বলেছে আমার আর কোনো অসুবিধা নাই।

একলা যাবি? কুরচি সাথে সাথে যাক!

দরকার নাই মা। কুরচি কাজ করছে, করুক।

হড়জন-পত্নীর সামনে থেকে সরে আসতে পেরে, তার স্নেহের অত্যাচার থেকে একটু রেহাই পায় পপীপ। সে একটু দ্রুত পায়েই বেরিয়ে আসে বাড়ি ছেড়ে।

সেই একই রকম প্রায় সব বাড়ি। লালমাটি গেঁথে গেঁথে দেয়াল তোলা। মাথার উপর বাঁশের বাতার তৈরি খলপার ছাউনি। একদিকে ঢালু। দোচালা ঘর হলে মাঝখানের টুঁই থেকে দুইদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে খলপার চালা। খলপার উপর দিয়ে পুরু করে কাদা লেপে দেওয়া। এই কাদা বৃষ্টির জল ঠেকায়, গরমের সময় অতিরিক্ত রোদের আঁচ থেকে ঘরের মানুষকে বাঁচায়, আবার পৌষ-মাঘে শীতের কামড়ের তীব্রতা কমায় অনেকখানি। আনমনে হাঁটে পপীপ। দশ-পনেরো-কুড়ি ঘর নিয়ে এক-একটা গ্রাম। তারপরেই শস্যের ক্ষেত। মুগ-মসুর-কাউনের মাঠ। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে দক্ষিণ দিকে তাকালে চোখে আসে লালাভ আগুনের মতো এক বিশাল আদিগন্তব্যাপী বিস্তার। সেই মালভূমি, যেখানে তাপদাহে মৃত্যুর মুখে পড়েছিল পপীপ। সেদিকে তাকিয়ে সেই ভয়াবহ স্মৃতি মনে ফিরে আসে পপীপের। মনে মনে শিউরে ওঠে সে একবার। দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সেদিক থেকে। লাল মালভূমি শেষ হয়ে যেখানে সবুজের শুরু, সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে একটির পর একটি গ্রাম।

মাঠের পরে ঝোপ-ঝাড়ের বাধাহীন বিস্তার। ঢোলকলমি, দাঁতুন গাছ, রংচিতা, তেসরা মনসা, ফনিমনসা, নোনা আতা, নিশিন্দা, ভেরেণ্ডা, খয়ের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবলা, বনবাঁশ, বনবরই গাছের ফাঁকে ফাঁকে কত রকমের যে গুল্ম। মুথা, দূর্বা, চোরকাটা, কুচ, ভুঁই-আঁকড়া, কাটানটে, আপাং, কালকেসুন্দি, হেলেঞ্চা, হাতিশুড়া, মুক্তাঝুরি, শেয়াকুল, গোহুর, ঢোলপাতা, লোয়ারি, কেশুটি, কন্টিকরি, শতমূলী, স্বর্ণলতা, তেলাকুচা, মাকাল, বিছুটি, বন কলমি, ঈশ্বরমূল, বেনা, গন্ধমূলের গাছ চিনতে পারে পপীপ। বাসুখুড়ো বলেছিল মানুষ ধরিত্রি থেকে ততদিন নিশ্চিহ্ন হবে না, যতদিন মাটির বুকে থাকবে উদ্ভিদের বরাভয়। উদ্ভিদ না থাকলে মানুষও থাকবে না। বৃক্ষ তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষকে চেনা মানে জীবনের অবলম্বনকে চেনা। তাই তাকে সাথে নিয়ে সেই ছোট্ট বয়স থেকে গাছ-লতা চেনাতে বেরিয়ে পড়ত বাসুখুড়ো।

হঠাৎ পায়ে সুড়সুড়ি। চমকে নিচের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে পপীপ। একটা কাঠবিড়ালি তার পায়ের উপর দিয়ে পথ পেরিয়ে আরেকদিকে ছুটে যাচ্ছে লেজ তুলে। কাঠবিড়ালিরা অকারণেই তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে বেড়ায়। একদণ্ড চুপ করে থাকলেই যেন তাদের মহাক্ষতি হয়ে যাবে। হাসিমুখে কাঠবিড়ালির দিকে আরেকবার তাকায় পপীপ। একটা ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখা গেল তার লেজের শেষপ্রান্তটুকু।

এবার ফেরার পথ ধরে পপীপ। ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে আলপথের মতো অস্পষ্ট পথ। জঙ্গলের পশু-পাখির চলাচলেই মূলত সৃষ্টি এইসব পথের। মানুষ বোধহয় তেমন একটা আসে না এদিকে। সেই অস্পষ্ট পথরেখা ধরে চলতে চলতে পপীপ একসময় বুঝতেই পারেনি সে অনেকটা ঘুরপথে চলে এসেছে। যে পথ দিয়ে সে এখানে এসেছিল, এই পথ সেই পথ নয়। বোঝা গেল যখন সে হঠাৎ তার সামনে দেখতে পেল অনেকখানি উঁচু একটা পুকুরের পাড়। আগে তো সে কোনো পুকুর দেখেনি! তার মানে সে ভুলপথে চলে এসেছে। হড়জনের বাড়ির ডোয়ারে সবচাইতে উঁচু পোয়ালের ঠিকা দেখে চিহ্ন ঠিক রেখেছে পপীপ। এবার মনে পড়ে ঠিকাটা তার বাম দিকে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সেটি আছে এখন তার ডান দিকে। তার মনে হলো পুকুরটিকে অর্ধেক পরিভ্রমণ করলে সে ঠিক পথটিতে পৌঁছুতে পারবে। সে উঠে পড়ে শক্ত মাটি দিয়ে বাঁধানো পুকুরের উঁচু পাড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় বজ্রাহত বৃক্ষের মতো।

তার থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাত ডাইনে পুকুরের জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে গা ডলছে কুরমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে গোপনে কোনো স্নানরতা নারীকে দেখা স্পষ্টতই অন্যায়। বাসুখুড়োর শিক্ষা যে রুচি তৈরি করে দিয়েছে পপীপের মনে, সেই রুচি-বিবেক তাকে বলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু নিজেকে সেখান থেকে সরাতে পারে না পপীপ কিছুতেই। তার পা যেন গেঁথে গেছে পুকুর-পাড়ের নরম মাটিতে। সে যেন সামনে কোনো জলপরীকে দেখছে! সে নড়তে ভুলে যায়। কিন্তু তার নিশ্বাস এত জোরে বইতে শুরু করে যে মনে হয় এত দূর থেকেও কুরমি তার নিশ্বাসের শব্দ ঠিকই শুনতে পাবে। তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিছুক্ষণ পরে কুরমি হঠাৎ-ই ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় পপীপের দিকে। সে পপীপকে দেখে একটুও চমকায় না, থমকায় না। যেন সে জানত ঘাড় ফিরিয়ে সে পপীপকেই দেখতে পাবে। সে নিজের বুক থেকে খসে পড়া কাপড়ের প্রান্তটি আলতোভাবে তুলে দেয় কাঁধে। তারপর তার জলপরীর মতো শারীরিক বৈভব নিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পপীপের দিকে। তার চোখে কোনো ধিক্কার নেই, কোনো অনুরাগ নেই, এমনকি কোনো ভাষাই নেই। পপীপ ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায় সেই দৃষ্টির সামনে। সে চলে যাওয়ার জন্য নিজেকে ঘুরিয়ে নেয় কুরমির দিক থেকে। অনিচ্ছুক পা-কে বাধ্য করে সচল হতে। তখনই শুনতে পায় সে কুরমির আহ্বান– পপীপ!

পপীপ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পায় কুরমির দুই চোখ থেকে অবিরল জল নামতে শুরু করেছে। সেই জল মিশে যাচ্ছে পুকুরের জলে।

পপীপ একপা একপা করে এগিয়ে আসে কুরমির দিকে। জলের কিনারে এসে থমকে দাঁড়ায়। তখন কুরমি তার দিকে আহ্বানের লীলায়িত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দেয় দুই হাত।

পপীপ জলে নামে। জল ভেঙে এগিয়ে যায় কুরমির কাছে। কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গনে নেয়। তাদের দুজনের দোলায়িত শরীরের কম্পনে একের এক অনিয়মিত ঢেউ উঠতে থাকে পুকুরের জলে। পপীপ চেটে খায় কুরমির চোখ থেকে ঝরা নোনাজল। তারপর চুমু খায় কুরমির চোখে। তার ঠোঁট নামতে নামতে একসময় আশ্রয় পায় কুরমির অপেক্ষমান ওষ্ঠে। এবার পপীপ পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কুরমিকে। তুলে আনে জল থেকে। তারপর শুইয়ে দেয় ঘাসের শয্যায়।

০৬. আবার পথে...

ঘনরসময়ী গভীর বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(গঙ্গা ও বঙ্গালবাণী দুটিই প্রগাঢ় রসময়, গভীর, সুন্দরগতিভঙ্গিময় এবং কবিদের উপজীব্য। দুটিতেই অবগাহন করলে পুণ্য হয়।)

বাসুখুড়োর শেখানো শ্লোক বলতে বলতে পথে নামে পপীপ। পথে নেমে দেখা যায় এবার তার সাথীর কোনো অভাব নেই। এত নির্ভয়ে কতদিন পথ চলতে পারেনি সে! দাসজীবনে ছিল পদে পদে দাসপ্রভু এবং তার অনুচরদের বিধি-নিষেধ। আর পালিয়ে আসার সময়টুকু তো তার জীবনের সবচাইতে দীর্ঘতম কয়েকটি দিন। এখন নির্ভার মনে দেদ্দাপুরের দিকে অগ্রসর হবার সময় তার পায়ে যেন ভর করেছে প্রজাপতির ডানার মতো হালকা ছন্দ। আসার সময় কুরমি তাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছে। মানকু এখন তার কাছে অতীত স্মৃতি। ভালোবাসা এসেছে আজ। সেখানে রীতির বন্ধন আপনাতেই শিথিল হয়ে গেছে। কুরমি কথা দিয়েছে সে পপীপের জন্য অপেক্ষা করবে। এবং সেই অপেক্ষার কোনো সময়-সীমা বেঁধে দেয়নি সে। জানে পপীপের কাজটি কত গুরুত্বপূর্ণ। তার সফলতার জন্য সে কট্টলির কাছে প্রার্থনা করবে প্রতিদিন। হাম্‌মা-হাম্‌মির বংশধর তারা। তার বংশের উঁচু সম্মান রক্ষার জন্য কৈবর্তজাতি যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সেই সংগ্রামে কুরমি কেন পিছিয়ে থাকবে! এই যুদ্ধ কী আমারও যুদ্ধ লয়!

পথে পথে নতুন লোকের সাথে দেখা। কোনো তমালিকার ছায়ায় দু'দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া। তারপর আবার পথচলা। চলতে চলতে দেখা হয়ে গেল অদ্ভুত-দর্শন এক লোকের সাথে। শীর্ণকায় কঙ্কালসার দেহ। মাথায় কুণ্ডলী করা দীর্ঘ কেশ। নাভিমূল পর্যন্ত নেমে আসা অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি। কান লম্বা এবং সেই কানে লম্বালম্বিভাবে কাটা একটা দাগ। গলায় হাড়ের মালা। উপবীতের মতো যোগপট্ট। কোমরে কপনি। কাঁধে ঝোলা, হাতে দ্বাদশী (লাঠি)। নিশ্চিতভাবেই লোকটি বৃদ্ধ। কিন্তু তার চলাফেরায় বার্ধক্যের জড়তার কোনো চিহ্ন নেই। তার চোখের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো হোঁচট খায় পপীপ। এত নিস্পৃহ উদাসীন হতে পারে কোনো মানুষের চোখ! চারপাশের পৃথিবীর কোলাহল, পায়ের নিচের পথ, মাথার উপরের সূর্য, পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া পথিকের কৌতূহলী দৃষ্টি– কোনোকিছুই যেন স্পর্শ করছে না তাকে। চোখ দেখলে মনে হয় এই পৃথিবীর কোনো কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না; মনে হয় সে এই পৃথিবীর মানুষই নয়। লোকটি কি যোগী?

উত্তর পেতে হলে কথা বলতে হবে তার সাথে। কিন্তু পপীপ সেধে কথা বলতে গিয়েও বিফল হয়েছে। কারো সাথে বাক্যালাপে কোনো আগ্রহ নেই লোকটার। কিন্তু তার সঙ্গ ত্যাগ করতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছে না পপীপের। কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি যেন রহস্য আছে লোকটার মধ্যে! সেই রহস্যের টানে কিছুতেই তার সাথে থাকার লোভ সম্বরণ করতে পারছে না পপীপ। নাছোড় হয়ে সে লেগে থাকে যোগীর সঙ্গে সঙ্গে। তার আগ্রহ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে যোগীর। ঈষৎ বিরক্তি নিয়ে তাকায় লোকটি তার দিকে। জিজ্ঞেস করে– তুই কেনে আমার পেছু পেছু আসছিস?

পপীপের কী হয়, হঠাৎ সে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে লোকটিকে।

এবার স্পষ্ট বিরক্তি ঝরে পড়ে লোকটির কণ্ঠে– এসব ভণ্ডামি ছাড়! কী চাস তা-ই বল বটি!

আপনার মধ্যে আমার গুরুর ছায়া।

কে তোর গুরু?

আমার গুরু বাসু।

এবার তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় যোগী– বাসু যার গুরু তার আর অন্যের কাছে আসার দরকার কী?

পপীপ হাতজোড় করে বলে– আমি অক্ষম শিষ্য। সবকিছু নিতে পারার আগেই গুরু দেহ রেখেছেন।

তুই সংস্কৃত জানা মানুষের মতোন কথা বলছিস কেনে?

গুরু বলেছিলেন সংস্কৃত জানা মানুষদের সাথে জ্ঞানযুদ্ধ করতে হলে ওদের অস্ত্রেই ওদের পরাজিত করতে হবে। তাই সংস্কৃত শিখিয়েছেন।

নরম হয়ে আসে যোগীর দৃষ্টি। বলে– কী জানতে চাস?

ব্রাহ্মণরা যে সব সময় নিজেদের জন্য উপরের অবস্থান দাবি করে তার কি কোনো ভিত্তি আছে? যদি না থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কে সত্য কথাটি আমাকে বলুন।

যোগী এবার শ্লোক আওড়ায়–

ব্রহ্মণেহি ম জানন্ত হি (ভেউ)
এমই পটিঅউ এ চউবেউ।...
কজ্জেঁ বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ
অক্খি ডহাবিঅ কড়ুএঁ ধূমেঁ।
একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁ বেসে
বিণুআ হোইঅই হংস উএসেঁ।
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুলেঁ
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুলেঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্রাহ্মণেরা অধ্যাত্মরহস্য জানে না, শুধু শুধুই তারা চতুর্বেদ পড়ে।... কাজকর্ম নেই। শুধু অগ্নিতে হোম করে করে তীব্র ধোঁয়ায় চোখের যন্ত্রণা পায়। একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী, ভগবদ্‌বেশ ধারণ করে জ্ঞানী সাজে, পরমহংস উপদেশ করে। মিথ্যায় জগৎ (এইভাবে) ভুলের পথে পরিচালিত হচ্ছে। (তারা) জানে না যে ধর্ম ও অধর্ম তুল্যমূল্য।'

শ্লোকের ভাষা শুনে চমৎকৃত হয় পপীপ। সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে নিজেদের মুখের ভাষার কাছাকাছি শব্দ দিয়েও যে শ্লোক তৈরি করা যায় তা আগে জানা ছিল না পপীপের। সে মনে মনে স্থির করে, এখন থেকে সে-ও এইরকম ভাষাতে শ্লোক রচনা করবে। এবার বৌদ্ধ-জৈনদের সম্পর্কে যোগীর সিদ্ধান্ত জানতে চায় সে। যোগী আবার শ্লোক আউড়ে চলে–

চেলু ভিক্খু জে থবির উদেসেঁ
বন্দেহিঁ অপব্বজিউ বেসেঁ।
কোই সুতন্ত বক্খাণ বইটঠো...
জই ণগ্‌গাবিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ
লোমুপ্‌পাড়ণেঁ অথি সিদ্ধি তা জুবই-নিঅম্বহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্‌ঠ মোক্খ মহু কিম্পি ণ ভাই
তত্তরহিঅ কা আণ তাব পর কেবর সাহই।

'চেলা, ভিক্ষু, স্থবির উপবিষ্ট যারা এবং অপ্রব্রজিতের বেশ ধরে যারা বন্দিত হয় (তাদের) কেউ কেউ সূত্রান্ত ব্যাখ্যায় নিরত। কেউ আবার চিন্তা করতে করতে শুকিয়ে যায়। যদি নগ্ন হলে মুক্তি হয়, তবে কুকুর-শিয়ালের তা হয়েছে। লোম-উৎপাটনে যদি সিদ্ধি হয় তবে তা যুবতী-নিতম্বের হয়েছে। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলে যদি মুক্তি হয় তবে হাতি-ঘোড়ার (মুক্তি) হয়েছে।'

শ্লোক শুনে হেসে ফেলে পপীপ। তার হাসি দেখে যোগীর মুখেও খেলে যায় সামান্য সকৌতুক হাসির রেখা। মুখে বলে– কৈবর্ত জাতির মুক্তি তার নিজের ধর্মে। আর্যের ধর্মে তার মুক্তি নেই। বুদ্ধের ধর্মেও তার গতি নেই। তুই এবার যা। তোর কাজ আলাদা, তোর পথ আলাদা।

তাকে রেখে যোগী হাঁটতে থাকে। পপীপ পেছন থেকে কাতরস্বরে বলে– গুরু আপনার পরিচয়টি অন্তত আমাকে জানান! আমি কী নামে আপনাকে স্মরণ করব?

একটুও শ্লথ হয় না যোগীর গতি। একবারও তাকায় না পেছনে ফিরে। চলতে চলতেই বাতাসে ভাসিয়ে দেয় একটি শব্দ– তিলোঁ।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে পপীপ। এই সেই মহান কবি তিলোঁ! তার কী সৌভাগ্য! এই মহান কবি তাকে নিজ মুখে নিজের রচিত শ্লোক শুনিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসুখুড়ো বলেছিল, এখানকার ভূমিপুত্ররা একদিন ঠিক ঠিক নিজের ভাষায় রচনা করবে নিজেদের শ্লোক, নিজেদের জ্ঞান লিখে রাখবে নিজেদের ভাষায়। সেই কাজ সবচেয়ে এগিয়ে নিচ্ছে যে কবি, তার নাম তিলো। কিন্তু কাজ এখনো অনেক বাকি। সবকিছুর জন্য চাই নিজেদের বর্ণমালা। সেই কাজে নিজেদের সঁপে দিতে হবে সব লেখাপড়া জানা ভূমিপুত্রদের। যদি নিজেদের স্বাধীনতা থাকে, নিজেদের কট্টলি নিজেদের হাতে থাকে, তবে সেই কাজ সম্ভব হবে সহজে। তাই যে কোনো মূল্যে ধরে রাখতে হবে বরেন্দির স্বাধীনতা। সবকিছু নিয়ে এই যুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ভীমের পাশে।

আনমনে পথ চলছে পপীপ। পথ যত গড়াচ্ছে তার মধ্যে আবেগ তত ঘন হয়ে আসছে। মন বলছে আর বেশি দূরে নেই তার গ্রামটি। কিন্তু তা যে এতটা কাছে, সেটি ভাবতে পারেনি পপীপ। হঠাৎ একটা লালমাটির টিলার ওপরে উঠে অস্থির হয়ে উঠল তার বুকের ভেতরটা। টিলা থেকে দেখা যাচ্ছে লালমাটির পথ সোজা নেমে গেছে গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের ঝুপড়িগুলি অন্য কৈবর্তগ্রামের মতোই। কিন্তু এখানে কী যেন একটি বিশেষত্ব আছে! পপীপ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিক-ওদিক তাকায়। এই মানসিক অস্থিরতার হেতু খোঁজার চেষ্টা করে। আশপাশে তাকিয়ে মানুষ খোঁজে এই জায়গার সুলুক-সন্ধান জানার জন্য। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না আশপাশে। কোনো বয়স্ক পুরুষ মানুষ নেই, কোনো নারী নেই, এমনকি গাঁয়ের সামনের খোলা মাঠ কিংবা লাল ধুলোর রাস্তায় কোনো শিশু পর্যন্ত নেই। কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে পুরো গ্রামটিকে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে গাঁওদেব-গাঁওদেবীর থানের পাশে তো কেউ না কেউ সবসময়ই থাকে। সেই কামরূপেও যে কোনো গাঁয়ে ঢোকার মুখে একটা না একটা সর্বজনীন মণ্ডপ তার চোখে পড়েছে সবসময়। মানুষের বসতি মানেই সেখানে প্রাণের সাড়া। কিন্তু এই গ্রামে কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন! জানতে হলে তাকে এখন গ্রামেই ঢুকতে হবে খোঁজ নেবার জন্য। এক পা সামনে বাড়ায় পপীপ। তারপর অকস্মাৎ-ই যেন তার মনের চোখে জ্বলে ওঠে এক অপার্থিব আলো। কেউ বলেনি। বলার মতো কেউ তার আশপাশে নেই-ও। কিন্তু তার নিজের অন্তরাত্মা পপীপকে বলে দিয়েছে– এটাই তার দেদ্দাপুর! এই-ই তার জন্মমাটি! এই-ই তার মায়ের আবাস!

হঠাৎ-ই তার চোখের সামনে থেকে সরে যায় আঠারো বছরের একটি কালো পর্দা। নিজেকে সে দেখতে পায় আঠারো বছর আগের সেই সকালটিতে। তাকে একহাত ধরে টানছে দুই রাজপুরুষ। একপাশে ভিড় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ নিশ্চেষ্ট বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে গাঁয়ের মানুষ। কিশোর পপীপের আরেক হাত ধরে টানছে তার মা। মা তার বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে পশুর মতো আর্ত শব্দ তুলে। কোনো অর্থ উদ্ধার করা যায় না সেইসব শব্দের। কিন্তু যে শোনে, তারই বুকের রক্তনালিগুলো ছিঁড়ে যেতে চায় সেই শব্দের তীব্র আর্ততায়। মায়ের আরেকটি হাত একবার চাপড়াচ্ছে নিজের বুক, আরেকবার আক্ষেপে আছড়ে পড়ছে লালমাটির গায়ে। পপীপ পুরো দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পায় এখানে দাঁড়িয়ে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে আঠারো বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটির খুঁটিনাটি। নিজের সেই সময়ের অসহায় মুখচ্ছবিটাও স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়ে অসহায় বুক চাপড়াতে থাকা মায়ের মুখটি দেখতে চায় ভালো করে। কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায় না কিছুতেই। কারণ ইতোমধ্যেই তার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে অঝোর বৃষ্টির মতো নেমে এসেছে চোখের জলের ধারা।

০৭. মায়ের কাছে ফেরা

কিন্তু কেউ নেই গাঁয়ে।

গোটা গ্রাম জুড়ে পোড়া ছাই। কোথাও স্তূপ হয়ে আছে ছাই। কোথাও সেগুলি রোদ-বৃষ্টিতে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে লাল মাটির ওপর ধূসর দাগ রেখে দিয়েছে। বোঝা যায় আগুন লেগেছিল গাঁয়ে। কিন্তু আগুনে সবটা পুড়ে শেষ হয়ে যায়নি। ঝুপড়ি ঘরগুলোর কোনো-কোনোটা এখনো কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে নিজের নিজের অবলম্বনের উপর ভর করে। কিন্তু তাদের সহনক্ষমতা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সামান্য বাতাসের ধাক্কাতেই নড়বড় করছে। বরেন্দির আর একটা চৈতালি ঘূর্ণি কি তারা পাড়ি দিতে পারবে? মনে হয়– পারবে না। কৈবর্ত-গ্রামে কেউ কোনোদিন দুয়ারে খিল এঁটে ঘুমায়নি। তাদের দরজা বাইরে থেকে কোনোদিন আটকানোর কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। তার প্রয়োজনও কেউ কোনোদিন বোঝেনি। কারো ঘর থেকে কোনোদিন কোনো জিনিস হারায়নি। চুরি করা কী জিনিস জানত না কৈবর্ত-কোচ-ভীল-শবর-নিষাদ জাতির কেউ। রাতে বা অন্য সময় কেবল দুয়ারের ঝাঁপটা ঠেলে দিত যাতে নিজেদের একান্ত রাতের জীবন অন্যের চোখে না পড়ে।

এখনো দেখা যাচ্ছে সবগুলি দুয়ার হাট করে খোলা। খুব মৃদু ঝাঁওয়াল এক দিক থেকে ঢুকে ঘরের আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় খোঁচ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাঁচ শব্দ তুলছে। গরম বাতাস কিংবা লালধুলো উড়ে এলে কৈবর্তদের গাঁয়ের কুকুরগুলো যে বিরক্তির শব্দ করত মাঝে মাঝে, তেমন শব্দটুকুও উঠছে না। কুকুরগুলোর কথা মনে আসতেই আবার স্বজন হারানোর বেদনা জেগে ওঠে পপীপের বুকে। গাঁয়ের কুকুর মানে গাঁয়েরই কুকুর। কোনো একবাড়ির নয়, কোনো একজনের নয়। গাঁয়ের সবাই সেগুলোর প্রভু। গাঁয়ের সবার সাথেই কুকুরগুলোর বন্ধুত্ব। যে যখন ডাকে, তার ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। যে শিশুই তাকে খেলতে ডাকে, তার সাথেই খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। যে দুয়ার থেকেই তার খাবার আসে, সেটাকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। কিন্তু পপীপের এখন মনে পড়ছে বিশেষ একটা কুকুরের কথা। তার গায়ের রংটাও মনে পড়ছে। মরচে রঙের লোমের সাথে কালো কালো ফুটকি। ফুটকিগুলো এত বড় যে মাঝে মাঝে সেগুলোকে ডোরাকাটা দাগ বলে মনে হতো। গাঁয়ের কোনো কোনো বুড়ো বলত, ওর বাপ নিশ্চয়ই কোনো বাঘই ছিল। চিতা বাঘ হোক আর মেছো বাঘ হোক, নিশ্চয়ই ওটা বাঘেরই বংশধর। সেই কুকুরটাই ছিল তার খেলার সাথী। আচ্ছা তাকে যখন রাজপুরুষরা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিল কুকুরটা? মনে মনে আঠারো বছর আগের দিনটিতে কুকুরটাকে খোঁজে পপীপ। না। তাকে আশপাশে দেখা যায় না। কোনো কুকুরকেই দেখা যায় না। তখন মনে পড়ে, সেই বাঘা কুকুরটার সাথে অন্য সব কুকুরগুলোকে তখন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল একটা ঝুপড়িতে। মোড়লের ওপর এইরকমই নির্দেশ ছিল। রাজপুরুষ বা রাজার কোনো লোক গাঁয়ে আসতে চাইলে দূর থেকে সংকেত দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলোকে আটকে রাখতে হবে কোনো-না-কোনো ঘরে। তা নাহলে কোনো কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই রাজপুরুষরা হাতের বর্শা দিয়ে পেট ফুটো করে ফেলত তার। সেইসঙ্গে গাঁয়ের মোড়লকেও শাস্তি পেতে হতো কুকুর ছেড়ে রাখার অপরাধে। মনে মনে ভাবে পপীপ, সেই বাঘাটা সেদিন ছাড়া থাকলে তার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে নিশ্চয়ই রাজপুরুষের পায়ের মাংস কামড়ে তুলে নিত। সেই কুকুরগুলো, বিশেষ করে বাঘাটার খোঁজে চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকায় পপীপ। তারপরেই মনে পড়ে আঠারো বছর বাঁচে না কোনো কুকুর। যদি এখন সে কোনো কুকুরকে দেখতেও পায়, তাহলে সেটি হবে হয়তো আগের কুকুরগুলোর বংশধর। সে রকম কোনো কুকুরের দেখা পেলেও এখন তার চলে। এই মুহূর্তে তার এখন কাউকে দেখতে পাওয়া দরকার। সে মানুষই হোক কিংবা তাদের পোষা কুকুর হোক কী ছাগল হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সরু সরু গলি ধরে এবাড়ি-সেবাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে পুরো গ্রামটি এক চক্কোর ঘুরে আসে। কিন্তু কয়েকটা ইঁদুর আর বনবিড়াল ছাড়া অন্য কোনো জনপ্রাণী দৃষ্টিপথে আসে না। আর গাঁয়ের পথটিও যেন দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার কারণে স্যাঁতলা-পরা চেহারা নিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় মুছেও গেছে পথের রেখা। সেই অস্পষ্ট পথরেখা ধরেও পপীপ তৃষ্ণার্ত চোখে ঘুরে বেড়ায় পুরো গ্রামের আনাচে-কানাচে। জনমনিষ্যির কোনো চিহ্ন না পেয়েও অদম্য আশা নিয়ে উঁকি দেয় সবগুলি ঘরের দরজায়। একবার বাতাসে স্বর মিলায় অনুচ্চে– মা! তারপর মাটির দিকে নুয়ে পড়ে ডাকে– মা! তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় চিৎকার করে ডাকে– মা! তারপর কণ্ঠের স্বর সর্বোচ্চে তুলে চিৎকার করে একই ভাবে ডেকে চলে সে– মা! মা! মা! জ্যোৎস্নার পাগল করা সৌন্দর্যে চাঁদে-পাওয়া কোনো কোনো কুকুর যেমন আকাশের দিকে মুখ তুলে অনবরত ডেকে ডেকে আকুল গোঙানি ছড়িয়ে দেয় বাতাসে, পপীপকে দেখতে এখন সেই রকম মনে হয়। কুকুরের অবিরাম চিৎকারের মধ্যে কোনো আশাবাদ থাকে কি না কেউ তা জানে না, কিন্তু পপীপ একটানা মা মা বলে ডেকে চললেও তার মন একটুখানি জায়গা খালি রেখেছে এই প্রত্যাশায় যে তার আকুল চিৎকারে কেউ একজন হয়তো পেছন থেকে এসে মমতার হাত রাখবে তার মাথায়।

কিন্তু অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়ে দেবার পরেও পপীপের অপেক্ষা নিষ্ফলাই থেকে যায়। একবার কানের পেছনের চুলগুলো দোল খেয়ে উঠলে তার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল কেউ বোধহয় সত্যি সত্যি হাত রেখেছে তার মাথার চুলে। কিন্তু ভুল আশাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। কারণ পপীপ অচিরেই বুঝে গেছে যে তার চুলে কোনো মানুষের মমতার হাত পড়েনি। যেটাকে সে মানুষের স্পর্শ বলে মনে করেছিল, সেটা ছিল বরেন্দির থাকবন্দি মাটির সোপান বেয়ে ছুটে আসা বাতাস। এখানে বাতাসকে বাধা দেবার মতো তেমন কোনো দেয়াল নেই। তাই একেবারে গ্রামের প্রবেশমুখের লালমাটি থেকে কোনো বাতাস এগুতে শুরু করলে সেটি তেমন কোনো বাধা ছাড়াই পুরো গ্রাম অতিক্রম করে যেতে পারবে।

কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদার পরে নিজেকে আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে পপীপ। কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই তার মাথা ছেড়ে যেতে চায় না। তা হচ্ছে এই গ্রাম এইভাবে পরিত্যক্ত এবং জনমানবশূন্য হলো কেন? কেমন করে? বিশেষ করে মহীপালের শাসনকালেও ভট্টবামন, তার রাজপুরুষের দল, তাদের অত্যাচার, মঠ-মন্দিরের সেবায়েতদের অত্যাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শোষণের মুখেও যে গ্রামের মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, সেই গ্রাম এখন এই কৈবর্ত-স্বাধীনতার কালে পরিত্যক্ত হলো কেমন করে?

কে দেবে উত্তর?

কিন্তু পরিপূর্ণ উত্তর না জেনে পপীপ এখান থেকে একধাপও নড়তে সম্মত নয়।

সে আবার পুরো গ্রাম ঘুরে আসে। তারপর প্রত্যেক ঝুপড়িতে ঢুকতে থাকে। তন্ন তন্ন করে খোঁজে। ঠিক কী খুঁজছে জানে না। কিন্তু খুঁজছে। একটা কোনো চিহ্ন। একটা কোনো সূত্র। প্রত্যেক ঝুপড়ি ভালো করে খুঁজে দেখার পরে পপীপ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় গ্রামের প্রবেশমুখের টিলার ওপর। এখান থেকে নিচের সমতল উপত্যকায় গড়ে ওঠা পুরো গ্রামটিকে দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে পপীপ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার জন্মগ্রামের দিকে। মাথার ওপর সূর্য আগুন ঢালছে অবিরাম। কিন্তু পপীপ তবু ঠাঁইনাড়া হয় না। ছায়া খোঁজার জন্য অন্য কোথাও যায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। পেটের নাড়িগুলো এলোমেলো মোচড়ানি দিয়ে জানান দেয় যে তাদের এখন খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু পপীপ উপেক্ষা করে চলে শরীরের সব দাবিকে। সে যেন অদৃশ্য কোনো এক সত্তার সাথে দ্বৈরথে নেমেছে। হয় সে তার উদ্দিষ্ট প্রিয়জনের সংবাদ জানবে, নয়তো এই অবস্থানে অনড় থেকে প্রয়োজনে দেহত্যাগ করবে। এতক্ষণ হাহাকারের অনুভূতিটাই প্রধান ছিল। এবার তার সাথে যোগ হয় অদ্ভুত এক অবুঝ অভিমান। অভিমান– মা কেন তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে এভাবে হারিয়ে গেল! অভিমান– সে মৃত্যুপথের মতো দুর্গম এতগুলি বাধা অতিক্রম করে এসেও কেন মায়ের দেখা পেল না!

সন্ধ্যা নামা টেরই পায়নি পপীপ। নিজের ছায়া এবং নিজের শরীর যে অন্ধকারে ঢেকে গেছে তা-ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু সচকিত হয়ে ওঠে দূরে আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখে।

ওদের গ্রাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে বনের সীমানা। আগুন দেখা যাচ্ছে সেদিকেই। আগুন দেখামাত্র নিজের মনের মধ্যে আবার আশার আলো জ্বলে উঠেছে পপীপের। আগুন মানেই তার পাশে মানুষ আছে। আর গ্রামের এই প্রান্তসীমায় আগুন মানেই হয়তো এমন কোনো মানুষ আছে সেই আগুনের পাশে, যে এই গ্রামেরই মানুষ। অথবা এই গ্রামের লোকজনের সংবাদ-বৃত্তান্ত তাদের জানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপ টিলা থেকে নেমে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে। পায়ের নিচে গর্ত থাকতে পারে। এবরোথেবরো মাটি। যে কোনো সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া এবং আহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু পপীপ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সচেতন নয়। সে ঐ আগুনটিকে ধ্রুব লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। সঙ্গে কোনো আলো নেই। আত্মরক্ষার মতো কোনো অস্ত্র তো দূরের কথা। তবু ভয়ের কোনো অনুভূতি ছাড়াই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে পপীপ। পায়ের নিচে বিষধর সাপ পড়তে পারে, ভালুক এসে পথ আটকে আক্রমণ শানাতে পারে, বুনো মোষের দল এসে শিং-এর এক আঘাতে ফেঁড়ে ফেলতে পারে তার বুক-পেট। কিন্তু সেসব কথা মনেই আসে না পপীপের। সে হেঁটে চলেছে আগুনের দিকে। অন্ধকারে মাঝে মাঝে ধাক্কা খাচ্ছে গাছের সঙ্গে। পা হড়কে যাচ্ছে পিছল বুনো শ্যাওলায়। উঁচু-নিচু বনপথ। বার তিনেক গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ। হাত-পা বা শরীরের কোনো অংশ কেটে-ছড়ে গেছে কি না সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে আবার আগুনের শিখাটিকে লক্ষ্য ধরে চলতে শুরু করেছে।

আক্রমণ আসে অতর্কিতেই। তখন কেবল পপীপের মনে হতে শুরু করেছে যে সে আগুনের উৎস থেকে এখন আর বেশি দূরে নেই। হঠাৎ তার শরীরকে আপাদমস্তক জড়িয়ে ধরে ভারি একটা কিছু। পপীপ প্রথমে ভাবে কোনো অজগর সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, অজগর পেঁচিয়ে ধরলে তো তারা শরীরকে এইভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলতে পারবে না! হাত দিয়ে নিজেকে বেষ্টন করে ফেলা জিনিসটির প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করে পপীপ। তখন বুঝতে পারে, অজগর সাপ নয়, আসলে তার আপাদমস্তক আচ্ছাদন করে ফেলা হয়েছে জাল দিয়ে। নারকেলের দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে শক্ত করে বানানো জাল। এটা দিয়ে বাঘ ধরা হয়। বনের রাজা বাঘও এই জালে আটকা পড়লে পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়ে। যত আছাড়ি-পাছাড়ি করে তত আটকে যায় জালের কঠিন বাঁধনে। পপীপ নিজে কোনোদিন এই রকম পরিস্থিতিতে পড়েনি। দেখেও-নি কখনো। তবে গল্প শুনেছে অনেক। শোনা অভিজ্ঞতাকেও বুদ্ধিমানরা একসময় নিজেদের অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে পারে। পপীপ সেই শোনা জ্ঞানকে কাজে লাগায় এখন। সে কোনো টানা-হ্যাঁচড়ার চেষ্টা করে না। জানে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এসে তাকে মুক্ত না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফাঁদ থেকে বেরুনোর কোনো উপায় নেই। পপীপ জানে না সে ঠিক কোন ধরনের শত্রুর হাতে পড়েছে। কিন্তু এখন তো আর তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। কেউ এসে তার শরীর থেকে জালের ফাঁদ খুলে না নেওয়া পর্যন্ত তাকে এইভাবেই অপেক্ষা করতে হবে। সেই অপেক্ষা যে কতক্ষণের হবে কে জানে! এমনও হতে পারে, সারাটা রাতই হয়তো তাকে এইভাবে জালবন্দি হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে হবে। পপীপ মনে মনে প্রার্থনা করে, যে-ই তাকে জালবন্দি করে থাকুক, তারা যেন তাড়াতাড়ি আসে। তারপর তার ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে!

পপীপের সৌভাগ্য যে বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। পাশেই কারো কারো নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যায়। কোনো বন্যজন্তু নয়। এই নড়াচড়া মানুষের। বনের মধ্যে বন্যজন্তু এবং মানুষের নড়াচড়ার পার্থক্য খুব সহজেই বোঝা যায়। কেউ একজন খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে পপীপের। কথা বলছে না। কিন্তু লোকটা যে উত্তেজিত তা তার ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের শব্দেই বোঝা যাচ্ছে। নিজের ওপর এখন রাগ হচ্ছে পপীপের। অন্যমনস্কতার কারণে এখন এই ফাঁদে পা দিতে হয়েছে তাকে। কে জানে কাদের পাতা ফাঁদে পড়েছে সে! কৈবর্ত বা অন্য কোনো ভূমিপুত্রদের দল যদি তাকে জালবন্দি করে থাকে, তাহলে হয়তো এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যেতে পারে। আর যদি রামপালের আর্য-দস্যুদের হাতে পড়ে থাকে, তাহলে আজ তার মৃত্যু অনিবার্য। একটু পরেই পাথরে পাথর ঠোকার শব্দ ওঠে। চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালায় কেউ একজন। তারপরই দপ করে জ্বলে ওঠে একটা মশাল। মশাল হাতে ধরা লোকটা পপীপের দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল– পেয়েছি বটি! আজ শিকার একটা পেয়েছি।

তার পাশে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন। তার দিকে তাকিয়ে গর্বের সুরে বলে মশালধরা লোকটা– দেখেছিস মোর জাল ছোঁড়া কী অব্যর্থ! অন্ধকারেও ঠিক আটকে ফেলেছি একেবারে!

অপরজন কথা না বলে আরও এগিয়ে আসে পপীপের কাছে। তার হাতে ছোট ছোট দড়ির টুকরা। সে এসে কথা নাই বার্তা নাই রামধাক্কা লাগায় পপীপকে। এমনিতেই জাল জড়ানো অবস্থায় টলমল করছিল পপীপ। এবার ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যায় বনের মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন বেঁধে ফেলে পপীপের দুই পা, আরেকজন বাঁধে দুই হাত। তারপর চ্যাংদোলা করে তাকে নিয়ে চলে সেই আগুনের দিকে, যে আগুনটিকেই লক্ষ্যবস্তু রূপে নির্ধারণ করে গোঁয়ারের মতো কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বনপথে ঢুকে পড়েছিল পপীপ। এখন এই অবস্থাতেও মনে মনে হাসে সে। যেখানে যেতে চেয়েছিল সেখানেই তো সে যাচ্ছে। শুধু যেভাবে যাচ্ছিল সেইভাবে যাওয়া হচ্ছে না এই যা পার্থক্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুনের কাছে পৌঁছে দেখা গেল সেটা আসলে বড় একটা উনুনের আগুন। রান্না হচ্ছে। অনেক মানুষের সাড়া পাওয়া গেল আগুনকে ঘিরে। ধপাস করে পপীপকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তাকে বয়ে আনা লোক দুজন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শোরগোল। পপীপকে বেঁধে আনা লোক দুজন খুব গর্বের সাথে নিজেদের কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছে সঙ্গীদের কাছে– একটা খোল ধরে এনেছি বটি। পেছন থেকে মোদের ঘাটির দিকে গুড়ি গুড়ি আসছিল বনপথ দিয়ে।

চারপাশে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বেশ কয়েকজন লোক। আগুনের আভা এবং আলোতে তাদের অবয়ব পরিষ্কার দেখতে পেয়ে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে পপীপ। ওরা সবাই কৈবর্ত বলেই মনে হচ্ছে। তাকে ঘিরে বৃত্ত বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। পেছন থেকে এগিয়ে আসে আরেকজন। সাধারণ কৈবর্তদের তুলনায় সে এক মাথা বেশি উঁচু। তাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে পপীপ। এবং তারপর নিজের অজান্তেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে– মল্লকাকা!

লম্বা সুদেহী মানুষটা আরও কাছে এগিয়ে আসে। আলো-আঁধারির মধ্যেও চোখ টানটান করে দৃষ্টিতে আরও তীক্ষ্ণতা এনে চিনবার চেষ্টা করে মাটিতে ফেলে রাখা বন্দিকে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারে না। অনিশ্চিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– কে বটি তুই?

মল্লকাকা আমি পপীপ।

পপীপ? কোন পপীপ?

বট্যপের ব্যাটা পপীপ। সেই যে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেত! আমি তোমার শিষ্য পপীপ। সেই যে আমাকে তুমি অক্ষর শিখিয়েছিলে? পরে রেখে এসেছিলে ঊর্ণাবতীর কাছে।

শশব্যস্তে এগিয়ে আসে মল্ল। হাঁক ছাড়ে সঙ্গীদের লক্ষ করে– এই শিগগির খুলে দে ওর বাঁধন!

হাত-পায়ের বাঁধন, আর আচ্ছাদিত করে রাখা জাল খুলে নেওয়ার পরে নিজের শক্তিতেই উঠে দাঁড়ায় পপীপ। যারা ওর হাত-পা বেঁধেছিল, তারা যে খুব দক্ষ এই কাজে, তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে পপীপ। এতই জোরে বাঁধা হয়েছিল তাকে যে এখন বাঁধন খুলে দেবার পরে মনে হচ্ছে তার চামড়া ভেদ করে মাংস কেটে বসে গিয়েছিল নারকেলের দড়ি। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন হঠাৎ করে রক্ত চলাচল বাড়তি বেগে শুরু হওয়ায় মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে হাত-পায়ে। কিন্তু সেই তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে সটান দাঁড়িয়ে থাকে পপীপ। শরীরের যন্ত্রণার চাইতে মনের খুশির জোর এখন অনেক বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সামনে এসে দাঁড়ায় মল্ল। একপাশে টেনে নিয়ে আগুনের আলোতে এমনভাবে দাঁড় করায় পপীপকে যেন পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায় তার মুখমণ্ডল। দুই হাতে কাঁধে চাপ দিয়ে পপীপের মুখটাকে নিজের চোখের সোজাসুজি করে নেয় মল্ল। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে পপীপের মুখ। সাত বছরের শিশুর মুখকে কী আর আঠারো বছর পরে চিনতে পারা যায়! কিন্তু তবুও মল্ল দেখছে তো দেখছেই। বোঝা যায়, পপীপের কথা শুনে তার মন থেকে পপীপের পরিচয় নিয়ে সমস্ত সংশয় আগেই দূর হয়ে গেছে তার। সে আসলে এখন পরিমাপ করছে যুবক পপীপের শারীরিক-গাঠনিক যোগ্যতাকে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার পরে তার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে ওঠে। মুখে বলে– যাক! লেখাপড়া শিখে ব্রাহ্মণদের মতো পলকা হয়ে যাসনি তাহলে! কৈবর্তের রক্ত বইছে তো শরীরে। সেই তেজের চিহ্ন থাকবেই। আর সেই তেজের ঝলকানিও দেখা যাবে সময় এলেই।

এতক্ষণে আলিঙ্গন করে সে পপীপকে। এইবার পপীপের মনে হলো আঠারো বছর আগে যে বুকটা তার কাছে বরাভয় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই বুকের স্পর্শই সে ফিরে পেয়েছে আবার। তাকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে যায় মল্ল। প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে আবার পপীপকে দেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। বিড়বিড় করে বলে– হ্যাঁ। আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনটি হয়েই তুই বেড়ে উঠেছিস বটি! তা আমাকে তুই চিনতে পারলি কেমন করে? এত বছর বাদে কীভাবে ঠিক ঠিক চিনে নিলি আমাকে?

হাসে পপীপ– মল্ল কৈবর্তকে যে একবার দেখে, সে কী তাকে কখনো ভুলতে পারে! তুমি হুবহু আগের মতোই আছো মল্লকাকা।

দূর তা কি করে হয়? এতগুলান বছর পার হয়ে গেছে। তুই সেই শিশু পপীপ– এখন পুরো যুবক হয়ে গেছিস। তাহলে আমি কি আর বুড়ো হইনি? হুবহু আগের মতো থাকি কেমন করে!

সত্যি বলছি মল্লকাকা তুমি এক ফোঁটাও বদলাও নি!

আচ্ছা আচ্ছা এসব কথা পরে শোনা যাবে বটি। আগে তুই একটু জিরিয়ে নিয়ে চারটে মুখে দে। তারপরে কথা হবে।

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে মল্ল– হা করে তাকিয়ে দেখছ কী? এ হচ্ছে মোর শিষ্য মোর পুত্র পপীপ। খাঁটি কৈবর্ত। সেই প্রাগজোতিষ-কামরূপ থেকে ও এসেছে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবে বলে। আর সবচেয়ে কাজের যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসেছে ছেলে আমার। যাও, ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপকে পাশে নিয়ে টিলার ওপরে বসে মল্ল। রাত নেমেছে বরেন্দিজুড়ে। ওদের গায়ে যে বাতাস এসে বাড়ি খাচ্ছে সেটাকে একটু ভেজা ভেজা মনে হয়। মনে হচ্ছে শোনিত নদীর জল মেখে বইছে বাতাস। দূরে অন্ধকার কোথাও একটু বেশি গাঢ়। সেসব জায়গাতে ঝোপগুলো বেশি ঘন। অনেক দূরে কিছু আলো দেখা যাচ্ছে। দেদ্দাপুরের কথা, বিশেষ করে মায়ের কথা জানার জন্য ভেতরে ভেতরে আকুল হয়ে উঠেছে পপীপ। মল্লকে আগেই জিজ্ঞেস করেছে সেকথা। মল্ল তাকে আশ্বস্ত করেছে– আগে টুকুন জিরিয়ে নে। খাওয়া সারা হোক। তারপর তোকে সব কথা জানাব।

এখন বিশ্রাম এবং খাওয়ার পরে এই টিলার ওপর বসে আর তর সইছে না পপীপের। কাকা বলো আমার মা কোথায়? দেদ্দাপুরের সব মানুষ চলে গেছে কোথায়? গ্রামটা এমন খাঁ খাঁ হয়ে গেল কেন?

উত্তর দেবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে মল্ল। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে বলবার কথাগুলো। একবার মনে হলো কথা শুরু করবে। কিন্তু শুরু করে না। তার পরিবর্তে সস্নেহে হাত বুলায় পপীপের পিঠে। অপেক্ষা করে পপীপ। কিন্তু মল্লকাকা তার পিঠে হাত বুলিয়েই চলছে। যখন মনে হলো ভেতরের উদগ্রীবতাকে আর ধরে রাখতে পারছে না পপীপ, যখন মনে হলো সে এবার কেঁদে পা জড়িয়ে ধরে মল্লকে বলবে– 'কাকা বলো আমাকে! আর দেরি সহ্য করতে পারছি না!' তখন কথা বলতে শুরু করে মল্ল– এই যে যেখানে আমরা বসে আছি, তার সামনে আছে একটা ছোট বন। সেই বনের শেষে একটা ছোট জলের ছরা আর খাল। সেই পর্যন্তই বরেন্দির সীমানা। তার ঠিক পরেই যে জায়গাটি আছে, তার নাম নিদ্রাবলী।

সেটি মোদের বরেন্দি লয়?

পাল রাজাদের আমলে সেটি ছিল পুণ্ড্র-বরেন্দির সামন্ত রাজ্য। সেই সময় মোট এগারোটি সামন্ত রাজ্য ছিল জানিস বোধহয়?

না কাকা জানি না।

নিদ্রাবলী ছাড়াও বালবলভী, অপরমন্দার, কুজ্ঝটী, তৈলকম্প, উচ্ছাল, ঢেক্করীয়, কজঙ্গলমণ্ডল, কোটাটবী, পদুম্ববা, আর কৌশাম্বী ছিল পুণ্ড্র-বরেন্দির সামন্ত রাজ্য। দিব্যোকের নেতৃত্বে আমরা গৌড়ের রাজত্ব জয় করার পরে কেউ কেউ চেয়েছিল এই সামন্ত রাজ্যগুলিও অধিকার করে নেওয়া হোক। কিন্তু দিব্যোক বাদ সাধল। তার কথা– মোরা মোদের বরেন্দি ফিরে পেয়েছি। মোরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোদের জাতির লিজেদের জীবন ফিরে পেয়েছি। অন্য মাটি মোদের প্রয়োজন নেই। বরেন্দি ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ ছিল ন্যায়যুদ্ধ। কিন্তু অন্য মাটি, অন্য ভূমি নিজেদের অধিকারে আনার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলে সেটা হবে অন্যায্য। তাই আর কোনো অভিযান চালানো হলো না। আর সেটাই হলো আমাদের কাল। এখন এই সামন্ত রাজ্যগুলোন হয়েছে রামপালের ঘাটি। আগে সেগুলোর শাসনকর্তা ছিল সব ভট্টবামনের লোক। এখন তাদের সরিয়ে বসানো হয়েছে রামপালের লিজের লোককে। আর রামপালের প্রধান সহায় তার মাতুল মথন দেব। আমরা রাজপ্রাসাদ হস্তগত করার পরে সেই বিজয়ের আনন্দেই ছিলাম বুঁদ হয়ে। সেই সুযোগে রামপাল পালিয়ে গেল। পালানোর সময় নিয়ে গেল রাজ-কোষাগারের সমস্ত অর্থ-সম্পদ, মণি-মানিক্য। সেই অর্থ ছড়িয়ে সে এখন দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছে লিজের সমরশক্তি।

একটু থামে মল্ল। পপীপ অধৈর্য হয়ে বলে– দেদ্দাপুরের কী হলো?

তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত তোলে মল্ল– বলছি রে বাপ! এই যে বললাম– গৌড়ের সব সামন্ত রাজ্যগুলো এখন রামপালের বড় ঘাটি। ঐ যে নিদ্রাবলী– ঐ যে দূরের আলোটুকুন দেখছিস– ঐ নিদ্রাবলী থেকে দেদ্দাপুর বড়জোর আধাবেলার পথ। আর যদি ঘোড়ায় চড়ে আসে তাহলে তো সময় লাগে তার চার ভাগের এক ভাগ। কোটাটবী থেকে রামপালের লোকেরা মাঝে মাঝেই এসে আক্রমণ চালাতে শুরু করল দেদ্দাপুরে। ঝটিকা আক্রমণ চালায়, মেরে ফেলে দুই-একজন গাঁওবাসীকে, লুণ্ঠণ করে নিয়ে যায় মানুষের গরু-ছাগল, আগুন লাগিয়ে দেয় একটা-দুইটা ঝুপড়িতে কতদিন আর গাঁয়ের মানুষ সইতে পারে এই রকম অরক্ষিত জীবন। তারা দিব্যোকের কাছে নালিশ জানাল। দিব্যোকের হাতে উপায় ছিল তিনটি। একটা উপায়, আক্রমণ চালিয়ে নিদ্রাবলীকে বরেন্দির মধ্যে নিয়ে নেওয়া। তাতে তার প্রথম থেকেই আপত্তি। আরেকটা উপায় ছিল দেদ্দাপুরে একটা বড়-সড় সৈন্যদল রেখে দেওয়া। কিন্তু তখন তো কৈবর্তদের প্রশিক্ষিত কোনো সেনাদলই নেই। তাই সেই কাজও করা সম্ভব হলো না। দিব্যোক শেষ পথটাই গ্রহণ করল। গাঁয়ের লোকদের বরেন্দির অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। সেই অনুসারে দেদ্দাপুর পরিত্যক্ত হলো। গাঁয়ের মানুষ বরেন্দির যেখানে যেখানে থাকতে চাইল সেখানে তাদের জমি দেওয়া হলো, চাষের বলদ দেওয়া হলো, বসবাসের জন্য ঘর তুলে দেওয়া হলো।

মাথায় হাত দিয়ে হতাশায় বুঁজে যাওয়া গলায় পপীপ বলে– হায়! আমার মা এই বিস্তীর্ণ বরেন্দির কোন কোণে যে পড়ে আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মাথায় আবার সান্ত্বনার হাত রাখে মল্ল– নিরাশ হোস নে বাপ! বেঁচে থাকলে তোর মায়ের সাথে তোর দেখা হবেই হবে।

কেমন করে?

তোদের গাঁয়ের যে কোনো একজন লোকের সাথে দেখা হলেই তো খোঁজ পাওয়া শুরু হবে। যে কোনো একজনকে পেলেই আমরা একটা সূত্র পেয়ে যাব।

মনে মনে মাথা নাড়ে পপীপ। হ্যাঁ এই পদ্ধতিতে কাজ হবে।

মল্ল আবার কথার খেই ধরে– তুই তাহলে এই ভাবে সন্ধান করা শুরু কর। যে কোনো গ্রামে যে কোনো জনপদে তোদের দেদ্দাপুরের একজন লোকের দেখা পেলেই বাকি সবার সন্ধানও একে একে পাওয়া যাবে। আর আমি তো সীমান্তের সবগুলি ঘাটিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আমিও সন্ধান করতে থাকব। কোনো সূত্র পেলেই তোকে জানাব।

তুমি কীভাবে সংবাদ দেবে আমাকে? তুমি জানবে কীভাবে আমি কোথায় আছি?

হুম। কিছুক্ষণ ভাবল মল্ল– এটা একটা সমস্যা বটে। তুই হয়তো নির্দিষ্ট পথ ধরে চলবি। কিন্তু আমার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই।

তাহলে?

কী তাহলে?

এখন তাহলে কী করা যায়?

হেসে ফেলে মল্ল– সেটা তুই-ই ভেবে বের কর। এখন তুই পূর্ণ যুবক। বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। তার ওপরে গাদা গাদা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছিস। আমার চাইতে তোর জ্ঞানগম্যি এখন অনেক বেশি। তুই-ই বল কী করা যায়!

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পপীপ বলল– আমি বরং তোমার সাথেই থাকি। তোমার সাথেই চলাফেরা করি। তোমার কাজে তোমাকে সাহায্য করতে থাকি। আর যেখানে যেখাকে আমরা যাব, সেখানে গিয়ে দেদ্দাপুরের লোকের খোঁজও করব।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মল্লর চোখ। পপীপ মুহূর্তে বুঝে গেল ঠিক এইরকমটাই চাইছিল মল্ল, কিন্তু নিজের মুখ ফুটে বলতে পারছিল না।

সেটাই সবচেয়ে ভালো। খুশির সাথে বলে ওঠে মল্ল– এখন আসলে তোর মতো যুবককে খুব দরকার ভীমের। চল্ এখানকার কাজ সেরে দুই-একদিনের মধ্যেই তোকে ভীমের কাছে নিয়ে যাব। ঘোড়ায় চড়তে পারিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ল পপীপ– না। কে শেখাবে আমাকে ঘোড়ার চড়া। আর রামশর্মার ক্রীতদাস ঘোড়া পাবেই বা কোথায়!

ঠিক কথাই বলেছিস। তবে চিন্তার কিছু নেই। দুই দিনেই শিখে যাবি। এখন যা। অনেক রাত হয়েছে। তোর জন্য শয্যা পেতে দেওয়া হয়েছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়।

০৯. মাতৃভূমিকে দুচোখ মেলে দেখা

সত্যি সত্যিই ঘোড়ায় চড়া শিখতে দুই দিনের বেশি লাগেনি। পপীপ খেয়াল করেছে, আসল কাজটা হচ্ছে ঘোড়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক তৈরি করে নেওয়া। যে মুহূর্তে ঘোড়া বন্ধুরূপে মেনে নেবে কোনো লোককে, তখন তাকে পিঠে নিতে কোনো আপত্তি থাকবে না তার। পপীপের একটা পুরো দিন লাগল মল্লর ঘোড়াটার সাথে সখ্য স্থাপনে। পরের দিন তাকে পিঠে তুলে নিল ঘোড়া। ঘোড়ার বিভিন্ন রকম চলনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগল আরও একটা দিন। ঘোড়া যখন পিঠে আরোহী নিয়ে হেঁটে চলে তখন তার দোলা এক রকম, যখন দুলকি চালে ছোটে তখন দোলা আরেক রকম, আর যখন মুখে ফেনা তুলে তীব্র গতিতে ছুটে চলে তখন তার দোলা আরেক রকম। অনেক সময় ঘোড়া জোরে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে অসাবধান আরোহী ছিটকে পড়ে কয়েক হাত দূরে। পপীপ নিজেও এমন আঘাত পেয়েছে একবার-দুইবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি। মল্লর সঙ্গীরা তো পপীপের এই কৃতিত্বে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এত তাড়াতাড়ি পপীপ ঘোড়া চালানো শিখে ফেলল, আর এমন ভঙ্গিতে সে এখন ঘোড়া চালায় যে মনে হয় সে মায়ের পেট থেকে পড়েই ঘোড়া চালানো শুরু করেছে।

কিছুটা অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে তার। মল্ল বলেছে, সবসময় সশস্ত্র অবস্থাতেই চলাফেরা করতে হবে তাদের। শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্যই নয়, তাদের সশস্ত্র অবস্থায় দেখলে সাধারণ কৈবর্তদের মনেও এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়। তারা অনুভব করে, তাদের রক্ষার জন্য ভীমের সঙ্গীরা সদা প্রস্তুত এবং সদা তৎপর।

ঘোড়া এত তাড়াতাড়ি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ভাবতে পারেনি পপীপ। নিজের পা এবং গো-শকট ছাড়া অন্য কোনো বাহনের অভিজ্ঞতা পপীপের ছিল না। কয়জন কৈবর্ত বা ভূমিপুত্রেরই বা থাকে! কিন্তু ঘোড়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলে পথের দূরত্ব যে এতটা কমে যায়, তখন আর অগম্যকেও অগম্য বলে মনে হয় না, এই অভিজ্ঞতা পপীপকে অভিভূত করে ফেলে। বাসুখুড়ো বলেছিল, অনেক আগে, শত শত বছর আগে আর্যরা যে এদেশে এসে আমাদের মতোই ভূমিপুত্রদের যুদ্ধে পরাজিত করে এই দেশকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিতে পেরেছিল, তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাদের ঘোড়া এবং ঘোড়ায় টানা রথ। আমাদের গঙ্গাতীরের মানুষের ঘোড়া ছিল না। আমাদের ছিল মোষ এবং গরু। আমাদেরকে ওরা হারিয়ে দিয়েছিল গতি দিয়ে।

যুদ্ধে এবং সকল কাজেই গতি যে কত বড় ব্যবধান তৈরি করে দেয়, তা পপীপ এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারে ঘোড়ার চড়ার পরে। এখন সে প্রত্যুষে ঘোড়া ছুটিয়ে পুরো একটি ভুক্তি (প্রশাসনিক প্রদেশ) পেরিয়ে যেতে পারে দুপুরের মধ্যেই। একটু ফাঁক পেলেই সে ঘোড়া নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। মল্ল তাকে বাধা দেয় না। সে বলে যে নিজে ঘাটির কাজে ব্যস্ত থাকে বলে সে ঘোড়া নিয়ে তেমন বেরুতে পারে না। আর ঘোড়া এমন একটা জীব যে বেশিক্ষণ বিশ্রাম পছন্দ করে না। তাকে ছোটাতে হবে। ছুটতে দিতে হবে। নইলে তার পেশির শক্তি কমে যায়। তাই পপীপ সময়ে-অসময়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পায় ঘন ঘন।

আজ আবার বেরিয়ে পড়েছে পপীপ। কোনো লক্ষ্য স্থির নেই। প্রথমত ঘোড়া ছোটানোর আনন্দ। তার সাথে নিজের বরেন্দিকে আরও ভালোভাবে চিনে নেওয়া।

দুইটি টিলা, একটা ছোট অঘন বন, একটা কৈবর্ত গ্রাম পেরিয়ে একটা সমতল উপত্যকায় এসে পৌঁছায় পপীপ। এখান থেকে সামনে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কৈবর্ত গ্রামের মতো নয়। এখান থেকেই গ্রামের যে বিন্যাস লক্ষ করতে পারছে সে তাতে বুঝতে পারছে এটি কোনোক্রমেই কোনো কৈবর্ত বা অন্য কোনো ভূমিপুত্রদের গ্রাম হতে পারে না। আর্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্যরা যেসব গ্রামে বাস করে সেগুলিকে সবাই দেবগ্রাম নামে ডাকে। সেই গ্রামের অন্য নাম তো অবশ্যই আছে। কিন্তু সব আর্যগ্রামই ভূমিপুত্রদের কাছে পরিচিত দেবগ্রাম নামে।

কোনো দেবগ্রামে কখনো ঢোকা হয়নি পপীপের। দিব্যোক রাজা হবার আগে সে প্রশ্নই উঠত না। কৈবর্ত বা স্থানীয় ভূমিপুত্রদের কোনো দেবগ্রামে ঢুকে পড়া ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। সে অপরাধে কারো কারো প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হয়েছে। তাদের প্রবেশাধিকার ছিল গ্রামের উপান্তে চণ্ডাল বা ভূমিদাসের ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত। কখনো কোনো দেবগ্রামের নালা পরিষ্কার কিংবা অন্য কোনো অচ্ছ্যুৎ কাজের জন্য ডাক পড়ত কৈবর্তদের। গ্রামের মধ্যে তখন ঢুকতে দিতে হতো ভূমিপুত্রকে। কিন্তু তখনো দেবগ্রামের মানুষ এমনভাবে ভূমিপুত্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত যেন এই লোকটি কোনো মানুষ নয়, বরং কোনো চণ্ডালের শব।

পপীপের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়। আজ সে দেবগ্রাম দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখবে তাকে বীরদর্পে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে দেখলে কী প্রতিক্রিয়া হয় বেদগর্বী লোকগুলোর।

গ্রামের মুখে এসে ঘোড়া থামায় পপীপ। ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখে একটা গাছের ডালের সাথে। পিঠে চাপড় দিয়ে আশ্বস্ত করে ঘোড়াকে। এই চাপড় একটা ইঙ্গিত। ঘোড়া বুঝতে পারে, তার মনিব তাকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে না। বরং কিছুক্ষণের জন্য বিরাম দিচ্ছে তাকে। ঘোড়া বুঝতে পারে পপীপের ইঙ্গিত। সে মুখ ডুবিয়ে দেয় মাটির সাথে লেগে থাকা ঘাসের মধ্যে। তখন পপীপ পা বাড়ায় গ্রামের প্রবেশপথের দিকে।

গ্রামে ততক্ষণে সাড়া পড়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে এসেছে একজন কৈবর্ত। তার হাতে আবার রয়েছে অস্ত্র। গ্রামের মানুষের চোখে একই সঙ্গে আতঙ্ক এবং ঘৃণাও। নারীরা শিশুদের নিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। পুরুষরা তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছে না পপীপের আগমনের হেতু। তাই কিছুটা বিভ্রান্তও দেখাচ্ছে তাদের।

প্রথমেই সরাসরি গ্রামে না ঢুকে গ্রামের চারপাশ ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় পপীপ। একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেই বোঝা যায় কৈবর্ত গ্রামগুলির সাথে বেদীদের দেবগ্রামের পার্থক্য। পরিচ্ছন্ন গোবাট, পুষ্করনি, মাঠ। পুরো গ্রামকে চক্রাকারে ঘুরে আসা যায় এমন পায়ে চলা পথ। মাঠে চড়ছে সবৎসা গাভি। সেগুলোর কোনো-কোনোটির গলায় ঘুন্টি। ঘাড় নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে টুং টাং সুর বেজে উঠছে। গাভিগুলো দেখে লক্ষ্মীর আখ্যান মনে পড়ে যায় পপীপের। ব্রাহ্মণরা বলে লক্ষ্মী নাকি বাস করে গরুর গোবরে ও গোচনায়। আখ্যানের কথা মনে করে একা একাই হাসতে থাকে পপীপ–

"একদিন লক্ষ্মী মনোহর বেশে গাভিদের নিকটে এলে তারা জিজ্ঞসা করল, দেবী তুমি কে? তোমার রূপের তুলনা নেই।

লক্ষ্মী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী। আমি দৈত্যদের ত্যাগ করেছি, সেজন্য তারা বিনষ্ট হয়েছে। আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল সুখ ভোগ করছেন। গো-গণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা করি। তোমরা শ্রীযুক্তা হও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাভিরা বলল, তুমি অস্থিরা, তুমি চপলা, বহুলোকের অনুরক্তা, আমরা তোমাকে চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতী। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্মী বললেন, অনাহুত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয়– এই প্রবাদ সত্য। মনুষ্য-দেব-দানব-গন্ধর্বাদি উগ্রতপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; ত্রিলোকে কেউ আমার অপমান করে না। অতএব তোমরাও আমাকে গ্রহণ করো! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হবো। অতএব তোমরা প্রসন্ন হও! আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনো স্থানই কুৎসিত নয়। আমি তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি।

তখন গাভিরা মন্ত্রণা করে বলল, কল্যাণী যশস্বিনী, তোমার সম্মানরক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তুমি আমাদের পুরীষ ও মূত্রে অবস্থান করো।

লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক! আমি সম্মানিতা হয়েছি।"

হাসতে হাসতেই সবৎসা গাভি থেকে এবার গ্রামের দিকে দৃষ্টি দেয় পপীপ। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে গ্রামের বেশিরভাগ ঘরই খড়ের ছাউনি আর মাটির দেয়ালে তৈরি। দেয়ালে জালিকাটা। এই ধরনের জালিকাটা ঘরকেই বোধহয় এরা বলে জালক।

এবার গ্রামের ভেতরে ঢোকার জন্য এগিয়ে যায় পপীপ। গ্রামে ঢোকার মুখেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ। তাদের জোড়করে নমস্কার জানায় পপীপ। তারপর শ্লোক আউড়ে বলে–

দেবান ভাবতানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপস্যথ।।

(তোমরা দেবতাদের ভাবনা করো সেই দেবতারাও তোমাদের ভাবনা করুন! পরস্পর ভাবনা করে দেবতা ও তোমরা উভয় সম্প্রদায় পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হও!)

মুখ দেখে মনে হয় রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছে দেবগ্রামের মানুষগুলো। একজন কৈবর্ত যুবকের মুখ থেকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক শুনে তারা বিস্মিত। তবে শ্লোকের মাধ্যমে পপীপ তাদের কুশল কামনা করেছে এটা বুঝতে পেরে তাদের মুখ থেকে ভীতির চিহ্ন অনেকখানি মুছে গেছে। একজন এতক্ষণে প্রতিনমস্কার করে পপীপকে। তারপর আহ্বান জানায়– আসুন!

তাদের সাথে গ্রামের আটচালা মণ্ডপে এসে দাঁড়ায় পপীপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশের সময় ইতস্তত করে পপীপ। একজন সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় আবার আহ্বান জানায়– আসুন!

ভেতরে আসন পাতা। বেশ পুরনো সব আসন। কোনো-কোনোটা জরাজীর্ণ। বেছে বেছে ভালো আসনগুলোকে একদিকে বিছানো হলো। তারপর পপীপকে বসতে অনুরোধ জানালে পপীপ পদ্মাসনে বসে একটি আসনে। গ্রামের মানুষরাও বসে পড়ে যে যার মতো। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না। অস্বস্তিকর নীরবতা। পপীপ নিজেই কথা শুরু করে– কেমন আছেন আপনারা?

নির্দোষ প্রশ্ন। যে কোনো দুই ব্যক্তির মধ্যে বাক্যালাপ শুরুর সময় বহুল ব্যবহৃত হয় এই প্রশ্নটি। কিন্তু এমন একটি সাধারণ প্রশ্নেও উত্তরের পরিবর্তে একে-অপরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে

দেবগ্রামের প্রৌঢ়রা। আর তখন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই পপীপ লক্ষ করে যে, এখানে কোনো যুবক উপস্থিত নেই। তার মনে পড়ে গ্রামের কোথাও সে কোনো যুবককে দেখতে পায়নি। কারণটা কী? গ্রামের সব যুবক একসাথে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কেন? প্রশ্নটা না করে পারে না সে। এই প্রশ্ন শুনে আরও ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠে গ্রামপ্রৌঢ়দের মুখে। একজন করজোড়ে বলে– বিশ্বাস করুন! আমাদের গ্রামের কোনো যুবককে আমরা লুকিয়ে রাখিনি। সক্ষম পুরুষরা সবাই গেছে প্রতিরক্ষা বাঁধের জন্য শ্রম দিতে। আপনি দয়া করে আপনার সেনাধ্যক্ষকে বলবেন যে এই গ্রামের সকলেই রাজা ভীমের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে যাবে। দয়া করে আমাদের অবিশ্বাস করবেন না!

এবার আরও অবাক হয়ে যায় পপীপ। জিজ্ঞেস করে– আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আপনাদের কথা। কোন বিষয়ে কথা বলছেন আপনারা?

আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখা যায় গ্রামপ্রৌঢ়দের। তারাও পপীপের এমন আচরণে একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করে– আপনি কি রাজা ভীমের সেনাদলের সদস্য নন?

সে নিজে কি ভীমের সেনাদলের সদস্য? হ্যাঁ, একথা সত্য যে সে কৈবর্তদের যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে অংশ নেবার জন্যই কামরূপ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে। ভীমের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মল্লর সঙ্গেই রয়েছে। তবে এখনো তো সে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দায়িত্বে যোগ দিতে পারেনি। মল্ল তাকে কয়েকদিন পরে গৌড়ে নিয়ে যাবে। সেখানে ভীমের সঙ্গে তার দেখা হবে, আলোচনা হবে। তারপরে বোঝা যাবে কৈবর্তদের স্বাধীনতা রক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামে তাকে কোন ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু এত কথা তো এখানে বলা যাবে না। সে তাই শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ-বাচকভাবেই ঘাড় দোলায়– হ্যাঁ আমি ভীমের সেনাদলেই আছি।

তাহলে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে এসেছেন যে প্রতিরক্ষা বাঁধের কাজে বিষ্টি দিতে না গিয়ে এই গ্রামের কোনো যুবক লুকিয়ে আছে কি না?

এবার সরাসরি বলে পপীপ– না আমি সেকাজে আসিনি। আমি এই অঞ্চলে এসেছি সদ্য। তাই ঘুরে-ফিরে দেখার জন্য এখানে এসেছি। আপনাদের সাথে পরিচিত হবার জন্য এখানে এসেছি। তাছাড়া আমি ইতোপূর্বে কখনো কোনো দেবগ্রামের ভেতরে ঢুকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাইনি। আপনারা তো জানেনই, পূর্বে এমন কোনো সুযোগও ছিল না। আপনারা বৌদ্ধ পাল-সম্রাটের রাজত্বেও মনুর শাসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন। মনুর বিধানে আমরা অস্পৃশ্য, অসুর। তাই আপনাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারার অধিকার আমাদের ছিল না।

মাথা নীচু করে বসে থাকে বৃদ্ধ কয়েকজন। পপীপ এবার মাথা গোণে। মোট আটজন। সে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নিজেকে সামলে নেয় এবার। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে– আমি শুধু কৌতূহলবশেই এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে জানতে এসেছি পরিবর্তিত পেক্ষাপটে আপনারা কেমন আছেন। জানতে এসেছি আপনাদের ওপর আমার স্বজাতিরা প্রতিহিংসাবশত কোনো অত্যাচার চালাচ্ছে কি না?

তড়বড় করে একজন বলে– না না আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের ওপর কোনো অত্যাচার হয়নি।

পপীপ হাসে– না হলেই ভালো। তবে যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে জানালে আমি তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে পারি।

আবার পরস্পর চোখের ভাষায় কথা বিনিময় করে গ্রামপ্রৌঢ়রা। একজন বলে– না না। সত্যি কোনো অত্যাচার নেই। অত্যাচার কিছুটা হয়েছিল বটে। তবে সে অনেক আগে। সেই যখন মহারাজ মহীপাল নিহত হলেন। তখন আমরাও বিহ্বল। আর সদ্যবিজয়ী কৈবর্তরাও কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল। তবে রাজা দিব্যোক খুব তাড়াতাড়ি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। নিরাপত্তা দান করেছিলেন আমাদের সকলকে। এখন সে রকম কোনো সমস্যা নেই।

একজন উঠে গেল ভেতরে। বোধহয় নিজের বাড়ির দিকে। ফিরেও এল তাড়াতাড়ি। তার হাতে মাটির থালায় কিছু ফল। মাটির পাত্রেই জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপের সামনে ফলের থালা এবং জলপাত্র নামিয়ে রেখে বিনীত ভঙ্গিতে বলে– আপনি অতিথি। দয়া করে এই সেবাটুকু গ্রহণ করুন!

মনে মনে হাসে পপীপ। আবার তিক্ততার সঙ্গে ভাবে, এই রকম পারস্পরিক শ্রদ্ধার জীবন যদি আগে থাকত, তাহলে কোনো রক্তপাতই হতো না। কৈবর্তসহ এই মাটির আদিসন্তানরা এইভাবে সর্বস্ব হারিয়ে হিংস্র হয়েও উঠত না।

সে একটা ফল তুলে নেয় থালা থেকে। বলে– যদি সবকিছু স্বাভাবিকই থাকবে, তাহলে আমাকে দেখে আপনারা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলেন কেন?

একজন মৃদু হেসে বলে– রাজার লোক দেখলে কে না আড়ষ্ট হবে বলুন! ভাবছিলাম আবার কোন রাজাদেশ বহন করে যে এসেছেন আপনি!

ঠিক একই রকম অবস্থা ছিল কৈবর্তদের। বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ। শতাব্দের পরে শতাব্দ। গ্রামসীমানায় রাজপুরুষের আগমনের অর্থই ছিল কৈবর্তদের জন্য আরও সর্বনাশের আগমন; নতুন কোনো হিংস্র নির্দেশ। জানেন, রাজপুরুষদের সেই ঢোলের শব্দ সকল কৈবর্ত ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নের অংশ হিসাবে এখনো শুনতে পায়। এখনো তারা ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে বসে সেই দুঃস্বপ্ন দেখে! ঘুমের মধ্যেই তারা কেঁদে ওঠে সন্তান হারানোর বেদনায়, স্বামী হারানোর বেদনায়, জন্মমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার বেদনায়। সেই নিদারুণ কষ্টের কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না। পারবে শুধু তারাই যারা এই মাটির সন্তান।

কিছুক্ষণের জন্য নৈঃশব্দ নেমে আসে। হাতের ফলটি পপীপের হাতেই রয়ে গেছে। একটা কামড়ও দেয়নি সে ফলটিতে। নিজেকে সামলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে এবার। কান্না উঠে আসতে চাইছে বুক ঠেলে। মৃদু মৃদু কাঁপছে সে ভেতরের আবেগের সাথে যুদ্ধ করতে করতে। গ্রামবৃদ্ধরা অবনত মস্তকে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলার সাহস করে উঠতে পারছে না।

অবশেষে নিজেকে সামলাতে পারে পপীপ। তখন লজ্জাও পায় একটু। নিশ্চয়ই তার আচরণে মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে এই মানুষগুলো। সে উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে বলে– আমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে নিজেকে আবেগের কাছে মুক্ত করে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।

প্রৌঢ়দের একজন বলে– নিশ্চয়ই উচিত হয়েছে। চিরকাল কি আর মানুষ আবেগকে চেপে রাখতে পারে? আর আমরা তো সত্যিই অপরাধী। নিজেরা না করি, আমাদের স্বজাতিরা তো অমানবিক অন্যায়গুলো করেছে। বছরের পর বছর ধরে করেছে। তার জন্য যত প্রায়শ্চিত্ত করতে হোক, আমরা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেই হবে। তবে যুবক, একটি কথা মনে রাখবেন। আমরাও এই মাটিকে আমাদের জন্মমাটি বলেই মনে করি। সত্যি সত্যি এই বরেন্দ্রীই আমাদের দেশ। সেই কত শত বৎসর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যাবর্ত থেকে অথবা অন্য কোনো ভূমি থেকে এসেছিলেন এই ভূমিতে। সেই অতীতের কথা মুছে গেছে আমাদের মন থেকে অনেক আগেই। এই ভূমি ছাড়া আমরাও তো আর অন্য কোনো ভূমিকে চিনি না। এই ভূমি ছাড়া আমরাও তো অন্য কোনো ভূমিকে নিজের মাতৃভূমি বলে কল্পনা করতে পারি না। এটাই আমাদের জন্মমাটি। আমাদেরও এখানেই বাস করতে হবে আমৃত্যু। মৃত্যুর পরে আমাদের দেহ এই দেশেরই কাঠের চিতায় জ্বলে জ্বলে মিশে যাবে এই দেশেরই বাতাসের সাথে। এখন দেখতে হবে, এই বসবাসটা সংঘাতময় থাকবে, নাকি শান্তিপূর্ণ হবে। আপনি যদি কোনোভাবে সুযোগ পান, শুধু এই কথাটা জানাবেন রাজা ভীমকে। জানাবেন আমরাও এই মাটিরই সন্তান। এছাড়া আমাদের অন্য পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মনের মধ্যে ধাক্কা লাগে পপীপের। এভাবে তো কোনোদিন চিন্তা করা হয়নি!

১০. অন্যরকম আলোও আছে আমাদের পৃথিবীতে

মল্ল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। বলে– হচ্ছে তো। বিশাল একটি প্রতিরক্ষা বাঁধ তৈরি হচ্ছে। পদুমা থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে সেই ত্রিস্রোতার সঙ্গমস্থলে। আমাদের পুণ্ড্র-বরেন্দি-গৌড়ের পূর্ব-উত্তর সীমান্ত জুড়ে। ভীম খুব ভালো সেনাপতি বুঝলি! কৈবর্ত জাতির সৌভাগ্য যে এমন নেতা পেয়েছে। সে বলে যে শুধু বরেন্দির মানুষ নয়, বরেন্দির মাটি বরেন্দির জল বরেন্দির বন– সবকিছুকেই কাজে লাগাতে হবে বরেন্দির শত্রুর বিপক্ষে। সেই চিন্তা থেকেই এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ। মাটির প্রাচীর। এটি শুধু প্রাচীরই হবে না, হবে সৈন্য চলাচলের পথও। এতখানি প্রশস্ত হচ্ছে প্রাচীরটা যাতে তার ওপর দিয়ে পাশাপশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারে চারজন সৈন্য। আর প্রাচীরের জন্য মাটি নেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র পূর্ব পাশ থেকে। এর ফলে সেখানে একটি বড় খাল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। খুব বড় খাল, যেটাকে নদীই বলা যাবে প্রায়। ভীম নামও দিয়ে রেখেছে সেই নদীর। সুবিল নদী। এই প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কাজ শেষ হলে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের পুণ্ড্রবর্ধনের ওপর আক্রমণ পরিচালনার কোনো সুযোগ আর রামপালের থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে খুব ভালো লাগছে পপীপের। তবু দেবগ্রামে শোনা সেই কথাটি না বলে পারে না– শুনলাম দেবগ্রামগুলো থেকে আর্য যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিষ্টি (বিনামূল্যে শ্রম) দিতে বাধ্য করা হচ্ছে সেই প্রতিরোধ প্রাচীরের কাজে।

চকিতে তার দিকে তাকায় মল্ল। জিজ্ঞেস করে– একথা কোথায় শুনলি?

অশ্ব ছুটিয়ে একটি দেবগ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে কোনো যুবক বা তরুণকে চোখে না পড়ায় প্রশ্ন করেছিলাম। তারা এই তথ্য জানিয়েছে।

মাথা নাড়ে মল্ল– কথাটা সত্যি। তবে শুধু তাদেরকে একা খাটানো হচ্ছে না। এতবড় কাজ। কৈবর্ত নারী-পুরুষ দলে দলে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে যাচ্ছে মাসের পর মাস। বর্ষার আগেই প্রাচীরের কাজ শেষ করতে হলে আরও বেশি শ্রমকর্মী প্রয়োজন। সেই কারণে শুধু আর্যদের নয়, অন্য গোত্রেরও সকল সক্ষম পুরুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানের জন্য। এ যাবত কোনো কর্মীকেই এক কার্ষাপণও প্রদান করতে হয়নি। বরেন্দিকে ভালোবেসে সকলেই যেখানে নিজে থেকে এসে কাজ করে যাচ্ছে। আর সেটাকে বিষ্টি বলছে দেবগ্রামের মানুষরা?

হ্যাঁ। তাই তো বলছে। আর বলবে না-ই বা কেন? বিনা মূল্যে শ্রম দিতে হলে তাকে তো বিষ্টিই বলে তাই না?

মল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে– না, কখনোই না। বিষ্টি আর স্বেচ্ছাশ্রম– কখনোই এক জিনিস নয়। দেশকে যে ভালোবাসে, সে কখনো এই শ্রমদানকে বিষ্টি বলতে পারবে না!

মনের গভীরে পপীপ জানে কথাটা সত্য। তাই আর কথা বাড়ায় না। কিন্তু মল্ল বলেই চলে– ওরা যদি বিষ্টি বলে, বলুক। ওদের অনেক যুবক তো পালিয়ে গিয়ে রামপালের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। যারা বরেন্দিতে থাকবে, তাদের কাছ থেকে বরেন্দি তো কিছু-না-কিছু প্রাপ্য গ্রহণ করবেই। শুধু ভূমিপুত্ররাই শ্রম-ঘাম-রক্ত ঢেলে যাবে, আর অন্যেরা বসে বসে দেখবে, তা তো হতে পারে না।

মল্ল এবং পপীপ পাশাপাশি অশ্বপৃষ্ঠে বসে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। রাজধানী গৌড়ে যাচ্ছে ওরা। মল্ল এখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য এখানে এসেছিল। সে কাজ তার শেষ হয়েছে। এখন তার ঘরে ফেরার পালা। ঘরের কথায় পপীপ হেসেছিল। মল্লর মতো মানুষের আবার ঘর হয় নাকি! ঘর এবং মল্ল– এই দুটো শব্দ তো আসলে পরস্পরের বিপরীত দ্যোতনা এনে দেয়। ঘর হচ্ছে স্থায়ীত্ব, স্থবিরতা, গার্হস্থ্য, স্বস্তিময় জীবনের প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্ল ঠিক উল্টো। মল্ল মানেই উদ্দামতা, অস্থিরতা, রোমাঞ্চ। সেই মল্ল ঘরে ফেরার কথা বললে শুধু পপীপ কেন, মল্লকে চেনে এমন যে কেউ হেসে উঠবে। কিন্তু পপীপ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে, ঘরে ফেরার জন্য মল্লর মধ্যে একধরনের তাড়া কাজ করছে। নিজের মনোভাবকে কোনোদিন গোপন করতে শেখেনি মল্ল। এখন যে সে ঘরে ফিরতে উদগ্রীব, এই মনোভঙ্গিটিকেও লুকানোর কোনো চেষ্টাই সে করছে না। মনে মনে আশ্চর্য হলেও এ ব্যাপারে কোনো কথা বলে না পপীপ। তবে মল্লর মনোভঙ্গি বুঝে চেষ্টা করে নিজের গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে। সে ঘোড়ায় চড়তে খুব একটা পারদর্শী হতে পারেনি। এবরোথেবরো পথে খুব জোরে ঘোড়া ছোটালে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা সে নিজেকেও দিতে পারে না। মল্ল এটা বোঝে। তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি ঠিকই বুঝে নিয়েছে যে পপীপ খুব দ্রুত ঘোড়া চালাতে শিখলেও যাকে বলে সুদক্ষ অশ্বারোহী, তা হতে এখনো অনেক সময় লাগবে। পপীপকে জোরে ঘোড়া ছোটাতে বললে বিপদ হতে পারে। তাই সে মাঝারি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে। কিন্তু পপীপ হঠাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়ায় তাকেও গতি বাড়াতে হয়। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসে পপীপের পাশে। বলে– এত জোরে ছুটতে হবে না। গতি কমিয়ে দে। চারপাশ দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে যাই।

পপীপ এবার তার কথা মেনে নেয়। ভীমের কথা জানতে চায়। রামপালকে প্রতিহত করে কীভাবে স্থায়ী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা যায়, সেকথা জানতে চায়। মল্ল বলে যে সেসব পরে হবে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা এই পথে সম্ভব নয়। এবং তা বিধেয়-ও নয়। বরং তারা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলুক।

পপীপ চলতে চলতে দুচোখ ভরে বরেন্দিকে দেখে। সবই তার কাছে নতুন লাগে। বরেন্দিতে তার নাড়ি পোঁতা থাকলেও যে তো আসলে বরেন্দির কিছুই চেনে না। এককথায় বলতে গেলে বরেন্দি তার কাছে একটা স্বপ্নের নাম। মল্ল চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে– তুই সন্ধ্যাকর নন্দীকে চিনিস?

পপীপ তো এই নামে কাউকে চেনে না।

মল্ল প্রশ্নটা সংশোধন করে– মানে আমি জানতে চাইছি তুই কি তার নাম শুনেছিস?

পপীপ এবারও এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে। না, সে সন্ধ্যাকর নন্দীর নাম শোনেনি। কে সে?

একে তো ঘোড়ার পায়ের ঘায়ে ধূলি উড়ছেই, তার ওপর বরেন্দির থাকবন্দি মাটির সোপান বেয়ে মাঝে মাঝেই উঠে আসছে ঘূর্ণি বাতাস। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত কাছে থেকেও মাঝে মাঝে তারা একে অপরকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। ধুলো এসে আড়াল করে দিচ্ছে পরস্পরের মুখ। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর পরিচয় জানতে চাওয়ায় মল্লর মুখে এমন এক তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে যে ধুলোর ঘূর্ণিও তাকে আড়াল করতে পারে না। অনেকক্ষণ সে পপীপের প্রশ্নের উত্তর দেয় না। একমনে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরে, পপীপ যখন মনে মনে অস্থির হয়ে আবার প্রশ্নটা করতে যাবে, সেই সময় মল্ল বলে– সন্ধ্যাকর নন্দী হচ্ছে কবি। এই যুগের সবচাইতে প্রতিভাবান কবি। বিদ্যোৎ-সমাজ তাকে 'কলিকালের বাল্মিকী' বলে ডাকে।

এত বড় একজন কবি! পপীপ মনে মনে সন্ধ্যাকর নন্দীকে প্রণাম জানায়। তার কবিতা পাঠের জন্য মনের মধ্যে একটি তাড়াও অনুভব করে। আর মল্ল যখন নাম নিয়েছে, তখন বুঝতেই হবে, তিনি সত্যিকারের প্রতিভাবান কবি। মল্ল কি তাকে সংগ্রহ করে দিতে পারবে তার কাব্য? কিন্তু সে প্রশ্নটি উচ্চারণ করার আগেই মল্ল বলে– সন্ধ্যাকর নন্দীর সঙ্গেই তোর যুদ্ধ পপীপ। যেমন ভীমের যুদ্ধ রামপালের সাথে, তেমনি তোর যুদ্ধ সন্ধ্যাকর নন্দীর সাথে। রামপালের পাশে যেমন সন্ধ্যাকর নন্দী আছে, তোকে সেইভাবে দাঁড়াতে হবে ভীমের পাশে। আর্যদস্যুদের যেমন প্রধান লেখনী-সহায় সন্ধ্যাকর নন্দী, তেমনি কৈবর্তজাতির লেখনী-সহায় হতে হবে পপীপকে।

হতবাক হয়ে যায় পপীপ। এতটাই অবাক হয়েছিল যে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল প্রায়। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে– এ আবার কেমন যুদ্ধ মল্লকাকা?

মল্ল বলে– কৈবর্ত জাতি এই প্রথম একজন কবিকে পেয়েছে পপীপ। সে তুই। সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্যরচনা করে কৈবর্তজাতির মুক্তিদাতা দিব্যোকের নামের সাথে যেসব কুৎসিত বিশেষণ যোগ করে দিচ্ছে, তার প্রতিবিধান করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। পুরো কৈবর্তজাতি তাই নিজেদের একজন কবির আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুই সেই কবি পপীপ। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যে দিব্যোক আর কৈবর্তজাতি সম্বন্ধে যেসব কুৎসিত কথা আছে, সেগুলোর যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে কাব্য রচনা করতে হবে তোকে। তোকেই করতে হবে পপীপ। কারণ আমাদের আর কেউ নেই।

পপীপ ঘাবড়ে যায়– এত বড় দায়িত্ব! আমি কি পারব মল্লকাকা?

তোকে পারতেই হবে পপীপ। ভীম যদি হেরে যায় রামপালের কাছে, তাতে যতটা ক্ষতি হবে এই মাটির সন্তানদের, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে যদি তুই সন্ধ্যাকর নন্দীর কাছে হেরে যাস। কারণ, সন্ধ্যাকর নন্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্য হাজার বছর পরেও এদেশের ভূমিপুত্রদের ছোট করে রাখবে মানুষের কাছে।

পপীপ কোনো উত্তর দিতে পারে না। মল্লও আর কোনো কথা বলে না। দুজনেই নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এভাবেই। মনে হয় এমন দুই অশ্বারোহী যাচ্ছে, যারা পাশাপাশি যাচ্ছে বটে, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। অনেক, অনেকটা সময় পড়ে, রাজধানীর একেবারে উপকণ্ঠে এসে মল্ল স্বগতোক্তি করে– হায়রে অক্ষর! হায়রে অক্ষরের শক্তি! তোর সাথে যুদ্ধ করবে এমন ব্রহ্মাস্ত্র আছে কার কাছে!

১১. সত্যিকারের ঘর

এমন অবিশ্বাস্য অপরূপ সৌন্দর্যের হঠাৎ মুখোমুখি হলে মানুষ বাকহারা হয়ে পড়বেই। পপীপও বাকহারা হয়। মানুষের মধ্যে কোথাও একটা সৌন্দর্যের কাছে নতজানু হওয়ার প্রবণতা থেকেই যায়। আর সেই সৌন্দর্য যদি একাধারে হয় শ্বাসরুদ্ধকর এবং স্নিগ্ধ, তখন সেই সৌন্দর্য একই সঙ্গে সুদূরের এবং কাছের বলে মনে হয় মানুষের কাছে। নিজের অজান্তেই মানুষ তখন সেই সৌন্দর্যের দাসত্ব বরণ করে নেয়।

পপীপ এখন বুঝতে পারছে মল্লকাকা কেন তার ঘরে ফেরার জন্য মনে মনে উতলা হয়ে থাকে। দ্বারে করাঘাত করার পরে যে শ্রীময়ী মূর্তি কপাট উন্মুক্ত করে সামনে দাঁড়ায়, তাকে দেখামাত্র পপীপ সৌন্দর্যের সেই অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়। ঊর্ণাবতী যে অপূর্ব সুন্দরী, সেই কৈশোরেও তা অনুভব করতে পারত পপীপ। কিন্তু সেই সময়ের ঊর্ণাবতীকে সুন্দরী বললে আজকের ঊর্ণাবতীকে কী বলে অভিহিত করবে পপীপ! সৌন্দর্যের সাথে পবিত্রতা মিশে গেলে যেমন অবয়ব পায় মানুষ, ঊর্ণাবতী আজ তার সাক্ষাৎ উদাহরণ।

দরজা খোলার সাথে সাথে মল্ল– 'এই দ্যাখো কাকে সঙ্গে এনেছি' বলে ঊর্ণাবতীর মনোযোগ পপীপের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও ঊর্ণাবতী একবার মাত্র ভ্রূক্ষেপ করে পপীপের দিকে। তার চোখে পরিচিতের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে কি না সেটাও অনুভব করার সুযোগ পায় না পপীপ। ঊর্ণাবতী চট করে দরজার পাশ থেকে দুইটি আসন তুলে বিছিয়ে দেয় মেঝেতে। পপীপকে একবার শুধু বসার ইঙ্গিত করে বলে– 'অতিথি নারায়ণ। আমি অবশ্যই যথাযোগ্য সেবা করব অতিথির। তার আগে দয়া করে আমার পূজাটুকু সেরে নিতে দিন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্ল কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু ঊর্ণাবতী সেকথা মুখে আনার অবকাশটুকুও না দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। মল্ল একটু বিব্রত চোখে তাকায় পপীপের দিকে। ইঙ্গিত করে আসনে বসার। নিজেও বসে পড়ে আরেকটি আসনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে ঊর্ণাবতী। তার হাতে জলপাত্র। মল্লর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। মল্ল অস্বস্তি বোধ করে পপীপের সামনে। তবু এগিয়ে দেয় দুই পা। বোধহয় জানে যে বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। ঊর্ণাবতী পরম যত্নে জল ঢালে মল্লর পায়ে। এক হাতে জলপাত্র নিয়ে জল ঢালছে, আরেক হাতে প্রক্ষালন করছে মল্লর ধূলিধূসরিত দুই পা। পা ধোয়া শেষ করার পরে, পপীপ বিস্ফারিত দুই চোখে দেখে, ঊর্ণাবতী এবার নিজের চুল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে মল্লর পা দুটি। পপীপের মনে পড়ে এই একই রকম দৃশ্য একবার দেখেছিল সে আঠারো বছর আগে। মল্লর পা মোছা শেষ করে এবার ঊর্ণাবতী মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করে মল্লকে। মল্ল আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত ছোঁয়ায় তার মাথায়। কিন্তু ঊর্ণাবতী গড় করেই থাকে মল্লর পায়ের ওপর। পল-অনুপল কেটে যেতে থাকে। সাধারণ প্রণামে যতটুকু সময় লাগে, তারচেয়ে অনেক বেশি সময় নেয় ঊর্ণাবতী। কিন্তু সেই বেশিরও তো একটা মাত্রা থাকে! মল্লকে রীতিমতো বিব্রত দেখাচ্ছে। কিন্তু ঊর্ণাবতী তার পায়ে কপাল ঠেকিয়ে গড় করে আছে তো আছেই। আবার তার মাথা এবং পিঠ স্পর্শ করে মল্ল। প্রণাম শেষ করার ইঙ্গিত। কিন্তু একই ভাবে নিজের কপালকে মল্লর পায়ের ওপর বিছিয়ে রাখে ঊর্ণাবতী। অনেক অনেকক্ষণ পরে ঊর্ণাবতী যখন মাথা তোলে, দেখা যায় তার চোখের জলে আবার ভিজে গেছে মল্লর দুই পায়ের পাতা। মল্ল এবার পরিহাসের ছলে বলে ওঠে– তাই তো ভাবছিলাম পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে কেন আবার!

বলে নিজেই হেসে ওঠে মল্ল। হাসে পপীপও। চোখের জল মুছতে মুছতে হাসে ঊর্ণাবতীও।

এতক্ষণে পপীপের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় ঊর্ণাবতী। তাকে নমস্কার করার জন্য দুই হাত জড়োও করে। কিন্তু তারপরেই তার চোখ থেকে উধাও হয়ে যায় অচেনার দূরত্ব। খুশি এবং স্নেহের হাসিতে ঝিকিয়ে ওঠে মুক্তাসদৃশ দুই পাটি দাঁত– পপীপ! পপীপ! কেমন আছিস বাছা! কতদিন পরে তোর দেখা পেলাম!

এবার উঠে দাঁড়ায় পপীপ। এগিয়ে এসে প্রণাম করে ঊর্ণাবতীকে। তারপর দাঁড়ায় তার পাশেই। ঊর্ণাবতী সস্নেহ আঙুল বোলায় পপীপের চিবুকে। বলে– তোকে দেখে কী যে ভালো লাগছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপ বলে– আমারও খুব ভালো লাগছে গুরুমা!

মল্ল এগিয়ে আসে– এতক্ষণ তো ফিরেও তাকাচ্ছিলে না ওর দিকে! ছেলেটার সামনে যা কাণ্ড করলে, আমার তো লজ্জাই লাগছিল।

মল্লর কথাতে কোনো ভাবান্তর নেই ঊর্ণাবতীর। বলে– আমার দেবতার পূজা তো আমাকে করতেই হবে। দেবতার তো পূজা পাওয়া বা না-পাওয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু যে পূজার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, তাকে কেন বঞ্চিত করবে তার পূজার অধিকার থেকে?

আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে! এখন ছেলেটাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে চলো! কিছু খেতে-টেতে দাও।

বিশ্রাম এবং খাদ্যগ্রহণের পরে আবার তারা তিনজন একত্রিত হয়। মল্ল জিজ্ঞেস করে– আমি তো পপীপকে প্রথমে দেখে চিনতেই পারিনি। যা দশাসই জোয়ান হয়েছে! কিন্তু তুমি একবার দেখেই চিনলে কীভাবে?

মুখ টিপে হাসে ঊর্ণাবতী– তোমরা পুরুষরা কি আর ভালো করে দেখতে জানো? তোমরা তো শুধু স্থূল অবয়বটুকুই দেখতে পাও। তাই সেটার কোনো পরিবর্তন হলেই চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যায় তোমাদের কাছে। নারীদের দেখার চোখ অনেক সূক্ষ্ম। তারা সজ্ঞানে যেমন দেখে, অজ্ঞানেও তেমনই দেখে। চেতনে যতটা দেখে, অবচেতনে তার চাইতে অনেক বেশি দেখে। চেতন মন অবয়বকেই বেশি মনে রাখে। কিন্তু অবচেতন মনের স্মরণশক্তি অনেক বেশি। হয়তো তার কথা বলার ভঙ্গি, হয়তো হাসলে তার কোনো একটি চক্ষু বেশি কুঞ্চিত হয়, হয়তো তার ঠোঁট একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় বেঁকে যায়, হয়তো তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি এমন যা সচরাচর অন্যদের সঙ্গে মেলে না– এইসব জিনিস মেয়েরা অনেক বেশি মনে রাখতে পারে।

তা পপীপের কী এমন বিশেষত্ব রয়েছে, যা দেখে তুমি এত বছর পরেও তাকে এক নিমেষে চিনে ফেললে?

এবার ঠোঁটের হাসিটি প্রশস্ত হয়ে ওঠে ঊর্ণাবতীর। বলে– আমি পপীপকে চিনতে পেরেছি তোমার আচরণ দেখে। পৃথিবীতে আমি ছাড়া পপীপই যে তোমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সেকথা তো আমি জানি। তাছাড়া তুমি অন্তত ঘরে ফেরার সময় কোনোদিন কাউকে সঙ্গে আনো না। আনলেও তার স্থান হয় বড়জোর অতিথিনিবাসে। ঘরে তুমি আনতে পারো একমাত্র তোমার মানস-সন্তানকে। সে হলো পপীপ। আর তোমার সমস্ত অবয়বে যে খুশির চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছিল, তা একমাত্র পপীপকে খুঁজে পাওয়া ছাড়া আর কোন কারণে এত প্রকট হতে পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই দুচোখ ভিজে আসে পপীপের।

মনে মনে নিজের হারিয়ে যাওয়া মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে– আমি কোনোদিন তোমাকে খুঁজে পাব কি না জানি না মা! কিন্তু যদি পাই, তুমি আমাকে আমার মল্ল কাকা আর উর্ণাবতী গুরুমার মতো ভালোবাসা দিও মা!

পপীপের এই ভাবান্তর দৃষ্টি এড়ায়নি উর্ণাবতীর। সে কাছে এসে মাথায় আদরের হাত বুলায়। বলে– মায়ের কথা মনে পড়ছে পপীপ? তোর মাকে খুঁজতে যাসনি?

গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার সেই গ্রামই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গুরুমা। মাকে এখন কোথায় পাব?

বুঝতে পারছি। কিন্তু তাই বলে তুই মন খারাপ করে বসে থাকিস না। এখন বরেন্দি মুক্ত হয়েছে। তুই-ও মুক্ত হয়ে নিজের মাটিতে ফিরতে পেরেছিস। যদি তোর মা বেঁচে থাকে, তাহলে তার সাথে তোর দেখা হবেই হবে বাবা!

এত শান্ত স্বরের মধ্যেও এতটা দৃঢ়তার প্রকাশ থাকতে পারে, আগে কখনো শোনেনি পপীপ। তার মন অক্লেশে মেনে নেয় উর্ণাবতীর আশ্বাস। সে আবার মুহূর্তের মধ্যে আগের হাসি-খুশি ভাবটি ফেরত পায়।

মল্ল বলে– উর্ণাবতী তুমি আমাদের বাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছ পপীপকে?

তাই তো! ছেলেকে তো পুরো বাড়িটা দেখানো হয়নি এখনো।

পপীপ হাসে– পরে দেখলেও হবে। বাড়ি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

মল্ল হা হা করে ওঠে– সে কী কথা! যে মল্লর জীবন ছিল 'যেখানেই রাত, সেখানেই কাত' সেই মল্লর একটা অট্টালিকা হয়েছে। সেই অট্টালিকা তোকে দেখাতে না পারলে তোর কাছে আমি গর্ব প্রকাশ করব কী করে! যা যা! উর্ণাবতী ওকে দেখিয়ে আনো তো বাড়িটা। আমি ততক্ষণে কিছুক্ষণ নাকটা ডেকে নিই।

তোমার ঘুম পেয়েছে সেকথা বললেই তো হয় মল্লকাকা। আমরা নাহয় অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতাম!

আচ্ছা তাই যা! আমাকে একটু ঘুমাতে দে দেখি!

হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে পপীপ। কিন্তু এবার সত্যিই তার পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখার ইচ্ছা জাগে মনে। একেবারে রাজধানীর বুকে এমন একটি অট্টালিকা এখন মল্লর। বরেন্দি মুক্ত না হলে এমন চিন্তাও কি কোনোদিন সম্ভব ছিল কোনো কৈবর্তের মনে?

পপীপের মনের কথা যেন নিমেষে পাঠ করে ফেলতে পারে উর্ণাবতী। বলে– এই রকম অট্টালিকা মল্ল কি কোনোদিন তৈরি করতে পারে পপীপ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন মানসিকতার মানুষই তো সে নয়। নিজের জন্য একটি বাড়ি প্রয়োজন, এই চিন্তাই তো তার মাথায় আসবে না।

ঠিক। পপীপ বলে ওঠে– এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করাটা তো মল্ল নামের সাথেই বেমানান।

গর্বের হাসি হাসে ঊর্ণাবতী– ঠিক বলেছিস। মল্ল এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাববার মতো মানুষই নয়। এমনকি যখন আমাকে সে মুক্ত করে আনল কামরূপের অভিশপ্ত জীবন থেকে, তখনো সে কোনো বাড়ির কথা ভাবেনি। কিন্তু রাজা ভীম তাকে বাধ্য করেছে এই বাড়িটা গ্রহণ করতে।

এতক্ষণে একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

ঊর্ণাবতী আবার বলে– আগের যুগের, মানে পাল-সম্রাটের কোনো অমাত্যের বাসগৃহ ছিল হয়তো এটি। মহীপালের মৃত্যুর পরে পালিয়েছে তারা। সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে ভীম জোর করে উঠতে বাধ্য করল মল্লকে। তবু কী মল্ল স্বীকৃত হয় এটি গ্রহণ করতে! ভীম রাজা হয়ে হাতজোড় করে তাকে বলল যে, যাদেরকে তার সবসময় প্রয়োজন হয়, সেইসব পরামর্শক যদি রাজধানীতে না থাকে, তাহলে সে বরেন্দি পরিচালনা করবে কীভাবে! সমস্যায় পড়লে সে কোথায় খুঁজতে যাবে মল্লকে, কোথায় খুঁজতে যাবে উগ্রকে? একমাত্র তখনই মল্ল সম্মত হলো আমাকে নিয়ে এই বাড়িতে উঠতে।

পুরো বাড়ি ঘুরে দেখা হয়ে গেল। ঊর্ণাবতী আগে যেখানে ছিল, সেই কামরূপের কোষ্ঠকের তুলনায় এই বাড়িকে রীতিমতো শ্রীহীনই বলা চলে। বিশেষ করে বাড়িতে আসবাবপত্র বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু ঊর্ণাবতী এমন রাজেন্দ্রানীর ভঙ্গিতে পপীপকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়, তাতে এই বাড়ি নিয়ে তার যে প্রচ্ছন্ন একটি গর্ব রয়েছে তা বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। আসবাব না থাকাতেই যেন এই বাড়ি সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যময় হয়েছে। ঊর্ণাবতীর অবয়বের সাথে যেমন যোগ হয়েছে অপরূপ এক পবিত্রতার ছাপ, সেই একই রকম পবিত্র আভা ছড়িয়ে রয়েছে বাড়িটির সবগুলি কক্ষে। কিন্তু মনে মনে কোনো একটি জিনিসের অভাব বোধ করে পপীপ। ঠিক কী জিনিস, তা অবশ্য মনে পড়তে চায় না। কিন্তু ঊর্ণাবতীর সাথে অবিচ্ছেদ্য কোনো একটি জিনিস অবশ্যই ছিল। পপীপের মনে নেই। কিন্তু মনে মনে পুরো বাড়িতেই জিনিসটি খুঁজেছে সে। দেখলেই তার মনে পড়ে যেত। অবশেষে চকিতে তার মনে পড়ে জিনিসটার কথা। গৃহদেবতা! ঊর্ণাবতীর ঘরের কুলুঙ্গিতে সবসময় থাকত গৃহদেবতার বিগ্রহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনে অন্তত দুইবার ধূপ-ধুনো জ্বেলে গৃহদেবতার পূজা করত ঊর্ণাবতী। কিন্তু তেমন কোনো মূর্তি তো চোখে পড়ে না এই বাড়িতে! কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই বসে পপীপ– গুরুমা! তোমার গৃহদেবতা কোথায়? কোনটা তোমার পূজার ঘর?

একটু থমকে যায় ঊর্ণাবতী। তারপর ধীরকণ্ঠে বলে– বোকা ছেলেই রয়ে গেছিস তুই এখনো। আরে জলজ্যান্ত দেবতা সশরীরে উপস্থিত থাকলে পুতুল নিয়ে পূজা পূজা খেলতে যায় কেউ!

পপীপ আমতা আমতা করে– আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার দেবতা তো আমার সামনেই আছে। মল্লই আমার দেবতা!

তাহলে তুমি তোমার নিজের ধর্মও ত্যাগ করেছ? তোমাদের হিন্দু ধর্ম? আর্য ধর্ম?

ওটা আবার একটা ধর্ম হলো! যে ধর্ম শাস্ত্রের বিধান দিয়ে আমাকে দেবদাসী বানিয়েছিল, সেটি কোনো মানুষের পালনীয় ধর্ম হতে পারে রে পপীপ? তুই এখন বড় হয়েছিস। লেখাপড়া শিখেছিস। তুই জানিস, দেবদাসী আসলে কী। তুই তাহলে বল, যে ধর্ম আমাকে দেবদাসী বানিয়েছে, আমি সেই ধর্ম পালন করব, নাকি যে ধর্ম আমাকে দেবদাসীর কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমি নেই ধর্ম পালন করব। তুই নিজে হলে কী করতি?

তাহলে তুমি কি এখন আমাদের, মানে কৈবর্তদের ধর্ম পালন করছ?

না। আমার কোনো ধর্মপালনের প্রয়োজন নেই। আমার ধর্ম হচ্ছে আমার দেবতা, আমার মুক্তিদাতা, আমার প্রেমাস্পদ, আমার রক্ষক মল্লর সেবা করা। তার কাজে পাশে পাশে থাকা। সে যে যুদ্ধ করছে, সেই একই যুদ্ধে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা।

তুমিও যুদ্ধ করছ!

হ্যাঁ করছি তো। একে যদি যুদ্ধ বলা যায়, তাহলে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করছি।

কী করছ তুমি?

ঊর্ণাবতী নয়, উত্তর ভেসে আসে মল্লর কণ্ঠ থেকে– তোর গুরুমা এই বাড়ির বাইরের অংশে টোল খুলেছে। সকাল হলেই দেখতে পাবি, কৈবর্তদের নেংটিপরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে।

মল্লর কণ্ঠে একই সঙ্গে জীবনসঙ্গিনীর কাজ নিয়ে গর্ব, আর জীবনসঙ্গিনীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ঝরে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. ভীমের দর্শন

এতদিন পপীপের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে মল্লর চাইতে সুদর্শন এবং সুদেহী পুরুষ পৃথিবীতে আর একজনও নেই। কিন্তু ভীমকে একবার দেখামাত্র সে তার ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়। বরেন্দির লাল মাটির সাথে নদীপাড়ের কালো পলি মিশিয়ে দিলে যেমন বর্ণ ধারণ করে, সেই রকম গায়ের রং ভীমের। যারা মহাভারত পড়েছে, তারা ভীম নামটি শোনার সাথে সাথে তাদের মানসপটে ভেসে উঠবে বিশালদেহী এবং দানবাকৃতির একটি মানুষের অবয়ব। আবার ভীমের সাথে ভীষণ-এরও একটি সাযুজ্য সকলেই মনে মনে কল্পনা করে নেয়। কিন্তু কৈবর্ত নেতা ভীমের অবয়বের সাথে একেবারেই মিলবে না তাদের কল্পনা। ভীম দীর্ঘদেহী শালপ্রাংশু। কিন্তু দানবাকৃতির মোটেই নয়। শরীরের পেশিগুলি সুপুষ্ট, কিন্তু মোটেই ফোলা ফোলা নয়। যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তখন সকলকে ছাড়িয়ে যায় তার মাথা। তবু তাকে মোটেই ঢ্যাঙ্গা মনে হয় না। তার সমস্ত শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সোঁদামাটির সৌরভ। বরেন্দির অমাবস্যা রাতের মতো কালো কুঞ্চিত একমাথা চুল। ঠোঁটের হাসিতে অন্তরঙ্গতা আর বরাভয়ের বিচ্ছুরণ। আর তার কাছে গেলে টের পাওয়া যায়, তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে শক্তি এবং আভিজাত্যের জ্যোতি। একবার দেখামাত্র মনে মনে ভীমের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় পপীপ। তার মন বলে– হ্যাঁ এই হচ্ছে নেতা! যাকে দেখে মনে সাহস আসে, যার হাসি দেখে অভয়মন্ত্র বেজে ওঠে প্রাণে, যার সংস্পর্শে এলে নিজের মধ্যেও জ্বলে ওঠে মৃত্তিকাপ্রেমের শুদ্ধ অগ্নিমন্ত্র।

কিন্তু তাকে কি রাজা বলা যায়? আর এই নাকি রাজপ্রাসাদ! আর এই নাকি রাজপ্রাসাদের প্রধান সভাকক্ষ! কোথায় তার জৌলুষ! কোথায় তার মনোহারিণী চাকচিক্য? কোথায় তার দম্ভ এবং আভিজাত্যের প্রতীক রাজমুকুট? কোথায় তার ক্ষমতার নিরংকুশ প্রতীক রাজসিংহাসন?

একটা কাঠের তেপায়ার ওপর বসে আছে ভীম। বসে আর থাকছে কই! প্রায় প্রতিমুহূর্তেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। কখনো কারো সাথে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে কক্ষের কোনো এক কোণের দিকে, কখনো তেপায়ার সামনে দাঁড়িয়েই সেরে নিচ্ছে কথা, কখনো কাউকে স্বাগত জানাতে নিজেই চলে আসছে দ্বারপ্রান্তে, কখনো কাউকে কথা বলতে বলতে বা পরামর্শ দিতে দিতে নিজেই পৌঁছে দিচ্ছে বহির্গমনের দ্বার পর্যন্ত। অতিথি-দর্শনার্থীদের জন্য একই ধরনের তেপায়া বিছানো রয়েছে। কিন্তু স্বয়ং রাজাই যেখানে বসছে না, সেখানে

পিতৃগণ– ১৬ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যেরা আর বসে থাকে কীভাবে! তাই বেশিরভাগ তেপায়াই খালি। আর সভাকক্ষে উপস্থিত সকলেই নিজ নিজ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে।

দ্বাররক্ষী একজন আছে বটে। কিন্তু সে বোধহয় নামেই দ্বাররক্ষী। কারণ কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে কোনো বাধাই দিচ্ছে না সে। কারো দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শত্রু না মিত্র তা বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত করছে না। করবেই বা কীভাবে! সেই অবসর পেলে তো করবে। একসঙ্গে যত মানুষ আসছে বা যাচ্ছে, সে কয়জনের প্রতি দৃকপাত করবে! এসব বুঝেই হয়তোবা সে হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বাররক্ষী নামের অলংকার হয়ে।

পপীপ অবাক হয়ে দেখছিল। কোনো রাজাকে সে চাক্ষুষ করেনি বটে, কিন্তু বিভিন্ন পুরাণ এবং কাব্য পাঠ করে রাজা এবং রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তা নিমেষে মিলিয়ে যায় রাজা ভীমের সামনে এসে। মল্লর পাশে দাঁড়িয়ে সে নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিল ভীমের প্রতিটি নড়াচড়া। মল্ল নিজেও কোনো কথা বলেনি। জানে, ভীমের লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি তাদের ঠিকই দেখতে পেয়েছে। সময় হলে ঠিকই তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে।

ভীমের কথা শুনছে, আর মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে পপীপ। এই বরেন্দি-গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধনের প্রতিটি ধূলিকণাই কি ভীমের পরিচিত? তা নাহলে সে অবলীলায় দেশের সকল প্রান্ত থেকে আসা প্রতিটি সমস্যার এমন তাৎক্ষণিক সমাধান দিচ্ছে কীভাবে? আবার একই সাথে দূরে থেকে বা কাছে থেকে আসা সাক্ষাৎপ্রার্থীকে উপযুক্ত আপ্যায়নের দায়িত্বও দিয়ে দিচ্ছে সহচর-অনুচরদের।

সভাকক্ষে ভিড় কমে এলে মল্ল আর পপীপের দিকে তাকায় ভীম। রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়ায় পপীপ– মহামহিম মহারাজ ভীমকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

হো হো করে হেসে ওঠে ভীম। কাছে এসে জড়িয়ে ধরে পপীপকে। বলে– এখানে তুমি মহারাজা কোথায় দেখলে? রাজাই বা দেখলে কোথায়? এখানে আছি আমি। আমি ভীম। বাবা-জ্যাঠার পথ ধরে কৈবর্তরা আমাকে বসিয়ে দিয়েছে তাদের নেতার আসনে। এখানে কোনো রাজা নেই বন্ধু! আমরা সবাই এই মৃত্তিকার সন্তান। এক-একজন এক-একটা দায়িত্ব পালন করছি এইমাত্র।

মল্ল পরিচয় করিয়ে দিতে যায়– এই হচ্ছে পপীপ!

হাতটা আলগা করেছিল ভীম। পপীপের পরিচয় শোনামাত্র আবার তাকে সবলে বুকের সাথে চেপে ধরে ভীম। মুখে বলে– অবশেষে এলে ভাই! আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বছরের পর বছর তোমার অপেক্ষা করছি। কয়েকদিন আগে মল্ল যখন দেদ্দাপুর সীমান্ত থেকে সংবাদ পাঠাল যে তুমি এসেছ, সেদিন থেকে আমার ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইছে না। অবশেষে তুমি এলে ভাই! তোমার মাটিই তোমাকে ডেকে এনেছে। তোমার মাটিই তোমাকে দিয়ে তার ঋণ শোধ করিয়ে নেবে। তুমি যে এই মাটির যোগ্য সন্তান ভাই।

মল্লর দিতে ফিরে ভীম বলে– চলো আমরা আমার নিজের কক্ষে যাই। সেখানে মন খুলে কথা বলা যাবে। কেউ খুব অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া সেখানে আমাদের বিরক্ত করবে না।

ভীমের শয়নকক্ষে এসে আরেক বার অবাক হওয়ার কথা। কিন্তু ইতোমধ্যে যেহেতু ভীমকে চিনে ফেলেছে পপীপ, তাই তেমন অবাক হয় না সে। পালকশয্যা যে থাকবে না, থাকবে না কোনো জৌলুষের ছোঁয়া– এ ব্যাপারে আগেই নিশ্চিত ছিল পপীপ। কিন্তু একটু অবাক তাকে হতেই হয়, যখন দেখে ঘরে একটা চারপাই আর দুই-তিনটি আসন ছাড়া আর কিছুই নেই। আর অল্প কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে দেয়ালের তাকগুলিতে। তার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হাসে ভীম। বলে– কৈবর্তের সবচেয়ে শক্তির দিক কী তা কি জানো কবি? সেটা হচ্ছে কৈবর্তের জীবনে বাহুল্যের কোনো স্থান নেই।

আসন পেতে নিয়ে তাদের বসতে ইঙ্গিত করে একটি তাকের দিকে এগিয়ে যায় ভীম। তাক থেকে নামিয়ে আনে কয়েকটি ভূর্জপত্র। তাতে খাগের লেখনী দিয়ে লেখা কবিতা। সেগুলোর ওপর একবার দৃষ্টি বুলায় ভীম। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে তিক্ত একটি হাসির রেখা। সে নিঃশব্দে ভূর্জপত্রগুলি এগিয়ে দেয় পপীপের দিকে।

পপীপ পড়তে থাকে–

শ্রীঘনায় নমঃ সদা

শ্রী শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভুজেনাগাং

দধতং কং দাম জটালম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে।।

"শ্রী বুদ্ধকে নমস্কার!

শশিখণ্ডমণ্ডিত নীলকণ্ঠ শোভাময় শেষনাগবিভূষিতভুজ কপালমাল জটাবলম্বী মহেশ্বরকে বন্দনা করি।

কণ্ঠালিঙ্গলক্ষ্মী গোবর্দ্ধনধৃতবাহু, বালরজ্জুনিবদ্ধজটাজালসমন্বিতশির বাদ্যবেণু ও ময়ূরপুচ্ছশোভিত বাসুদেবকে বন্দনা করি।

বলীবর্দ্দদমনপাদ মেঘে-সূর্যে অদ্রব অজেয় হিমালয় হইতে উদ্ভূত গৌরীসহ বিরাজিত মহেশ্বর আপনাদের শুভবিধান করুন!– যিনি প্রথমে কামদেবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভস্মীভূত করিয়া অকল্যাণ সাধন করতঃ সুরসেনা কার্তিকেয়ের জন্মদানে পশ্চাৎ উপকার করিয়াছিলেন।

যে সূর্য পদ্মসমূহকে বিকশিত করিয়া লক্ষ্মীকে প্রকাশ করেন এবং চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ আলোকাভাবে ক্ষীণ হইয়া অমাবস্যা দিবসে যে সূর্যে যাইয়া প্রবেশ করেন, সেই সূর্য আপনাদের ঐশ্বর্য বিস্তার করুন!

যে জলপতি সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী প্রকাশিত হইয়াছিলেন, প্রলয় সময়ে বাসুদেব সমগ্র লোক উদরসাৎ করিয়া যে সমুদ্রে প্রবেশ করেন, সেই সমুদ্র আপনাদিগের ঐশ্বর্য বর্দ্ধিত করুন!"

অপূর্ব!

নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে মনের মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়ে যায় পপীপের। সংস্কৃত ছন্দগুলির মধ্যে আয়ত্ত-দূরুহতম ছন্দ আর্যা। শব্দ এবং অলংকারের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব না থাকলে সহজে কোনো কবি এই ছন্দে কাব্য লিখতে চান না। এই কয়েকটি শ্লোক পাঠ করেই কবির অসাধারণত্ব টের পাওয়া যায়। এমন শ্লোক রচনার স্বপ্ন দেখে প্রত্যেক কবিই।

পপীপের চোখে কবির প্রতি মুগ্ধতা লক্ষ করে ভীম মৃদু হাসে। মুখে বলে– সত্যিই অসাধারণ তাই না! আমি সংস্কৃত তেমন ভালো জানি না। কিন্তু এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি এই শ্লোকগুলির রচয়িতা 'কুমারসম্ভব'-এর কবির সাথে তুলনীয়।

পপীপ এবার প্রশংসার চোখে তাকায় ভীমের দিকে। উচ্চাঙ্গের কাব্যরসের আস্বাদন করতে পারে যে লোক, তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতেই হয়। ভীমের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায় পপীপের। এবার যখন ভীম কথা বলে, তার কণ্ঠস্বরে তীব্র তিক্ততা প্রকাশ পায়– এমন একজন কবি যখন আমাদের পিতৃগণকে পাষণ্ডরূপে চিহ্নিত করেন, তখন আমাদের সকল অর্জন বৃথা হয়ে যায় পপীপ!

বুঝতে পারলাম না। মল্লকাকা অবশ্য বলছিল বটে যে সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্তদের মুনষ্যেতর প্রাণীরূপে চিহ্নিত করছেন তার কাব্যে। আমি অবশ্য সেগুলি এখনো পাঠ করিনি।

ভীম মাথা নাড়ে। বলে– নিচের ভূর্জপত্রগুলি দেখো!

সমান মুগ্ধতা এবং প্রত্যাশা নিয়ে পরের শ্লোকগুলি পড়তে শুরু করে পপীপ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ-চোখ লাল হতে শুরু করে, মাথা দিয়ে আগুনের ভাপ বেরুতে থাকে, এমনকি ক্রোধে সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যের পরবর্তী শ্লোকগুলি কৈবর্ত জাতি এবং দিব্যোকের কুৎসায় পরিপূর্ণ। কৈবর্ত জাতি দৈত্য, অসুর, মৎস্য-হন্তারক। আর দিব্যোক ছিলেন 'অতি কুৎসিত নৃপ' এবং 'উপধিব্রতিনা' (ছলনাময়)। "মারীচ যেমন রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তেমনই উপধিব্রতিনা দিব্যোকের দ্বারা মহীপাল অপহৃত এবং নিহত হয়েছিলেন।"

কোনো কবি এতটা মিথ্যাচার করতে পারেন! তাহলে কবিকে যে 'সত্যদ্রষ্টা' বলা হয়ে থাকে সে কি নিতান্তই ভুল অভিধা? কবির পক্ষপাত থাকতেই পারে। কিন্তু নিজের পক্ষপাতিত্বের কারণে সত্যভাষণে পরাঙ্মুখ হন না বলেই তো কবির অভিধা 'সত্যদ্রষ্টা'। সন্ধ্যাকর নন্দী এই সত্যটা ভুলে গেছেন বলেই তিনি শক্তিমান কবি হয়েও পপীপের চোখে এখন আর সত্যদ্রষ্টা নন।

পপীপ চোখ তুলে দেখতে পায় ভীমের চোখে টলটল করছে অশ্রু। এই অশ্রু যে তারই মতো তীব্র ক্রোধ এবং ক্ষোভ থেকে উদ্গত তা বুঝতে সময় লাগে না পপীপের। সে উঠে দাঁড়ায়। তীব্রকণ্ঠে বলে– আমি প্রতিজ্ঞা করছি! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী যত শক্তিমানই হোন না কেন, আমি তাকে পরাজিত করবই! আমি আমার জীবনপাত করব সত্য প্রতিষ্ঠা করে কাব্যরচনাতে।

আরেকবার পপীপকে আলিঙ্গন করে ভীম। উল্লসিত কণ্ঠে বলে– আমি জানতাম ভাই! আমি জানতাম সখা! যে জাতির মহান রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তোমার-আমার দেহের শিরায় শিরায়, সেই রক্ত আমাকে আগেই জানিয়েছিল যে তুমি এই একক যুদ্ধে এগিয়ে আসবেই।

কোথায় পাওয়া গেল এই শ্লোকগুলি? সন্ধ্যাকর নন্দী নিঃসন্দেহে বরেন্দিতে থাকেন না। তাহলে এখানে কোত্থেকে এল তার রচিত পংক্তিমালা?

সন্ধ্যাকর নন্দী তার প্রভু রামপালের সাথে তারই আশ্রয়ে থাকেন। রামপাল যেখানে যায়, কবিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আমাদের বরেন্দির চারপাশ ঘিরে যতগুলি কৈবর্ত-বৈরি রাজ্য রয়েছে, রামপাল সবগুলি রাজ্যের রাজা-অমাত্যকে নিজের দলে ভেড়ানোর জন্য সোনা-রূপা-অর্থ-অলংকার নিয়ে সেসব রাজ্যে যায়। সেখানে তাদের আলোচনা হয়, আর্থিক লেন-দেন হয়, তারপরে সেই রাজ্যের বিশিষ্টজনদের নিয়ে শুরু হয় কাব্যপাঠের অনুষ্ঠান। সেখানে সন্ধ্যাকর নন্দী পাঠ করেন তার শ্লোকসমূহ। রামপাল পূর্বাহ্নেই আখরিয়াদের দিয়ে ভূর্জপত্রে তৈরি করে রাখে এইসব শ্লোকের একাধিক প্রতিলিপি। পরদিন তারা সেই স্থান ত্যাগ করে বটে, কিন্তু রয়ে যায় এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্লোক। আর্য-কথকরা হট্ট-সমাবেশগুলিতে পাঠ করে শোনায় এইসব শ্লোক। যারা সত্য ঘটনা জানে না, তারা সকলেই এই শ্লোক শুনে দিব্যোককে ঘৃণা করতে শুরু করে। আর সাথে সাথে কৈবর্ত-বিরোধিতায় একত্রিত হয়। আমি গুপ্তচরদের মাধ্যমে জেনেছি, এইসব শোকের অনুলিপি গোপনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গৌড়-বরেন্দি-পুণ্ড্রবর্ধনের বড় বড় সকল মন্দিরে এবং মহাবিহারগুলিতে। এইভাবে সন্ধ্যাকর নন্দীর কবিত্বশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে কৈবর্ত জাতির বিপক্ষে। আমি তোমার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি ভাই, তুমি এমন শ্লোক রচনা করবে, যা থেকে এখনকার এবং ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারবে সত্যি সত্যি কেমন ছিলেন দিব্যোক, আর কী ঘটেছিল বরেন্দিতে।

পপীপ নিজের পূর্বপ্রতিজ্ঞা আবার উচ্চারণ করে– বরেন্দি-মাতার ঋণ পরিশোধের জন্য আমি আমার সমস্ত মেধা নিয়োজিত করব!

ভীমকে একটু আশ্বস্ত দেখায়। বলে– এবার বলো তুমি কোথায় অবস্থান করতে চাও বলো? যদি রাজধানীতে থাকতে চাও, তাহলে তোমার জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করব আমরা। বরেন্দির অন্যত্র অবস্থান করতে চাইলে সে ব্যবস্থাও করা হবে। তবে আমি চাই তুমি এমন জায়গাতে অবস্থান করে কাব্যরচনা করবে, যেখানে থাকলে যুদ্ধ এবং অন্যান্য গোলযোগ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

পপীপকে একটু বিমূঢ় দেখায়– সমস্ত বরেন্দি আত্মরক্ষার যুদ্ধে নিয়োজিত, আর আমি সেই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকব!

ভীম তাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে– যুদ্ধ কী আর শুধু একভাবে হয় পপীপ! তোমাকে যে কাজটি করতে হবে, সেটা কি যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? তোমার কাজটিও তো যুদ্ধই। বরং যে কোনো একজন সৈনিকের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধরো, আমি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে না যাই, তাহলে আমার অস্ত্রটি নিয়ে আরেকজন কৈবর্ত ঠিকই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তোমার কাজটি তো তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না বন্ধু। তাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামিয়ে আমরা যদি তোমাকে হারাই, তাহলে কৈবর্তজাতির যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। এত বড় ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না পপীপ।

পপীপ জানে একজন রাজার সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সমস্ত ভব্যতার বিরোধী। কিন্তু কিছুতেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতে সম্মত নয়। সে বলে– আপনার সিদ্ধান্তের পরে যে কোনো কথা বলাই ধৃষ্টতা। তবু আমাকে বলতে হচ্ছে। আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন রাজা! আমার একটি যুক্তি শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনায় নেবার জন্য আমি শেষবারের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। যে কবি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, সে কীভাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কাব্যরচনা করতে পারে? তার কাছে যুদ্ধ নিজের স্বরূপে কোনোদিনই ধরা দেবে না। ফলে সেই কাব্য হবে অক্ষম এবং ব্যর্থ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি সম্মুখ সমর এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব। তবে কৈবর্তজাতির এই অস্তিত্বের যুদ্ধ থেকে আমাকে দূরে থাকতে বলবেন না। আর আমি ভালো তত্ত্বাবধায়কের অধীনেই থাকব। তিনি আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ভীম। জিজ্ঞেস করে– তুমি কার তত্ত্বাবধানে থাকতে চাও?

মল্লর দিকে তাকিয়ে হাসে পপীপ– মল্লকাকার সঙ্গে থাকলে আমি যে নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস পাই, কোনো অবোধ বালক তার পিতার আশ্রয়ে থেকেও অতখানি নিরাপদ বোধ করে না।

ভীম আর দ্বিমত করে না– ঠিক আছে মেনে নিলাম তোমার ইচ্ছা।

ফেরার সময় মল্ল বলে– তুই ভীমের কথায় সম্মত হয়ে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাইলে আমি ভীষণ মর্মাহত হতাম রে পপীপ! বোধহয় ঊর্ণাবতীও সেটি পছন্দ করত না।

আমি জানি মল্লকাকা।

১৩. খবর আসছে প্রতিনিয়ত

সেগুলির সিংহভাগই আবার অমঙ্গল-বার্তা।

মথন দেব, তার দুইপুত্র কাহ্নুর দেব-সুবর্ণ দেব, তার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ দেব, তার জামাতা দেবরক্ষিত তো আগে থেকেই রামপালের সকল কাজের সঙ্গী। শোনা যাচ্ছে এখন তাদের জোট ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে। রামপাল স্বর্ণ-রৌপ্য দুই হাতে বিলিয়ে চলেছে মিত্র ক্রয়ের জন্য। সামন্ত বা মহাসামন্তরা যা দাবি করছে, সেই দাবিই মেনে নিচ্ছে রামপাল। নিজের সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে হলেও সে জনক-ভূ বরেন্দিকে পুনরাধিকার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে তো জানে, বরেন্দিকে পুনরায় হস্তগত করতে পারলে এর চাইতে অনেক গুণ বেশি সম্পদ অর্জন করা যাবে এক বছরেই। তাই টাকার বস্তা হাতে নিয়ে ছুটছে রামপাল। বরেন্দির রাজকোষ থেকে সে সব সম্পদ চুরি করে পালিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলি অকাতরে কাজে লাগাচ্ছে বরেন্দি পুনরাধিকারের যুদ্ধে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার মায়ের সঞ্চিত সকল সম্পদ। প্রয়োজনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে মাতুল মথন দেব। একে একে রামপালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মগধের ভীমযশা, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির অধীশ্বর জয়সিংহ, অপরমন্দারের লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর শূরপাল এবং নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। পূর্বে বরেন্দির সামন্ত রাজ্য ছিল, এমন এগারোটি রাজ্যের সকল সামন্ত রাজাই যোগ দিয়েছে রামপালের সাথে। তাদের প্রত্যেককে রামপাল দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা, একশত জন রাষ্ট্রকূটবংশীয়া সুন্দরী তরুণী, এবং সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার পরে দশ বৎসর কর দেওয়া থেকে অব্যাহতির প্রতিশ্রুতি।

এসব সংবাদ শুনে ভীমের পরামর্শক পদ্মনাভ এবং সেনাপতি হরিবর্মার কপালের কুঞ্চন বেড়ে চলে। তারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির পরামর্শ দেন অবিরত। হরিবর্মা মনে করিয়ে দেন যে, শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী না থাকলে যুদ্ধে জয়লাভ করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। বরেন্দিতে ঘোড়া পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী কোচ রাজার সাথে ভীমের কথা হয়েছিল। তিনি পাঁচ সহস্র অশ্ব বিক্রয় করবেন। সেই পরিমাণ অর্থও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি অশ্ব প্রদানে নিজের অপারগতা জানিয়ে ভীমের প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাঠিয়েছেন। মল্ল জানিয়েছিল যে সে দেখেছে অনেক দূরের দেশ থেকে তুরুক জাতির মানুষরা আসে ঘোড়া বিক্রি করতে। তাদের ঘোড়াগুলি খুবই বলিষ্ঠ এবং সুদেহী। তারা আসে সমুদ্রপথে অনেক বড় নৌযান নিয়ে। কিন্তু তাদের দেখা পেতে হলে যেতে হবে তাম্রলিপ্ত বন্দরে। সেটি আবার বৈরিরাজ্য সমতটের ওপারে। তাই তুরুক জাতির বৈশ্যদের সাথে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। তখন সেনাপতি উগ্র পরামর্শ দেয় অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গঠন করা হোক মহিষারোহী বাহিনী। প্রথমে প্রস্তাবটিকে হাস্যকর মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এটিকেই একমাত্র কার্যকর সমাধান বলে গণ্য করতে হয়েছে। বরেন্দির বনাঞ্চলে প্রচুর বুনো মহিষ পাওয়া যায়। সেগুলি বিশালদেহী এবং দ্রুতগামীও বটে। সেগুলিকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারলে আগ্রাসনকারীদের অগ্রগতি রোধ করে দেওয়া পুরোপুরিই সম্ভব হবে। সেই মহিষারোহী বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেনাপতি উগ্রকেই।

মনমতো অশ্বারোহী বাহিনী গড়তে না পেরে মনে মনে মুষড়ে পড়েন সেনাপতি হরিবর্মা। মনে মনে আশংকিত হন পদ্মনাভও। তিনি ভীমকে বোঝান যে, সৈন্যদল গড়তে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত। মহাভারত থেকে ভীষ্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ভীমকে মনে করিয়ে দেন যে, রাজ্যের অঙ্গ হচ্ছে সাতটি। এগুলোর যে কোনো একটিও দুর্বল হলে রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সাত অঙ্গ হচ্ছে– রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, রাজকোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য।

পদ্মনাভ বলে চলেন– আমাদের বরেন্দ্রীতে রাজা আছেন কি না বোঝা যায় না। রাজকোষ তো প্রথমাবধি শূন্য, দুর্গের কোনো চিহ্নই নেই এই রাজ্যে। এখন সৈন্যদলকে যদি দুর্বল করে রাখা হয় তাহলে বিপদে সহায় হবে কে?

ভীম হেসে বলে– বিদ্বান পদ্মনাভ, আপনার যত শ্রদ্ধাই থাকুক ভীষ্মের প্রতি, আমি কিন্তু তার প্রতিটি বাক্য অকাট্য বলে মেনে নিতে সম্মত নই। তিনি রাজ্যের সাতটি অঙ্গের কথা বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা ভিত্তির কথাই উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। সেই ভিত্তি হচ্ছে প্রজাপুঞ্জ। অথবা সাধারণ জন। তারা যদি রাজা বা নেতার সহায় হোন, তাহলে অবশিষ্ট সকল অঙ্গের ঘাটতি পূর্ণ করা কোনো সমস্যাই নয়। আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে প্রতিরক্ষা-বাঁধের কথাই ধরুন। প্রজাপুঞ্জ বিনা পারিশ্রমিকে মাসের পর মাস কাজ করে নির্মাণ করছে সেই দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। আর কোথাও আপনি দেখতে পাবেন এমন উদাহরণ!

হ্যাঁ। এমন ঘটনা অশ্রুতপূর্বই বটে। মেনে নেন পদ্মনাভ। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন– কিন্তু সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আপনার এই বিপুল জনসমর্থন তেমন ফলদায়ক হবে না নেতা। তারজন্য আপনারও থাকতে হবে অনুরূপ প্রশিক্ষিত সেনাদল।

একথার উত্তরে চুপ করে থাকে ভীম। কিছুক্ষণ নিজেও আর কোনো কথা না বলে ভীমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেন পদ্মনাভ। তারপরে বলেন– তাছাড়া আমাদের প্রজাদের মধ্যে কৈবর্ত ছাড়াও একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ রয়েছেন যারা অন্য জাতির। যেমন কোল, ভিল, শবর, রাজবংশী। রামপালের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে এইসব জাতির মানুষদের আমরা পাশে পাব কি না, পেলেও তারা কোন ধরনের সহযোগিতা করবেন– ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। তাদের নেতা বা মোড়ল-মণ্ডলের সাথে আমাদের অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা উচিত বলেই আমি মনে করি।

একথায় সায় দেয় ভীম। বলে– যদিও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এইসব জাতির মানুষ কখনোই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তবুও আপনার এই যুক্তি ঠিক যে তাদের সাথে আমাদের আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসা প্রয়োজন। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস– তারা আমাদের শুধু যে সমর্থন করবে তাই-ই নয়, বরং তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে। কারণ তাদের স্বার্থ এবং কৈবর্তদের স্বার্থ তো এক এবং অভিন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষণ্ন একটুকরা হাসি ফোটে পদ্মনাভের ঠোঁটে– আমরা যেভাবে ভাবছি, তারাও যে সেভাবেই চিন্তা করছে, এমন নিশ্চয়তা আমরা পাচ্ছি কোথায়! বরং আমার কাছে যে সংবাদ রয়েছে, তা উদ্বেগজনকই।

ভ্রু কুঁচকে তাকায় ভীম– কেমন?

পদ্মনাভ বলেন– আমি বিশেষ করে রাজবংশীদের কথা বলতে চাই। আমার ধারণা, তারা নিজেদেরকে কৈবর্তদের সাথে এক করে ভাবে না বলেই আমি জেনেছি।

এবার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে পদ্মনাভের দিকে তাকায় ভীম। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে– তাই কোনোদিন হতে পারে? না। এ আমি বিশ্বাস করি না।

পদ্মনাভের ঠোঁটের কোণে আবার সেই বিষণ্ন হাসি– তাহলে আমরা কাল সকালেই যাই না কেন রাজবংশী নেতাদের সাথে কথা বলতে!

ঠিক আছে। ভীম সায় দেয়– আমরা কাল সকালেই যাব।

এই সময় মল্লকে দেখা যায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। ঢুকবে কিনা ভাবছে। তাকে দেখামাত্র আহ্বান জানায় ভীম– এসো মল্ল! কোনো সমস্যা?

মল্ল কথা বলার আগে একবার পদ্মনাভের দিকে তাকায়। তারপর বলে– পঞ্চনগরী থেকে সংবাদ এসেছে। সেখানে যে বার বার গুপ্তঘাতকের আক্রমণ হচ্ছে এ সংবাদ রাজা তো আগে থেকেই জানেন। আমাদের প্রতিরোধী সৈন্যরা তাদের কোনো আক্রমণই প্রতিহত করতে পারেনি এ পর্যন্ত। কারণ তারা এমন আচমকা উদয় হয়, আর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে নগরবাসীর ক্ষতি করে আবার প্রহেলিকার মতোই মিলিয়ে যায়। এতই দ্রুত তারা চলে যায় যে আমাদের সৈন্যরা একদিনও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ পায়নি। তারা সংবাদ পেয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে গুপ্তঘাতকদের তাড়া করতে যায় বটে। কিন্তু নগরপ্রান্তে পৌঁছে তারা আক্রমণকারীদের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পায় না। তারা যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়। আর গতরাত্রিতে তারা সরাসরি আক্রমণ করেছে আমাদের প্রতিরোধী সৈন্যদের শিবিরেই। অল্প কয়েকজন মাত্র সৈন্য ছিল আমাদের। তারা সকলকেই হত্যা করেছে। তারপর যথারীতি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পঞ্চনগরীর অধিবাসীরা এখন ভীত-সন্ত্রস্থ। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মানুষ পঞ্চনগরী ছেড়ে পালাতে শুরু করবে।

কী ব্যবস্থা নিতে চাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্ল বলে– অবিলম্বে সেই রাস্তাটি খুঁজে বের করতে হবে, যে পথ দিয়ে আক্রমণকারীরা আসে।

ভীমের কপালে কুঞ্চন। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলে এমন হয় তার। তাই কথা না বলে অপেক্ষা করে মল্ল। কিছুক্ষণ পরে ভীম জিজ্ঞেস করে– পঞ্চনগরী থেকে সীমান্ত কত দূরে?

মনে মনে পথ-গণনা করে মল্ল। বলে– ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে এলেও তা অন্তত আধাবেলার পথ। সেই জন্যই তো দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এতটা দূরত্ব ওরা এত নিঃশব্দে কীভাবে পেরিয়ে আসে? আবার কীভাবেই বা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়!

ভীম জিজ্ঞেস করে– তোমার কি মনে হয় না...

মল্ল কেড়ে নেয় তার মুখের কথা– হ্যাঁ। আমার মনে হয় ওরা আমাদের মাটিতেই কোনো গুপ্ত আশ্রয়ে বাস করছে। আমাদের সৈন্যরা পঞ্চনগরীর আশপাশের সকল বনভূমি, পাহাড়ি গুহা, টিলার আড়াল– সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কিন্তু কোথাও কোনো গোপন আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকি নগরীর মধ্যেও সকল সন্দেহজনক স্থানে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাদের পাওয়া যায়নি।

ভীম এবার একটু হাসে। জিজ্ঞেস করে– পঞ্চনগরী থেকে জগদ্দল বৌদ্ধবিহারের দূরত্ব কতটুকু?

খুব সামান্য। বলেই উত্তেজনায় ফেটে পড়ে মল্ল– হায় ঠাকুর! আক্রমণকারী গুপ্তঘাতকের দল তো জগদ্দল বৌদ্ধবিহারেই আছে! একথা একবারও আমাদের কারো মনে হয়নি কেন! হায় রে আমরা এতই অযোগ্য! আমাদের এই অযোগ্যতার দরুণ কত যে ক্ষতি হয়ে গেল!

ভীম এগিয়ে আসে। সান্ত্বনার হাত রাখে মল্লর কাঁধে– নিজেকে শুধু শুধু দোষী আর অযোগ্য ভেবো না মল্ল। কেইবা সন্দেহ করবে যে একটি শ্রদ্ধার জায়গা এবং ধর্মীয় পীঠস্থান ব্যবহৃত হচ্ছে শত্রুর আশ্রয়স্থলরূপে! অনুশোচনায় সময় নষ্ট না করে যাও, যত শীঘ্র পারো প্রতিবিধান করো এই দুষ্কর্মের।

১৪. মহাবিহার অবরোধ

মধ্যরাতে চার পাশ থেকে ঘিরে ফেলা হলো জগদ্দল মহাবিহার।

দ্বিতলের দুই-তিনটি প্রকোষ্ঠে আলো দেখা যাচ্ছে। সেসব প্রকোষ্ঠে থাকেন সত্যিকারের বুদ্ধশিক্ষা নিয়ে পাঠরত অধ্যাপকরা। কিন্তু নিচের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকোষ্ঠের আলো বাইরে আসতে পারছে না। কারণ সেইসব কক্ষের ভেতরে তখন চলছে পঞ্চ ম-কারের সাধনা। মুদ্রা, মাংস, মদ্য, মৎস্য এবং মৈথুনের ছড়াছড়ি। কোনো কক্ষে মেঝেতে জ্যামিতিক নকশা এঁকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সাধকরা মিলিত হচ্ছে সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে। কোনো প্রকোষ্ঠে চলছে যুগলনৃত্য। কোনো প্রকোষ্ঠে পাঠ হচ্ছে এমন সব তান্ত্রিক মন্ত্রের যা যতখানি তান্ত্রিক, তার চাইতে বেশি আদিরসাত্মক। সকল পন্থারই শেষফল একই। যথেচ্ছ নারীসম্ভোগ। এদের কাছে মৈথুন হচ্ছে নির্বাণের প্রাথমিক পর্যায়। এদের শাস্ত্রে নারীর যৌনাঙ্গের নাম হচ্ছে প্রজ্ঞা, যা সকল সুখের আধার। আর পুরুষ এখানে আদর্শ, যার আরেক নাম বজ্র। যদিও বজ্র বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গকেই বোঝানো হয়। প্রজ্ঞা ও আদর্শ, তথা নারী ও পুরুষের মৈথুনে অনন্ত পুলকের উপলব্ধি ঘটে, যাতে অন্য সকল মানসিক ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য হলেও হারিয়ে যায়, চারদিকের বাহ্যজগৎ অবলুপ্ত হয় এক সর্বব্যাপী একত্বের মধ্যে। এটাই সেই মহাসুখ, যার আরেক নাম নির্বাণ, এবং এটাই বোধিচিত্তের যথার্থ প্রকাশ।

পপীপ কাছ থেকে এর আগে কোনো বৌদ্ধ মহাবিহার দেখেনি। আজ মহাবিহারের বিস্তার এবং বিশালতা দেখে সে অবাক হয়ে যায়। এ তো রীতিমতো একটি নগর! এটি যদি একটি বিদ্যাপীঠই হয়ে থাকে, তাহলে এর চারপাশ এই রকম প্রাকারবেষ্টিত কেন? বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই তো শিখবে না। গৌতম বুদ্ধ কি এই রকম কোনো মহাবিহার চেয়েছিলেন তার শিষ্যদের জন্য? মনে হয় না। যিনি নিজেকে রাজপ্রাসাদের আঙিনা থেকে মুক্ত করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীজুড়ে, তিনি কীভাবে এই রকম বদ্ধ প্রকোষ্ঠ অনুমোদন করবেন তার পরবর্তী প্রজন্মের শিষ্য-অনুসারীদের জন্য! আর ধর্ম তো মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে না গেলে কীভাবেই বা প্রচারিত হবে বুদ্ধের বাণী! তবে মনের মধ্যে কৌতূহল বাড়তে থাকে পপীপের। কী হয় এইসব মহাবিহারের অভ্যন্তরে, তা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি বলেই মল্লর সাথে এই অভিযানে যোগ দিয়েছে পপীপ।

মহাবিহারের চারপাশে মল্লর লোকেরা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যেন তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি মাছিও বিহার থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে বা ঢুকতে না পারে। মূল দরোজার সামনে নিজে রয়েছে মল্ল। চারভাগে বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র সৈনিকরা অবস্থান নিয়েছে চারটি দরোজার সামনে। প্রত্যেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদলের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা। এই অশ্বারোহী দল প্রাকারের পাশ দিয়ে অনবরত প্রদক্ষিণ করতে থাকবে মহাবিহারের চতুঃসীমা।

তক্ষকের ডাক ভেসে আসে। বোঝা যায়, শেষ হয়ে আসছে রাত্রি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যুষের কোমল আলো ফুটে উঠবে বরেন্দির আকাশে। বরেন্দির মানুষ যে মুহূর্তে অন্য আলোর সাহায্য ছাড়াই দেখতে পায় নিজের হাতের কররেখা, তখনই শুরু হয় তাদের প্রত্যুষ।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কৈবর্তযোদ্ধারা। যেন আগে-ভাগে শোরগোল তুলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না মহাবিহারবাসীদের। তাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই।

প্রত্যুষের ঠিক আগের মুহূর্তে খুলে যায় মহাবিহারের প্রধান দরোজা। হলুদে ছোপানো বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক শিক্ষার্থীর দল বেরিয়ে আসে একসারিতে। তারা প্রদক্ষিণ করবে মহাবিহারের সামনে রক্ষিত পবিত্র চৈত্য। এই চৈত্য-প্রদক্ষিণ দিয়েই শুরু হয় তাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম।

তারা বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়ায়। সামনে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র যোদ্ধার দল। প্রত্যুষের আলো-আঁধারিতে তাদের আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে। তারপর এগুতে চায় চৈত্যের দিকে। কিন্তু বাধা আসে। বাধা দেয় মল্লর সৈন্যরা। জানিয়ে দেয়, মহাবিহার থেকে কেউ বাইরে যেতে পারবে না। শিক্ষার্থীর দল ফিরে যায় আবার মহাবিহারে। কিছুক্ষণ পরেই ভেতর থেকে শোর-গোলের শব্দ ভেসে আসতে থাকে। অকস্মাৎ সুপ্তি থেকে যেন একসঙ্গে জেগে উঠেছে সমগ্র মহাবিহার। মল্লর দুইজন লোক এগিয়ে যায় দরোজার দিকে। দ্বাররক্ষীদের জানায় অধ্যক্ষকে সংবাদ দিতে। তিনি যেন দয়া করে বাইরে আসেন। রাজা ভীমের নির্দেশ নিয়ে এসেছে তারা। সেটি জানাতে হবে অধ্যক্ষকে।

কিছুক্ষণ পরে তিন সঙ্গীসহ বাইরে বেরিয়ে আসেন মহাবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীলবিভূতি বিরুদ। তখন সূর্য প্রায় উঠে এসেছে বরেন্দির আকাশে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। অধ্যক্ষ বিরুদকে দেখে নিরতিশয় হতাশ হয়ে যায় পপীপ। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাবাহকের এ কী অবয়ব! হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সঙ্গে কোনোই পার্থক্য নেই। দিব্যি তেলে-জলে ভোগী চেহারা। শরীরময় ঘি-চকচকে চর্বির প্রাবল্য। ঘৃত-ব্যঞ্জন খেয়ে খেয়ে আর নর-নারীদের সেবা গ্রহণ করে করে থলথলে একটি শরীরের অধিকারী হয়েছেন বিরুদ। পরনে বহুমূল্যবান হলুদ বস্ত্র। পায়ে পাদুকা। মুণ্ডিত মস্তক ইতোমধ্যেই ঘেমে উঠেছে। চকচক করছে প্রভাতী সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায়। এইটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীরিক পরিশ্রমেই হাঁসফাস করছেন অধ্যক্ষ। অবশ্য শারীরিক পরিশ্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে মানসিক পীড়ন এবং ভীতিও। তবে মহাবিহারের একজন অধ্যক্ষের প্রতি মনের মধ্যে যতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল পপীপের, এই অধ্যক্ষ বিরুদকে দেখামাত্র তা উবে যায়। তার মনে পড়ে মহামানব গৌতম তার শিষ্য ভিক্ষুদের জন্য কোন ধরনের জীবনাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের নির্দেশ ছিল ভিক্ষুরা তাদের পরিধেয় বসন মৃতের পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে সংগ্রহ করবে। তারা দিনে একবারের বেশি দুইবার খাদ্যগ্রহণ করবে না, কারণ এতে শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যের সঞ্চয় হয়। কোনো বিশেষ খাদ্য সম্পর্কে ভিক্ষুরা কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে না। তাদের চীবর (পরিচ্ছদ) হবে মাত্র তিন টুকরা কাপড়, হলুদ রঙে ছোপানো। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সবকিছুই সংঘের। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি ভিক্ষুকে অমাবস্যা এবং পুর্ণিমার দিনে একত্র হতে হবে। সভাপতি বা সংঘের নির্বাচনের পরে পাতিমোক্ষের নিয়মাবলী আবৃত্তি করা হবে, এবং যদি কারো কোনো বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তা সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে।

পপীপের মনে পড়ে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে (সম্মেলনে) পূর্বদেশীয় ভিক্ষুদের দশটি পাপের জন্য অভিযুক্ত ও ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। সেগুলি ছিল–

সিঙ্গিলোণকপ্প। শৃঙ্গের মধ্যে লবণ পরিবহন।

দ্বঙ্গুলকপ্প। যখন দুটি আঙ্গুলের ছায়া পড়ে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে ভোজন।

গামন্তরকপ্প। একই দিনে বাড়তি ভোজনের উদ্দেশ্যে অন্য গ্রামে গমন।

আবাসকপ্প। একই সীমার মধ্যে একাধিক উপোসথ অনুষ্ঠান।

অনুমতিকপ্প। কোনো কাজ করার পরে তার অনুমোদন প্রদান করা।

আচিঞ্চকপ্প। কোনো ঘটে যাওয়া অঘটনকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা।

অমথিতকপ্প। ভোজনের পরে ঘোল সেবন করা।

জলোগিম-পাতুম। গ্যাঁজানো তাল বা খেজুরের রস (তাড়ি) খাওয়া।

অদসকম-নিসিদনম। পাড়বিহীন কম্বল ব্যবহার করা।

জাতরূপরজতম। স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা।

পপীপ দুঃখের সাথে মাথা নাড়ে। ঐগুলিকে যদি পাপ ধরা হয়, তাহলে এখনকার বৌদ্ধ আচার্যদের কার্যকলাপকে কী বলা যাবে! তার সামনে দাঁড়ানো আচার্য বিরুদকে তার দুর্বৃত্ত বলে মনে হতে থাকে।

মল্ল অবশ্য অধ্যক্ষ বিরুদকে যথাযথ ভক্তিভরেই অভিবাদন জানায়। তারপর বলে– আমরা জেনেছি, রামপালের পাঠানো একদল গুপ্তঘাতক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার মহাবিহারে আশ্রয় নিয়েছে। তারা এই বিহারে আত্মগোপন করে পঞ্চনগরীর শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ওপর গুপ্ত আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের ধন-সম্পদের ক্ষতিসাধন করছে, এমনকি অনেককে হত্যাও করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি, আচার্য বিরুদ, এই মাতৃভূমিবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজে জড়িত নন। সম্ভবত সেই দুর্বৃত্তের দল আপনার অজান্তেই এই বিহারে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা তাই আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি, আমাদের মহাবিহারে প্রবেশ করে অনুসন্ধানের অনুমতি দান করুন। আমরা অন্য কারো কোনো ক্ষতি করব না। শুধু দুর্বৃত্তদলকে বন্দি করে নিয়ে চলে যাব। আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি!

বিরুদের গা থেকে ঘাম চুইয়ে পড়ার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তবু লোকটা ভেঙে পড়ে না। রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে– কিন্তু ত্রিশরণ না নেওয়া কোনো ব্যক্তি তো আমাদের বিহারে প্রবেশ করতে পারে না। এই রীতি তো আপনি জানেন সেনাপতি!

মল্ল রাগ করে না। হাসিমুখেই বলে– তাহলে আপনিই সেই দুর্বৃত্তদের আপনার বিহার থেকে বের করে আমাদের হাতে তুলে দিন!

বিরুদ পিছু হটতে অসম্মত– এমন কেউ আমাদের বিহারে অবস্থান করছে না। যারা এখানে আছেন, তারা সকলেই সম্মানীত অধ্যাপক, ভিক্ষু এবং শিক্ষার্থী। কেউ আপনাদের ভুল তথ্য দিয়েছে সেনাপতি।

এবার স্বমূর্তি ধারণ করে মল্ল– আপনার মিথ্যাভাষণ আমি আর কানে তুলতে চাই না। আপনি ভেতরে যান। আমরা বাইরেই অপেক্ষা করছি। ভেতরে গিয়ে আপনি আপনার অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে পরামর্শ করুন। আমি আপনাদের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি রামপালের পাঠানো গুপ্তঘাতকদের আমার হাতে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে আপনার বা এই মহাবিহারের ভাগ্যে যা ঘটবে, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না। সেইসঙ্গে মনে রাখবেন, আমাদের এই অবরোধ সর্বাত্মক। কোনো কাক-পক্ষীকেও ভেতরে প্রবেশ করতে বা নিষ্ক্রান্ত হতে দেওয়া হবে না।

বিরুদের তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মল্ল বলে– আপনারা সাক্ষ্য রইলেন। আমি আপনাদের অধ্যক্ষকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছি এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়েছি। এরপরে যা ঘটবে, তার দায়-দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের অধ্যক্ষের ওপর বর্তাবে!

বিরুদসহ চারজন আবার মহাবিহারের অভ্যন্তরে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মল্ল আদেশ করে– প্রহরীদের জন্য প্রয়োজনীয় চালা নির্মাণের ব্যবস্থা করো। আমাদের সম্ভবত বেশ কয়েকটা দিন এই ভাবেই কাটাতে হবে। পঞ্চনগরীতে লোক পাঠাও। সেখানকার মোড়লকে বলতে হবে আমাদের সকল সৈনিকের জন্য তিনবেলা খাদ্য-পানীয় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। প্রয়োজনীয় চাল-ডাল-আনাজ সবকিছু রাজকীয় গোলাঘর থেকে সংগ্রহ করে নিতে বলবে।

পপীপ অবাক হয় কিছুটা। বলে– অধ্যক্ষ তো কেবলমাত্র ভেতরে গেলেন। তারা কী সিদ্ধান্ত দেয় তা না জেনেই এত আয়োজন করার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

হাসে মল্ল– তুই এখনো ছেলেমানুষ। এই মহাবিহার চলে রামপালের চোরাপথে পাঠানো অর্থে। বিরুদের ক্ষমতা নেই রামপালের লোককে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার।

তাহলে?

তাদের বাধ্য করার জন্যই তো এই অবরোধ। আমি এইটুকু জানি যে, মহাবিহারের মধ্যে কোনো ভাঁড়ার ঘর থাকে না। প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় জল এমনকি স্নানের জলও প্রতিদিন সংগ্রহ করতে হয়। আমরা তো কউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেব না। দেখি ব্যাটারা না খেয়ে কদ্দিন থাকতে পারে!

পপীপ হেসে বলে– তাহলেই হয়েছে। যেভাবে চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে খেয়ে মহান আচার্যবৃন্দ ভোগী শুয়োরের মতো দেহ বানিয়েছেন, খাদ্য বন্ধ হলে এইসব মহান ব্যক্তি একটি দিনও টিকতে পারবেন বলে মনে হয় না।

হেসে ফেলে মল্লও– তোর ধারণা সঠিক। তবে কি না রামপালের লোকেরা রয়েছে তো ভেতরে। তারা এত সহজে আচার্যদের দরোজা আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। সেক্ষেত্রে তিনটি দিনের অন্তত প্রয়োজন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৫. গুপ্তঘাতকদের আত্মসমর্পণ এবং বিচার

ঠিক তিন দিন পরেই খুলে গেল জগদ্দল মহাবিহারের প্রধান দ্বার।

এবার আর আচার্য বিরুদ নিজে আসার সাহস পাননি। কিংবা এমনও হতে পারে যে তিন দিনের খাদ্যাভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অধ্যক্ষ। মহাবিহারের অন্য তিন অধ্যাপক এগিয়ে এলেন। তারা করজোড়ে মল্লর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন– আমরা আর পারছি না। আত্মসমর্পণ করছি। দয়া করে অবরোধ সরিয়ে নিন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্ল কঠোর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যান তিন অধ্যাপক। মল্ল দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে– অনেক সহ্য করেছি তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা। নিজের জন্মমাটির সাথেও তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো। তোমরা আবার ধর্মনেতা! কোন ধর্ম বলে যে নিজের জন্মভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়? আর নয়। ফিরে যাও তোমরা। তোমাদের সঙ্গীদের গিয়ে বলো যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে তোমাদের। আর সেই সাথে চিহ্নিত করে দিতে হবে রামপালের পাঠানো দুর্বৃত্তদলকে। যাও! আমার এই ঘোষণা জানিয়ে দাও মহাবিহারের সকলকে। তারপর একজন একজন করে বেরিয়ে আসবে প্রধান দরজা দিয়ে। যাও! দ্বার খোলা থাকবে মহাবিহারের। আমরা যখন আদেশ করব, তখন একে একে বেরিয়ে আসবে সুশৃঙ্খলভাবে।

তাই হবে সেনাপতি! মল্লকে অভিবাদন জানিয়ে মহাবিহারের ভেতরে ঢুকে পড়ে তিন অধ্যাপক।

সৈন্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয় মল্ল। যদিও বিহারের অধ্যাপকরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, তবু সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তারা দ্বার খোলা পেয়ে হঠাৎ একযোগে ধেয়ে এসে আক্রমণ চালাতে পারে আমাদের ওপর। আবার শিক্ষার্থী বা অধ্যাপকদের ছদ্মবেশ ধারণ করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে প্রহরার ফাঁক গলিয়ে। তাই আমাদের কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। প্রধান দ্বারের দুই পাশে মোট ছয়জনকে দাঁড়াতে হবে পাশাপাশি। তাদের মধ্যে দুইজনের দায়িত্ব হবে দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে আসবে, তৎক্ষণাৎ শক্ত রজ্জুতে তার দুই হাত বেঁধে ফেলা। অন্য চারজন থাকবে উন্মুক্ত তরবারি হাতে প্রস্তুত অবস্থায়। এই চারজনের পরের সারিতে থাকবে আরও চারজন সশস্ত্র সৈনিক। আর যাকে বেঁধে ফেলা হবে, তাকে গ্রহণ করবে পরের সারির দুইজন। তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অস্থায়ী চালাঘরের কাছে। সেই চালাঘর ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে একশত জন সৈন্য। বাকি সৈন্যরা দুই সারিতে দাঁড়াবে মহাবিহারের দরজা থেকে চালাঘরের বন্দিশালা পর্যন্ত।

একজন আপত্তির সুরে বলে– কিন্তু একজন একজন করে এইভাবে বাঁধতে গেলে সময় তো অনেক লেগে যাবে!

তার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকায় মল্ল। বুকে কাঁপন ধরানো গমগমে কণ্ঠে বলে– তাতে তোমার কোনো অসুবিধা আছে? বা তুমি কি মনে করো তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মল্ল। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর আসে না। তখন মল্ল বলে– তাহলে পরিকল্পনামতো যে যার নির্দিষ্ট জায়গাতে দাঁড়িয়ে পড়ো!

সৈন্যরা নিজ নিজ অবস্থানে যাওয়ার পরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আরেকবার খুঁটিয়ে দেখে মল্ল সব ঠিকমতো হয়েছে কি না। তারপর বিহারের দরজার সামনে গিয়ে হাঁক দেয়– আমার আদেশমতো একজন একজন করে বেরিয়ে এসো!

সত্যিই অনেক সময় লেগে যায়। কিন্তু কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মল্ল। এখন এই বন্দিদের নিয়ে কী করা হবে? পপীপ জানত না যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই আছে। সবাইকে বন্দি করার পরে খাদ্য এবং পানীয় দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে অনেকগুলি মহিষের গাড়ি এসে পড়েছে। সেগুলিতে তোলা হলো মহাবিহারের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কর্মচারিদের। উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্যের প্রহরাধীনে মহিষের গাড়ি ওদের নিয়ে যাবে প্রতিরক্ষা বাঁধের কাছে। সেখানে তাদের স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে বাঁধের কাজে। এটাই ওদের শাস্তি। আর রামপালের গুপ্তঘাতক দলের চল্লিশজন সদস্যকে পঞ্চনগরীতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে তাদের বিচারসভা বসবে। ঐ দুর্বৃত্তদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে। এবং বিচার পরিচালনাও করবে নাগরিকবৃন্দই। ঐ দুর্বৃত্তরা এতদিন ধরে নরহত্যা, লুঠতরাজ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, জনমনে ত্রাসসৃষ্টির মতো অপরাধ করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। উন্মুক্ত স্থানেই বিচারকদের নির্দেশ অনুসারে সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে সৈন্যরা। তারপর তাদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হবে শৃগাল-কুকুরের খাদ্যে পরিণত হবার জন্য।

এতগুলো মানুষকে এইভাবে মেরে ফেলা হবে!

পপীপের উদ্বেগ যেন স্পর্শই করে না মল্লকে। সে বলে– ভুললে চলবে না বাছা, আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি!

১৬. রাজবংশী-কৈবর্ত সংলাপ

একের পর এক উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে।

যাদের সাথে কৈবর্তদের দীর্ঘমেয়াদী মৈত্রীচুক্তি রয়েছে এমন অনেক রাজাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রামপালের অর্থ-সম্পদ-সুন্দরী নারী এবং আরও অনেক পারিতোষিকের প্রলোভনের কাছে। এমনকি পার্বত্য আদিবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন পর্যন্ত যোগ দিয়েছে রামপালের সাথে। হায় রে অর্থলালসা! হায় রে নারীলোভ! রক্তের বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হয়ে যাচ্ছে অর্থের প্রলোভনের কাছে! এক ভূমিপুত্রকে আরেক ভূমিপুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রকূটবংশীয়া স্বর্গবেশ্যাতুল্যা নারীসংসর্গের মাদকতা।

পদ্মনাভ প্রতিনিয়ত তাড়া দিচ্ছেন। যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে আলোচনায় বসা প্রয়োজন। তার চেয়েও শীঘ্র আলোচনায় বসতে হবে এই বরেন্দির কোল-ভিল-শবর-পুলিন্দা-রাজবংশীদের সাথে। তাদের কাছ থেকে একাত্মতার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে সমূহ বিপদ। আঠারো সামন্ত-মহাসামন্তের সাথে একার শক্তিতে কৈবর্তরা পেরে উঠবে– এমনটি অসম্ভব না হলেও দুরূহ তো বটেই। নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও অন্যান্য জাতি-গোত্রকে দলে ভেড়াতেই হবে। একমাত্র তাহলেই নিশ্চিত করা সম্ভব বরেন্দির নিরাপত্তা।

ভীমকে তখন উদ্যোগ নিতেই হয় আলোচনার হয়। দেখা যায় পদ্মনাভের ধারণাই সঠিক। যাদের সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল ভীম, তাদের মধ্যে অনেক রকমের দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কোচ-শবর-ভিল্ল জাতির মোড়লরা সম্মত হয়েছে মাতৃভূমি রক্ষায় কৈবর্তদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল কৈবর্তদের পরে বরেন্দির সবচাইতে বড় ভূমিপুত্র-জাতি রাজবংশীদের নিয়ে। তাদের নেতা বাসুদেবের কথা শুনলে আঁতকে উঠতে হয়।

রাজার সঙ্গে দেখা করার সময় যেসব উপহার নিয়ে যেতে হয়, সেগুলি সবই সঙ্গে এনেছে বাসুদেব। তাদের নিজহাতে নির্মিত ঢল্লরিকা (ডুলি), বাঁশের তৈরি বিভিন্ন তৈজস, একশতটি তরবারি, একশতটি ঢাল, বল্লম পঞ্চাশটি, আর তাদের গ্রামগুলিতে যেসব ফল-ফলারি জন্মে, সেইসব ফলে পূর্ণ পঞ্চাশটি ঝুড়ি। ভীম খুব খুশি হয়ে গ্রহণ করেছে এইসব উপঢৌকন। খুবই সম্মানের সাথে বসতে দিয়েছে বাসুদেবকে। জল-টল খাওয়ার পরে কথাবার্তার শুরুতে নিয়মমতো কুশল জিজ্ঞসার পালা। ভীম জিজ্ঞেস করে– কেমন আছো কাকা?

বাসুদেবের মুখ বিরস হয়ে ওঠে– মোরা কেমন আছি তা আর কীভাবে বলি? তাবে একখান শোলোক বলি, তাতেই বুঝতে পারবে মোরা কেমন আছি বটি। শোলোকটি হচ্ছে–

আগোত আছিনু মল্যের মাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলা গোবর ফেলাও আর ভাত খাঁও!

বুঝতেই পারো এখন মোদের অবস্থা!

ভীম একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে– কেন কাকা? তোমাদের কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে? তোমাদের দিন কি চলছে না? আমাকে তো কেউ কিছু জানায়নি!

বাসুদেব তাকে আশ্বস্ত করে– না না, এখন তো মোরা খারাপ নাই। কিন্তু আমি শোলোকে বলেছি মোদের আদিপুরুষদের কর্মফলের কথা। মোরা আছিলাম রাজার জাত। এখন কোথায় মোদের সেই রাজ্যপাট বটি?

ভীম হাসে– কেন এই বরেন্দি কি তোমাদেরও দেশ নয়? এখন তো বরেন্দি সকল ভূমিপুত্রেরই রাজ্য কাকা!

না না আমি সেকথা বলিনি। আমি বলি মোদের পিতা-পিতামোর কথা। সে কী আজকের কথা ভীম! তোমরা তো জানো না। মোরা রাজবংশীরা আদিতে ছিলাম আর্য ক্ষত্রিয়। সেই কালে মোদের বংশের রাজার নাম ছিল রাজবর্ধন। পরশুরামের নাম তো জানো?

একটু চিন্তা করে ভীম– কোন পরশুরামের কথা বলছ কাকা?

আরে সেই মহাভারতের পরশুরাম। সেই পরশুরাম যে পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়দের নিশ্চিহ্ন করেছিল আঠারো বার।

হ্যাঁ শুনেছি।

তো পরশুরামের ভয়ে, আর লিজের বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রাজবর্ধন পালিয়ে এসে ছদ্মবেশে বাস করতে লাগল ব্রহ্মপুত্র-ত্রিস্রোতা-করতোয়ার তীরে। ক্রমে ক্রমে মোরা ভুলে গেলাম লিজেদের জাতির পরিচয়। ক্ষত্রিয় হয়ে গেল অসুর-বংশ।

তা এতদিনে কে তোমাদের সেই পুরনো কথা মনে করিয়ে দিল কাকা?

কথায় পেয়েছে বাসুদেবকে। সেই কথার তোড়ে সে বলে ফেলে– কে আবার? মনে করিয়ে দিল ঐ মথন দেব। রামপালের মামা। তার মায়ের লিজের ভাই বটি।

তার সঙ্গীদের মুখ পাংশু হয়ে উঠতে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারে বাসুদেব। ভয়ে ভয়ে তাকায় ভীমের দিকে। ভীমের মুখ থমথম করছে। কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে– মথন দেব এসেছিল তোমাদের কাছে?

এবার বাসুদেবের মুখও পাংশু। সে ঢোক গিলে উত্তর দেয়– না না তিনি আসেননি বটি। আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিল। আমিই গিয়েছিলাম। না গিয়ে উপায় কী বল বাবা ভীম! মথন দেবের লোক এসে বলল যে তোমাদের জাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি কুল-ঠিকুজি খুঁজে পেয়েছে মথন দেব। লিজের শিকড় জানার ইচ্ছা কার না হয় বাপ তুই-ই বল! মোরা গেলাম। তখন মথন দেব জানাল এই এই বৃত্তান্ত। মোরাও দেখলাম ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

আর কী বলেছে মথন দেব? রামপালের সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধলে তোমাদের তার পক্ষে যোগ দিতে বলেছে?

হ্যাঁ তা-ও বলেছে বটি। কিন্তু মোরা কোনো বচন দিই নি বাপ! বলেছি, মোদের লিজেদের মধ্যে আরও কথাবার্তা বলতে হবে।

রামপালের পক্ষে যুদ্ধ করলে ওরা তোমাদের বিনিময়ে কী কী দিতে চেয়েছে?

বুড়ো বাসুদেবকে আরও বুড়োটে দেখায়। কথা বলতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একবার মুখের কথা বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর তো ফিরিয়ে আনা যায় না। তার সঙ্গীরা এরমধ্যেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। ভীমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় বাসুদেব। সেই মুখে খোঁজে ক্রোধের রেখা। কিন্তু খুঁজে পায় না। বরং তার মনে হয় এক অব্যক্ত বেদনা ছেয়ে ফেলেছে ভীমের মুখমণ্ডলকে। বাসুদেবের নিজেরও একটু কষ্ট হয় সেই মুখ দেখে। বলে– কত কিছুই তো দিতে চায় মথন দেব। তবে মিথ্যে বলব না বাপ, মোদের চাওয়া হলো আদি জাতগর্ব ফিরে পাওয়া। মথন দেব বলেছে, আমরা যদি তাদের হয়ে যুদ্ধ করি, তাহলে রামপাল বরেন্দির রাজা হলে তারা শুদ্ধিযজ্ঞের আয়োজন করবে আমাদের জন্যে। ফিরিয়ে নেবে মোদের আর্যধর্মের মধ্যে।

এতক্ষণে প্রথম কথা শোনা যায় পদ্মনাভের– আপনারা আর্যধর্মে ফিরে যেতে চান?

ইতস্তত করে বাসুদেব এবং সঙ্গীরা। তারপর বলে– লিজের জাতি-পরিচয় ফিরে পেতে কে না চায় বটি?

পদ্মনাভ আবার বলে– কিন্তু আপনারা কি জানেন, আর্যধর্মে ফিরে গেলে আপনারা আর ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত হতে পারবেন না। তখন আপনাদের বর্ণ হবে– শূদ্র।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলায় বাসুদেব। বলে– এমন একটা কথা বলছিল বটি কেউ কেউ।

আমি নিশ্চিত করে বলছি আপনাকে। আর্যধর্মের বিধান এটাই।

হতে পারে। হতে পারে। অস্বীকার করে না বাসুদেব এবং তার সঙ্গীরা।

আর শূদ্রের অবস্থান কোথায় তা কি আপনাদের জানা আছে?– কঠিন কণ্ঠে বলতে থাকেন পদ্মনাভ– আমি বলছি শুনুন। মনুর বিধান মেনে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যরা। সেই বিধানে বলা আছে শূদ্রের অবস্থান হবে সকলের নীচে। সে বিনাপ্রশ্নে সকলের সেবা করতে বাধ্য। বলা আছে শূদ্র কোনো ধন-সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। কোনো পূজা-পার্বনে অংশ নিতে পারবে না। সে কোনো দেবগ্রামে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। সে কোনোদিন কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারবে না। ধর্মগ্রন্থের পাঠও শুনতে পারবে না। যদি সে কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, তবে শাস্তি হিসাবে তার জিহ্বায় তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। যদি সে কোনো ধর্মগ্রন্থপাঠ শুনে ফেলে, তবে তার কানে উত্তপ্ত ও গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সেই অভিযোগ বিবেচনাতেই নেওয়া হবে না। কিন্তু কোনো উঁচুজাতির লোক শূদ্রের নামে অভিযোগ করলে কোনো বিচার ছাড়াই তাকে দণ্ডদান করতে হবে। তাছাড়া কোনো শূদ্র কখনো কোনো সুখাদ্য খেতে পারবে না। তাকে খেতে হবে বাসী, পচা, ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য। কোনো ব্রাহ্মণ একজন শূদ্রকে হত্যা করলে তার কোনো শাস্তি হবে না। শুধু প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সেই ব্রাহ্মণ একটি বিড়াল, অথবা একটি নেউল, অথবা একটি চড়াইপাখি, অথবা একটি ব্যাঙ, অথবা একটি কুকুর, অথবা একটি গোসাপ, অথবা একটি প্যাঁচা, অথবা একটি কাক মারলেই সে ঐ শূদ্রহত্যার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

বাসুদেবসহ তার সঙ্গীদের অবস্থা বড়ই করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হন না পদ্মনাভ। তাদের মনে আরও ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্য মনুসংহিতা থেকে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেন–

না স্বামীনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি।।

অর্থ হচ্ছে– 'প্রভু কর্তৃক সকল দাস মুক্ত হলেও শূদ্র কখনোই দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় না। দাসত্ব তার স্বভাবজাত; কে তাকে মুক্ত করতে পারে!'

পদ্মনাভ একটানা কথা বলে এবার বিরতি দেন। সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন নির্মম-নির্জলা সত্যভাষণের মুখোমুখি হলে স্তব্ধ না হয়ে উপায়ই বা কী!

এবার আবার কথা বলে ভীম– কাকা! এবার তোমরা লিজেরাই সাব্যস্ত করো কোনদিকে যাবে! এই মাটির সন্তান তোমরা। জন্মমাটি এখন তোমাদের কাছ থেকে বলি চায়। আমাদের কাছ থেকে বলি চায়। আমাদের জন্মমাটিকে ভিনদেশী আর্য দস্যুদের হাত থেকে মুক্ত রাখতে হলে বলিদান আমাদের করতেই হবে। এখন তোমরা ঠিক করো, তোমরা কি স্বাধীন মাটির স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান রূপে থাকবে, নাকি আর্য দস্যুদের দাস রূপে বংশপরম্পরায় জীবন কাটাবে!

বাসুদেব এবং সঙ্গীরা নির্বাক। ভীম আবার বলে– রামপাল খুব শিগগিরই হয়তো হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তার সর্বশক্তি নিয়ে মোদের এই বরেন্দির উপর। আমি জীবন থাকতে বরেন্দি মাকে আবার দস্যুর হাতে তুলে দেবো না কাকা! কিন্তু আমি একলা তো কিছুই করতে পারব না। আমার শক্তি বলো, সাহস বলো, সহায় বলো– সবকিছু তোমরাই। তবে তোমরা লিজেরা লিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নাও। আমি তোমাদের ওপর জোর করব না।

বাসুদেব সেই একই কথা বলে, যে কথা সে বলেছে মথন দেবকে– তারা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য একটু সময় চায়। কিন্তু তার তিন সঙ্গী মুখ থেকে ছিনিয়ে নেয় তার কথা– না! মোরা আর কিছুতেই দাস হবো না! মোদের মোড়ল বাসুকাকা যদি মথন দেবের সাথে যেতে চায়, যদি রামপালের সাথে যেতে চায় তো যাক। কিন্তু মোরা এই মাটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না! মাটি-মা মোদের এতবড় অধম্ম সইতে পারবে না!

বাসুদেব একথায় একটু রেগে যায়। বলে– আমি কি কখনো বলেছি যে আমরা ভীমের সাথে নাই? আমি তো শুধু লিজেদের মধ্যে শলা করার জন্যে সময় চেয়েছিলাম। তা তোমরা যখন লিজেদের কথা বলেই দিলে, আমি তখন জাতির কাছ থেকে আলাদা হই কীভাবে? ভীম, আমরা বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম বাবা! মোদের এই ভুলের কথা মনে রাখিস না। রাজবংশীদের সকল পুরুষ তোর পাশে দাঁড়িয়ে এই মাটির জন্যে যুদ্ধ করবে বাবা!

আনন্দে ভীমের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে– তাহলে তোমাদের সকল পুরুষের জন্য অস্ত্রের প্রশিক্ষণ শুরু হোক কাকা! বেশি দেরি করা যাবে না।

বাসুদেব বলে– আরে দেরি করতে তোকে বলছে কে? কাল থেকেই শুরু করে দে না!

১৭. প্রেমকথা

"যতদিন ঋত পৃথিবীতে বিরাজিত ছিল, ততদিন পৃথিবী শাপমুক্ত ছিলেন। ঋত যতকাল পৃথিবীর পরিচালক ছিল ততদিন ঋতই সকল মনুষ্যকে অন্ন দিয়েছে, গোধন দিয়েছে, জীবনের সর্ব উপকরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ঋত ফসলের সুষম বণ্টন দিয়েছে। ঋত কখনো কঠোর হয়নি; একটি ক্ষেত্র ছাড়া। পৃথিবীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যজাতি তখন 'আমার' বলত না। তারা বলত 'আমাদের'। কেননা ঋত কঠোর ছিল। ঘোষণা দিয়েছিল– 'আমাদের বদলে যে আমার বলে; আমি তাকে হত্যা করি!' পৃথিবীর মানুষ এবং অন্তরীক্ষের অধিবাসীরা ঋতের শাসনে সুখি ছিলেন। ঋত ততদিন স্বয়ম্ভূ ছিলেন, যতদিন ইন্দ্র না এল। ইন্দ্র ঋতকে ধ্বংস করল, এবং পৃথিবীতে বৈষম্যের অভিশাপ এল।

ঋত বিতাড়িত হয়ে আশ্রয়ের জন্য পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিচরণশীল। তখন কৈবর্তজাতি তাকে বলল– তুমি আমাদের হৃদয়মধ্যে আসন গ্রহণ করো! আমরা তোমাকে আমাদের বরেন্দিতে অধিষ্ঠিত করব!' কিন্তু বরেন্দি ইন্দ্রবংশের দস্যু-তস্করদের পদলুণ্ঠিত। সেখানে ঋতের সিংহাসন সংস্থাপন করবে কে?

ঋত বলল– ওলান ঠাকুরের আশীর্বাদে একদিন এই বরেন্দিতে জন্ম নেবে একজন দিব্যোক। সে দস্যুবিতারণ করবে। তখন বরেন্দিতে অধিষ্ঠিত হবো আমি! তখন আবার মনুষ্যজাতি মুক্ত হবে বৈষম্যের অভিশাপ থেকে। মানুষ আবার নিরোগ মহৎ হবে।

সেই প্রতিশ্রুত দিব্যোক আবির্ভূত হলেন এবং কৈবর্ত-বরেন্দি আরোগ্য হলো।

সেই মহান ঋতের বন্দনার জন্যই এই কবির ধরাধামে আগমন!

সেই মহান দিব্যোকের নামে মিথ্যা কুৎসা-মোচনের নিমিত্তেই এই অক্ষম কবির লেখনী-ধারণ!"

এই ভনিতাটুকু পাঠ করে পপীপের দিকে মুগ্ধ স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে তাকায় ঊর্ণাবতী। মুখে বলে– অপূর্ব!

পপীপ একটু কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে– সত্যি কি সুন্দর হয়েছে গুরুমা? নাকি তুমি আমাকে স্নেহ করো ভালোবাসো বলেই আমার কাব্যপ্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছ?

না পপীপ! আমি মোটেই তোর প্রশংসা করছি না। আমি তো তোর প্রশংসার নামে প্রশংসা করছি আমার নিজের এবং মল্লর।

পপীপকে একটু হতভম্ব দেখায়– বুঝলাম না তোমার কথা।

তুই তো মল্ল এবং আমার মানস-সন্তান। তোর কীর্তি মানে তো আমাদেরই কীর্তি।

এবার উঠে এসে ঊর্ণাবতীর পায়ের ধুলো মাথায় নেয় পপীপ– সত্যি গুরুমা। তোমরা না থাকলে পপীপ নামের কোনো কবির অস্তিত্বই থাকত না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে। অস্তিত্ব তো দূরের কথা, আমার মধ্যে কবিত্বশক্তির জন্মই হতো না।

ওকথা বলতে নেই। কেউ কি কাউকে কবিতে পরিণত করতে পারে? কবি জন্ম নেয় কবি হয়েই। আমরা তো নিমিত্তমাত্র। আমরা না থাকলেও অসুবিধা হতো না। অন্য কাউকে খুঁজে নিতেন ঈশ্বর নিমিত্তরূপে। আমাদের সৌভাগ্য যে ঈশ্বর আমাদের বেছে নিয়েছেন তোর নিমিত্তরূপে!

তারপরেই উঠে দাঁড়ায় ঊর্ণাবতী। বলে– তুই লেখ পপীপ! তোকে বিরক্ত করা এখন আমার উচিত হচ্ছে না। যে মহান ব্রতে তুই নিয়োজিত রয়েছিস, তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা পাপ। তোর শ্লোকরচনার ওপর নির্ভর করছে মহান ভূমিপুত্রদের অনেকখানি ভবিষ্যৎ।

পপীপ তাকে বাধা দেয়– না তুমি যেও না গুরুমা। আরেকবার ভেবে বলো আমার কাব্য কি সত্যিই সুন্দর হচ্ছে?

অবশ্যই সুন্দর হচ্ছে! জোর দিয়ে বলে ঊর্ণাবতী।

পপীপের সংশয় তবু দূর হয় না– আমি কি পারব সন্ধ্যাকর নন্দীর মতো শক্তিমান কবির যোগ্য প্রত্যুত্তর রচনা করতে?

অবশ্যই পারবি! সন্ধ্যাকর নন্দীদের মতো অপরের অন্নভুক কবিরা কাব্যরচনা করে তাদের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য। আর তুই কাব্যরচনা করছিস তোর জাতির প্রতি কর্তব্য হিসাবে। পরান্নভোগী কবিরা কি কোনোদিন তোদের মতো যোদ্ধাকবিদের সমতুল্য হতে পারে?

কিন্তু একটি দিকে আমি খুবই পিছিয়ে রয়েছি গুরুমা। সন্ধ্যাকর নন্দীরা তাদের কাব্য রচনা করে সংস্কৃত ভাষায়। তাদের পাঠক এবং শ্রোতা সংস্কৃত ভাষা বোঝে। আমি কাব্যরচনা করছি ভূমিপুত্রদের জন্য। অথচ এই আমাকেও লিখতে হচ্ছে সংস্কৃত ভাষাতেই। আমাদের জাতির মানুষ কীভাবে পাঠ করবে এই কাব্য? কীভাবে জানবে যে তাদের জন্যই রচিত হয়েছে এই কাব্য? আর আমারও তো সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরচনা না করে কোনো উপায় নেই। কারণ আমাদের ভাষার তো কোনো লিখিত রূপ নেই।

ঊর্ণাবতীকে একটুও চিন্তিত দেখায় না। বলে– এখন হয়তো তোর কাব্য সকলে আস্বাদন করতে পারবে না। কিন্তু একদিন তো অবশ্যই এই ভূমিপুত্রদের নিজেদের অক্ষর হবেই। তখন অন্যেরা তোর কাব্য অনুবাদ করে নেবে নিজেদের ভাষায়। তখন সবাই জানবে, এই মহান ভূমিপুত্রদের মধ্য থেকে একদিন আবির্ভাব ঘটেছিল এক মহান কবির। সে তার জাতিকর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছে পরিপূর্ণ সততা এবং অপূর্ব কাব্যদক্ষতার সমন্বয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আমাদের ভূমিপুত্রদের মহান বলছ গুরুমা! তোমাদের আর্য জাতি...

আর্য জাতি তার নারীদের কী চোখে দেখে তা থেকেই বোঝা যায় সেই জাতির বর্বরতা। দেখিস নি আর্য জাতি আর তাদের হিন্দু ধর্ম আমাকে কোথায় নামিয়েছিল?

এই প্রসঙ্গে কোনো কথা মুখে আনা তো দূরের কথা, মনেও আনতে চায় না পপীপ। তার মনে হয় সেকথা মনে আনলেও ঊর্ণামাকে ছোট করা হয়। তবু কথার পিঠে সে বলে– সে তো একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে মা!

না। মোটেও দুর্ঘটনা নয়। শত শত বৎসর ধরে এই-ই চলে আসছে। অযুত নারীকে ভোগ করতে হচ্ছে নারীজন্মের লাঞ্ছনা। তুই তো মহাভারত পাঠ করেছিস। মনে নেই সেখানে নারীজাতিকে কোন দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে? মনে নেই ভীষ্ম তার মৃত্যুশয্যায় শুয়েও নারীজাতি সম্পর্কে কী বলছে। বলছে নিজেই। কিন্তু বলাচ্ছে আরেক নারী পঞ্চচূড়ার নামে। বলা হচ্ছে– "নারীদের এই দোষ যে তারা সদবংশীয়া রূপবতী ও সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠা কেউ নাই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতির জন্য তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না। যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই। পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বিবেচনা করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরাও সেইরূপ হতে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুরূপ পুরুষ দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয় বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অগ্নি– এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।"

মনে রাখিস পপীপ, আর্যসমাজের সর্বত্র এই ধারণা বিরাজমান।

অন্যদিকে তাকিয়ে দ্যাখ, কৈবর্তসমাজে নারী কত সম্মানের আসন পেয়েছে। ভূমিপুত্ররা ধর্ষণ নামক শব্দটির সাথেই পরিচিত নয়। এখানে ব্যভিচার নেই। আছে শুধু প্রেম।

'প্রেম' শব্দটি উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ আত্মগত বসে থাকে ঊর্ণাবতী। স্বগতকণ্ঠে বলে– প্রেম! আমার সৌভাগ্য যে তুমি আছ! তা নইলে মল্ল কীভাবে এল আমার জীবনে! তুমি না থাকলে আমাকেও অযুত হতভাগ্য নারীর মতো পচে মরতে হতো সেই নরকেই!

যুক্তকরে প্রণাম জানায় ঊর্ণাবতী। কাকে যে প্রণাম জানায়? প্রেমকে? নাকি মল্লকে? নাকি দুজনকেই? তারপর পপীপের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধস্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে– প্রেমকে কোনোদিন অবজ্ঞা করিস না বাবা! আর কবির পক্ষে প্রেমকে অবজ্ঞা করা তো মহাপাপ!

তখন পপীপের চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় রাজধানী গৌড়, এই সুদৃশ্য অট্টালিকা, উর্ণাবতীর পবিত্র সৌন্দর্য, নিজের দায়িত্বের কথা, খাগের কলম, আর ভূর্জপত্র। মৃত্যুপুরীর মতো মালভূমির পাশে একটি ছায়াময় গ্রাম তার মনের পটে ভেসে ওঠে। আর ভেসে ওঠে একজন পলিরঙা তরুণীর মুখ। কুরমি! কুরমি!

১৮. রামপালের চরমপত্র

রামপালের চিঠি নিয়ে এসেছে চার অশ্বারোহী।

বরেন্দির সীমায় প্রবেশমাত্র ওদের বন্দি করেছে কৈবর্তসৈন্যরা। কিন্তু ওরা সঙ্গে নিয়ে আসা সাদা ধ্বজা দেখিয়েছে। সাদা ধ্বজা হচ্ছে সন্ধি-শান্তি-আলোচনার প্রতীক। চার অশ্বারোহী বরেন্দির সীমান্তরক্ষীদের জানিয়েছে যে, তারা মহারাজ রামপালের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কৈবর্তরাজ ভীমের কাছে। সীমান্তরক্ষীরা বলেছিল পত্রটি তাদের হাতে দেওয়া হোক। তারাই রাজা ভীমের কাছে পৌঁছে দেবে রাজা রামপালের পত্র। কিন্তু রামপালের প্রেরিত দূতরা সম্মত হয়নি। বলেছে যে এই পত্র তাদের নিজহাতে তুলে দিতে হবে রাজা ভীমের হাতে। এটাই মহারাজ রামপালের নির্দেশ। এই নির্দেশের অন্যথা তারা করতে পারবে না। তাছাড়া তাদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, ভীম এই পত্র পাঠ করে যে প্রতিক্রিয়া জানাবেন, অর্থাৎ পত্রের যে উত্তর দেবেন, সেই উত্তরপত্রটিও তাদেরকেই নিয়ে যেতে হবে রামপালসকাশে। তারা এমনকি এই পত্রটি বরেন্দির সীমান্তরক্ষীদের দেখতে দিতে পর্যন্ত সম্মত নয়। আর রাজার কাছে পাঠানো পত্র সৈন্যরা পড়বেই বা কোন সাহসে! তাই তাদের চারজনকে নিয়ে আসা হয়েছে ভীমের কাছে।

রামপালের পত্রদূতরা যথাবিহীত অভিবাদন জানিয়েছে ভীমকে। রাজকীয় শিষ্টাচার মেনে চার পত্রদূতকে অতিথিনিবাসে নিয়ে যেতে বলেছে ভীম। তাদের আপ্যায়নে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে তেমন নির্দেশ দিয়েছে সহচরদের। চার দূতকে বলেছে বিশ্রাম গ্রহণ করতে। পত্রপাঠ করার পরে নিজের উত্তর লিখে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে সময়মতো।

পদ্মনাভ এবং হরিবর্মাকে ডেকে নিয়ে রামপালের পাঠানো পত্রের মোড়ক খোলে ভীম। খুবই মূল্যবান বস্ত্রে মোড়ানো একটি সুদৃশ্য ভূর্জপত্র। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লিখিত রামপালের পত্র। পদ্মনাভ হাত বাড়িয়ে নিতে চান পত্রটি। কিন্তু তাকে নিরস্ত করে ভীম। সে নিজেই পাঠ করবে পত্রটি। রামপাল লিখেছে–

"পরমসৌগত মহারাজ রামপাল কর্তৃক গৌড়-বরেন্দ্রী-পুণ্ড্রবর্ধনের অবৈধ অধিপতি ম্লেচ্ছ কৈবর্তনেতা ভীমের প্রতি প্রেরিত চরমপত্র।

পর সমাচার এই যে, তোমার পিতা রুদোক এবং পিতৃব্য বিশ্বাসঘাতক দিব্যোকের পথ ধরে তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা মহান পাল-সম্রাটদের জনক-ভূ বরেন্দ্রীকে অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছ। তোমাদের কুশাসন এবং অপশাসনে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি, পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ গোপালের অধঃস্তন বংশধর রামপাল তোমাকে এই মর্মে জানাচ্ছি যে, আমি আমার পিতৃরাজ্য পুনরাধিকারের নিমিত্তে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমার ইন্দ্রসেনাসম বীর সৈন্যবাহিনীর তরবারি তোমার এবং তোমার কুকর্মের সঙ্গীদের রক্তপিপাসায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তবু আমি রাজকীয় সদাচার অনুযায়ী তোমাকে আত্মসমর্পণের জন্য সর্বশেষ সুযোগ প্রদান করছি। তুমি যদি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক আমার হাতে বরেন্দ্রী প্রত্যর্পণ করো, তাহলে আমি এবং আমার অমাত্য-পরামর্শকবৃন্দ তোমার ও তোমার পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষমা প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হবো। আর যুদ্ধই যদি তোমার কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে পত্রবাহকদের তোমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিয়ো। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, পত্রবাহকরা ফিরে আসার ঠিক একুশ দিবস পরে আমি তোমাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করার উদ্দেশ্যে বরেন্দ্রী আক্রমণ করব। বীরধর্ম পালন করে আমি তোমাকে যুদ্ধের দিন-ক্ষণ জানিয়ে দিলাম। তোমার এবং তোমার বর্বর সৈন্যদের সামর্থ্য থাকলে আমার ইন্দ্রসেনাদের গতিরোধ করুক!"

পত্রপাঠ শেষে ভীম পদ্মনাভ এবং হরিবর্মার দিকে তাকিয়ে বলে– উত্তর কী হবে আপনারা তা জানেন। এ নিয়ে কী আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে?

দুজনেই মাথা ঝাঁকায়। প্রয়োজন নেই।

ভীম বলে– রামপাল তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি এটিকে একটি বড় সুযোগ বলেই মনে করছি। কারণ এই যুদ্ধে পরাজিত হলে রামপাল আর কোনোদিনই বরেন্দির ওপর আক্রমণ করার মতো অর্থ এবং সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবে না। তার ফলে বরেন্দির নিরাপত্তা দীর্ঘদিনের জন্য নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাই এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিবর্মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ভীম– আমাদের সকল শক্তি এবং সৈন্যবিন্যাস কি একুশ দিবসের মধ্যে সম্ভব হবে?

হরিবর্মা উত্তর করে– হ্যাঁ। সম্ভব হবে। এবং সুচারুভাবেই আমাদের শক্তিবিন্যাস করা সম্ভব হবে।

ভীম বলে– এখন আপনারা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত জানান একটি বিষয়ে। তা হচ্ছে, যুদ্ধ কোথায় হবে? আমরা কি গঙ্গা পেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করব? না কি রামপালের বাহিনীকে গঙ্গার এপার থেকেই প্রতিরোধ করব?

হরিবর্মা বলে– গঙ্গার এপার থেকে, অর্থাৎ নিজেদের ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ করাটাই বেশি ফলদায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এটি করলে আমাদের সরবরাহ-পথ মুক্ত থাকবে। আমরা দেশের ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা পাবো।

পদ্মনাভের দিকে তাকিয়ে ভীম জিজ্ঞেস করে– আপনার কী মত?

পদ্মনাভ একটু দ্বিধা করেন। বলেন– আমি যুদ্ধবিশারদ নই। যুদ্ধবিদ্যা বা যুদ্ধের কৌশল আমার জানা নেই। কিন্তু আমার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলছে শত্রুকে পঙ্গা পার হতে না দেওয়াটাই ভালো হবে। আমরা এপার থেকে ওদের প্রতিরোধ করলে ওরা সহজে এগুতে পারবে না। আমরা ওদেরকে কূলে আসতে দেব না। তাহলে সংরক্ষিত থাকবে আমাদের ভূমি।

হরিবর্মা একটু হাসির সঙ্গে বলে– তাহলে কি আপনি বলতে চান যে আমরাই পঙ্গা পেরিয়ে ওদের ভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করব?

না। আমি সেকথা বলছি না। পদ্মনাভ যুক্তি দেন– আমরাও নদী পেরুব না। এপারে ব্যূহ রচনা করে রাখব।

তাহলে যুদ্ধটা হবে কী করে?

একথার কোনো উত্তর যোগায় না পদ্মনাভের মুখে। তিনি আসলে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের কথা বলছেন। কিন্তু রামপাল আহ্বান জানিয়েছে মুখোমুখি যুদ্ধের। যাতে চূড়ান্ত বিজয়ী হবে যে কোনো একটি পক্ষ। তাছাড়া রামপালের ক্ষমতা আছে মাসের পর মাস, এমনকি অনন্তকাল ধরে, গঙ্গার ঐপারে অবস্থান নিয়ে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ভীম বা কৈবর্তদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সর্বশক্তি নিয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করে মাসের পর মাস কাটাতে পারবে না ভীমের পক্ষের যোদ্ধারা। তাদের সৈন্যদলে নিয়মিত যোদ্ধার সংখ্যা নগণ্য। বেশিরভাগ লোককেই একই সাথে কৃষিকাজও করতে হয়, আবার যুদ্ধের ডাক এলে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে গুপ্তযুদ্ধ এবং খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে কৈবর্তদের জীবনযাপন দুঃসহ করে তুলেছে রামপাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর অবসান হওয়া দরকার। আর অবসানের একমাত্র পথ হচ্ছে মুখোমুখি সর্বাত্মক যুদ্ধ। ভীম তাই হরিবর্মার প্রস্তাবেই সায় দিতে চায়। কিন্তু পদ্মনাভ আবারও নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করেন। বলেন– যদি সেটাই করতে হয়, তাহলেও বরং আমাদের উচিত হবে গঙ্গার ওপারে গিয়ে ওদের মুখোমুখি হওয়া।

তীব্রকণ্ঠে প্রতিক্রিয়া জানায় হরিবর্মা– সেখানে আমাদের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা হবে কীভাবে?

কেন? বরেন্দি থেকে আমাদের লোক নৌকায় করে পৌঁছে দেবে আমাদের রসদ।

এবার বিদ্রূপ ঝরে পড়ে হরিবর্মার কণ্ঠে– তাহলে সেই কাজে কতজন লোককে নিয়োগ করতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা রয়েছে কি আপনার? তাছাড়া অত নৌকাই বা আমরা পাব কোথায়?

ভীম এতক্ষণ চুপচাপ উভয়ের যুক্তি-প্রতিযুক্তি শুনছিল। এবার নিজে এগিয়ে আসে। পদ্মনাভের দিকে তাকিয়ে বলে– ভাববেন না আপনার মতামতকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। কিন্তু সেনাপতি হরিবর্মা যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। আপাতত আমাদের হরিবর্মার পরামর্শই মেনে চলতে হবে।

পদ্মনাভ ম্লান হাসেন– তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমি যোদ্ধা বা যুদ্ধবিশারদ– কোনোটাই নই। আপনারা যে পথটিকে উত্তম মনে করবেন, আমি সর্বক্তিতে সেই পথেই আমার ভূমিকা পালন করে চলব।

ভীম এবার একজন সহচরকে ডাকে। তার হাতে তুলে দেয় তীক্ষ্ণ একটি তীর। বলে– এই তীরটিকে একটি লাল রঙের কাপড়ে মুড়িয়ে রামপালের দূতদের হাতে দিয়ে দাও। বলে দাও যে রামপালের জন্য এটিই আমাদের উত্তরবার্তা!

১৯. অপেক্ষায় আছে যে নারী

ঘোড়া থেকে নামার আগেই চোখে পড়ে কুরমির সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

মুহূর্তে পপীপের সমস্ত দেহ অবশ-বিবশ হয়ে যায়। কুরমির বিয়ে হয়ে গেছে! ঘোড়ার পিঠেই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পপীপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে ঘোড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে কুরমি। সে যে উত্তেজনায় বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে, সেটাও বোঝা যায়। কিন্তু তার মুখে জ্বলছে বরেন্দির চৈত্রমধ্যাহ্নের সূর্যের মতো আলো। ভেতরের আনন্দ আর খুশি তাকে আলোকিত করে রেখেছে। কিন্তু পপীপের মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে নামার কথাও যেন ভুলে গেছে সে।

এসব লক্ষই করে না কুরমি। সে আরও কাছে ছুটে আসে। এই কয়েক মাসে যেন আরও সুন্দরী হয়েছে সে। পূর্ণতার জোয়ার এসেছে যেন তার দীঘল শরীরে। তাকে দেখাচ্ছে মুক্ত-আনন্দে বন দাপিয়ে ছুটে বেড়ানো চঞ্চলা হরিণীর মতে। কুরমি এসে একেবারে ঘোড়ার পাশে দাঁড়ায়। এত কাছে অচেনা মানুষ দাঁড়ালে যে কোনো ঘোড়াই অস্বস্তি প্রকাশ করবে। পপীপের ঘোড়াটিও মাথা ঘুরিয়ে কুরমিকে দেখে। তারপর শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। কুরমির সংস্পর্শ মেনে নিয়েছে সে।

কুরমির হাসি যেন বাঁধ মানছে না। সে লক্ষই করে না পপীপের মুখাবয়বের অন্ধকার। হাত ধরে টানে পপীপকে নিচের দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে– আমি জানতাম তুমিই আসছ। অশ্বখুরের শব্দ পেয়েই বুঝেছি অশ্বারোহী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। এমন ছন্দে আর কেউ-ই ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এখনো তুমি বসে আছ কেন ঘোড়ার পিঠে? নেমে এসো! ঘরে এসো ঘরের মানুষ! ভেতরে এসো মনের মানুষ!

ইতোমধ্যেই বাড়ির বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে কুরমির হাসিমুখ মা, তার ছোট বোন। হড়জনকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বা ক্ষেতের কাজে বাইরে রয়েছে।

মাকে দেখে লজ্জা পেয়ে পপীপের হাত ছেড়ে দেয় কুরমি। কিন্তু এবার এসে হাত ধরে তার মা– আয় বাপ! আমরা তো রোজই তোর পথ চেয়ে থাকি। অনেক দূর থেকে এসেছিস। ভেতরে আয়। একটু ঠাণ্ডা হ আগে। তারপরে কথা বলা যাবে। ওরে কুরচি, দাদার হাত-মুখ ধোয়ার জল দে।

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে খটকা লাগে পপীপের। কোনো একটা ভুল হয়ে গেছে। কিছু একটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কুরমির সিঁথিতে সিঁদুর দেখে বোঝা যাচ্ছে তার বিয়ে হয়ে গেছে। অথচ তাহলে তার সাথে এমন ব্যবহার করছে কুরমি যেন কিছুই ঘটেনি। আবার তার মা এবং বোনের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদের জামাই এসেছে বাড়িতে।

তাকে সেই ঘরের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে কুরচি, সে আশ্রিত অবস্থায় যে ঘরটিতে ছিল। বারান্দায় আসন পেতে দিয়ে প্রথম মুখ ঝামটা মারে কুরচি–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সাথে আমার আড়ি নেওয়াই উচিত। আচ্ছা আমাদের কথা না হয় তুমি ভুলেই গেছিলে, কিন্তু দিদির কথা তো তোমার ভুলে যাবার কথা নয়কো বটি!

এবার আরও তালগোল পাকিয়ে যায় পপীপের মাথার মধ্যকার সবকিছু। আরও জট পাকিয়ে যায় চিন্তাগুলো। সে কুরচির কথার কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা অনুমধুর কটাক্ষ হেনে চলে যায় কুরচি। সম্ভবত জল আনতে।

কিন্তু জল নিয়ে আসে কুরমি। হাতে-পায়ে ঢালার জন্য নিয়ে এসেছে ঘড়ুলি (ঘাড়ু) পূর্ণ জল। সে জল ঢালার উদ্যোগ করতেই পা সরিয়ে নেয় পপীপ। একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায় কুরমি– কী হলো!

চাপা ক্রোধকাঁপা কণ্ঠে পপীপ বলে– পরস্ত্রীর সেবা গ্রহণ করা উচিত নয় কোনো পুরুষের। আর কোনো সধবা নারীরও উচিত নয় কোনো পরপুরুষের সেবা করা।

কুরমি এবার পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে পড়ে– এসব কী বলছ তুমি! পরস্ত্রী পরপুরুষ– এসব কী কথা?

পপীপ এদিক-ওদিক তাকায়। একেবারে কাছে-ভিতে কেউ নেই। গলা চড়িয়ে না বললে কেউ শুনতে পাবে না তাদের কথা। সে আগের মতোই রাগতকণ্ঠে বলে– তোমার দেখছি বিয়ে হয়ে গেছে! সিঁথিতে সিঁদুর।

তখনো পপীপের রাগের কারণ বুঝতে পারেনি কুরমি– বিয়ে তো হয়েইছে। আর বিয়ে হলে মেয়েদের সিঁদুর পড়তে হয়। এতে দোষের কী হলো?

দোষের নয়! পপীপের কণ্ঠে এখন আরও বেশি ঝাঁঝ– মানকুর বউ হয়ে তুমি আমার সেবা করতে এসেছ। তোমার লজ্জা করে না?

এবার খিলখিল করে হেসে ফেলে কুরমি। পপীপের রাগ, তার থমথমে মুখের রহস্য এতক্ষণে উন্মোচিত হয় তার কাছে। সে হাসতে হাসতেই বলে– আমি মানকুর বউ হতে যাব কোন দুঃখে? আমি তো তোমার বউ!

বলে আবার খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে কুরমি।

পপীপের বুক তখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে সবটুকু না বুঝেই। তবে এটুকু অন্তত সে বুঝে ফেলেছে যে তার কুরমিকে সে হারায়নি। বুক থেকে নেমে গেছে পাষাণভার। ওদিকে কুরমির খিলখিল হাসির শব্দে তার মা এবং বোন দুজনেই হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছে এদিকে। কুরচি দূর থেকে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলে– বাব্বাহ, আজ কতদিন পরে যে দিদিকে হাসতে দেখছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে শাটিকার আঁচল গুঁজে হাসি থামানোর চেষ্টা করে কুরমি। পপীপ অনুনয়ের সুরে বলে– আমাকে সব বুঝিয়ে বলো কুরমি!

অত কথা আমি বলতে পারব না। তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি কুরচিকে বললাম যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। কুরচি বলল মাকে। মা বলল বাবাকে। বাবা তখন বলল মানকুর বাবাকে। হয়ে গেল!

এত সহজে মিটে গেল সব ঝামেলা!

একটু ঝামেলা হয়েছিল। মানকুর বাবা আর গাঁয়ের মানুষের কাছে বাবাকে দেওয়া কথা ভঙ্গ করার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছে। আর ক্ষতিপূরণ এবং কথা ফিরিয়ে নেবার মূল্য দিতে হয়েছে। এক দ্রোণ ধানী ক্ষেত পেয়ে নিজেদের দাবি তুলে নিয়েছে মানকু আর মানকুর বাপ। আমিও সেদিন থেকে সিঁথিতে সিঁদুর পরে অপেক্ষা করছি তোমার।

এত খুশি এবং এত আবেগ ভিড় করে এসেছে পপীপের বুকে যে সবার সামনেই কুরমিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে তার। কুরমি বুঝতে পেরেই যেন চোখ পাকায়– উঁহু কোনো দস্যিপনা চলবে না এখন!

পপীপ আবার আড়চোখে তাকায় কুরমির মা আর বোনের দিকে। আরও চাপাকণ্ঠে জানতে চায়– তাহলে কখন চলবে?

তার কণ্ঠশব্দের সাথে মিশে থাকা কামনা বুঝতে বাকি থাকে না কুরমির। নিজেও সে কেঁপে ওঠে একটু। ফিসফিস করে বলে– যখন সময় হবে, তখন আর বলে দিতে হবে না।

হড়জন শশব্যস্তে বাড়িতে ঢোকে– পপীপ এসেছে নাকি?

উঠে কাছে গিয়ে পায়ের ধুলা নেয় পপীপ। কুরচি জিজ্ঞেস করে– তুমি কীভাবে জানলে বাবা যে তোমার জামাই এসেছে?

আরে গাঁয়ের লোক দেখেছে ঘোড়ায় চড়ে কেউ একজন গাঁয়ে এসেছে। তা আমি শুনেই বুঝেছি সে আমাদের পপীপ না হয়ে যায় না। গাঁয়ে আর এমন কি কেউ আছে যার জামাই ঘোড়ায় চড়ে আসতে পারে!– হড়জনের কণ্ঠে গর্ব ঝরে পড়ে।

শ্বশুর-জামাইয়ের দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। পপীপকে শুতে দেওয়া হয়েছে বাড়ির সবচাইতে আরামদায়ক ঘরটিতে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কিন্তু ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। ঝাঁপটা ঠেলে দিলে মনে হয় পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে স্বস্তিকর তাপমাত্রা। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে পপীপ। এই রকম স্বস্তিকর ঘর এবং বিছানা পেয়ে তার এতক্ষণে ঘুমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তলিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই পপীপের চোখে। এপাশ-ওপাশ করছে বিছানায়। যত সময় গড়াচ্ছে তত অভিমান জমছে কুড়মির ওপর। আসছে না কেন কুড়মি! রেগে গিয়ে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয় সে ঘুমিয়েই পড়বে। কুড়মি এসে তখন হতাশ হবে। বেশ হবে! সেটাই ঠিক হবে!

কিন্তু ঘুম যে আসে না! পপীপ তখন ঠিক করে সে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। কুড়মি এসে ডাকলেও সাড়া দেবে না।

কিন্তু নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই পপীপের। বারান্দায় বা দরজায় যে কোনো মৃদু শব্দ উঠলেই ছ্যাঁৎ করে উঠছে তার বুক– এই বুঝি কুড়মি এল!

অবশেষে পাখা হাতে বাতাস করার উছিলায় কুড়মি যখন পপীপের ঘরে আসে তখন যেন ঘরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়।

২০. বিদায়ী প্রণাম

যাও বীর! যুদ্ধক্ষেত্রে যাও! ফিরে এসো জয়ী হয়ে। এই দেহ এই মন তোমারই সম্পত্তি। জয়ী হয়ে ফিরে এসো। জয়মাল্য হয়ে এই দুই মৃণাল বাহু জড়িয়ে ধরবে তোমার কণ্ঠদেশ। জয়ী হয়ে ফিরে এসো। এই দেহ লীলায়িত পারিতোষিক হবে তোমার। এমন মিলনের প্রতিশ্রুতি এই দেহ তোমাকে দিচ্ছে, যা নেই বাৎসায়নের অভিধানে। তোমার কপালে দিয়েছি এই মাটি আর সিঁদুরের টিপ। এই নারী আর এই মৃত্তিকা তোমারই জয়ের অপেক্ষায় থাকবে উন্মুখ। জয়ী হয়ে ফিরে এসো! মৃত্তিকা-মা তোমাকে পুরস্কৃত করবে। পুরস্কৃত করবে সিঁদুরধারিণী।

যুদ্ধে জয় আছে। পরাজয়ও আছে। পরাজিত হতে পারে আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু তোমাকে জীবন্ত রেখে পরাজয়ের গ্লানি যেন প্রবেশ করতে না পারে আমাদের মৃত্তিকায়! তাতেও হবে আমাদের অক্ষয় গৌরব।

পপীপকে বিদায়ী প্রণাম করে এই কথা বলে কুরমি।
যোজন যোজন দূরে মল্লকে প্রণাম করে প্রায় একই কথা বলে উর্ণাবতী।

২১. ভীম-রামপাল বাকযুদ্ধ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি দুই বাহিনী। দুই দল অবস্থান নিয়েছে মাঝখানে দুই ক্রোশ জমি ফাঁকা রেখে। যুদ্ধ হবে সেখানেই। দুই দলের খোল-গুপ্তচররা ব্যস্ত অন্য দলের সমর-শক্তি পরিমাপে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ। পারে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঠিক পরিসংখ্যান জানাতে। পারবে কী করে? দুই দলের এমন সৈন্য সমাবেশ আগে কি কোনোদিন দেখেছে বরেন্দির মাটি? হস্তী-রথ-অশ্বের সংখ্যায় অনেক এগিয়ে আছে রামপালের বাহিনী। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা দুই দলেরই অনেক। হতে পারে পপীপের সৈন্যরা অস্ত্রে-বর্মে-পরিচ্ছদে তেমন সুসজ্জিত নয়। কিন্তু তাদের অবয়বে রয়েছে এমন এক সংকল্পের উন্মাদনা, যা কোনোদিন ভাড়াটে সৈন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রামপালের যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। চতুরঙ্গ বাহিনী ছাড়াও তার রয়েছে অস্ত্র সরবরাহকারীর দল, রয়েছে শঙ্খ-ভেরী বাদকের দল, রয়েছে পাচকের দল, ধ্বজাবাহীর দল, চিকিৎসক দল, আহত সৈন্যদের জন্য শুশ্রূষাকারীর দল, নিহতদের শব দাহকারীর দল, স্তুতিপাঠ করে যোদ্ধাদের মনোবলবৃদ্ধিকারী সূতদের দল। গুপ্তচরদের মুখে এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনে ভীমও মনে মনে রামপালের যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। গুপ্তচর আরও জানিয়েছে, নদীর ঐপারে এখনো আরও অনেক সৈন্য-সামন্ত-রসদ জড়ো করে রাখা আছে রামপালের। প্রয়োজন মনে হলে নৌকা দ্বারা নদীবন্ধন করে দ্রুতগতিতে এপারে নিয়ে আসা হবে তাদের। মনে মনে এই তথ্যটি পর্যালোচনা করে ভীম। যুদ্ধ শুরুর পরে কোনোভাবে বন্ধ করে দিতে হবে নদীবন্ধনের সুযোগ। তা হতে পারে পারাপারের লোকদের অকেজো করে দেওয়া অথবা নৌকাগুলিকে অকেজো করে দেওয়া অথবা দুটোই। সময়মতো ব্যবস্থা নেবার কথাটি মাথায় রাখে ভীম।

মুখোমুখি দুই পক্ষেই বেজে চলেছে যুদ্ধ-উন্মাদনার মাদল-ধামসা-ঢোল। এত তীব্র কোলাহলের মধ্যে আকাশের যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর একটি কাক-পক্ষীও দৃষ্টিগোচর হয় না। পদাতিক যোদ্ধা-রথ-হস্তী-অশ্বের পায়ের দাপাদাপিতে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে উড়ছে ধূলি এবং কাঁকড়।

হঠাৎ থেমে যায় রামপালের সৈন্যদলের মাদল-ঢোলের শব্দ। চার অশ্বারোহী এগিয়ে আসতে থাকে পপীপের সৈন্যদলের অবস্থানের দিকে। তাদের মাথার ওপর উঁচু করে তুলে ধরা সাদা কাপড় পতপত করে উড়ছে। তাদের আসতে দেখে নিজেদের যুদ্ধবাদন বন্ধের নির্দেশ দেয় ভীম। রামপালের চার অশ্বারোহী এসে অভিবাদন জানায় পপীপকে। বলে– আমাদের রাজা মহামান্য রামপাল যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শেষবারের মতো আলোচনায় বসতে চান মাননীয় ভীমের সাথে।

এ কী কোনো চাল! ভীমের সেনাপতিরা সন্দিগ্ধ নয়নে তাকায় পরস্পরের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামপালের বার্তাবাহকরা বলে– আলোচনা হবে দুইপক্ষের অবস্থানের ঠিক মধ্যবিন্দুতে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে। সেটি এমন একটি স্থান যেখানে সুদক্ষতম ধনুর্ধরের তীরও পৌঁছাতে পারবে না কাউকে আঘাত করার জন্য। দুই পক্ষে অংশ নেবেন চারজন করে আলোচক। একদিকে থাকবেন রামপাল এবং তার তিন সঙ্গী। ভীমের সঙ্গেও থাকবে তিনজন সঙ্গী। তাদের কারো হাতে কোনো অস্ত্র থাকবে না। উন্মুক্ত স্থানে আলোচনা হবে। দুই পক্ষের সকলেই দেখতে পারে সেখানে কী ঘটছে।

উগ্র বলে– আর্যদের সকল পদক্ষেপই কুটিলতায় ভরা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো-না-কোনো কূটচাল রয়েছে বটি! ভীম তোমার উচিত হবে না ফাঁদে পা দেওয়া।

ভীম হাসে– সকলের দৃষ্টির সামনে যখন সূর্যদেবের আলোর নিচে প্রকাশ্য আলোচনার প্রস্তাব এসেছে, সেখানে যোগ না দিলে ভূমিপুত্রদের অপমান হবে।

বার্তাবাহকদের দিকে ভীম বলে– রামপালকে গিয়ে জানাও, আমি এই আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তোমরা নিজেদের শিবিরে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অস্ত্র ও বর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আলোচনাস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করব।

ভীমকে অভিবাদন জানিয়ে ফেরার পথ ধরে চার বার্তাবাহক।

ভীম এবার সহচরদের দিকে তাকিয়ে বলে– প্রধান সেনাপতি হরিবর্মা! আমার অবর্তমানে এই সৈন্যদলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার আপনার হাতে থাকবে। আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। সবচেয়ে দ্রুতগামী একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত রাখুন। যদি মনে হয়, রামপাল ছলনা করে আমাদের নিরস্ত্র অবস্থায় ডেকে নিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই বাহিনীকে অগ্রসরের নির্দেশ দেবেন। আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবেন পদ্মনাভ, আর যাবে মল্ল এবং ঠাণ্ডামাথার উগ্র।

ভীম তিন সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কিছুদূর এগুতেই দেখা যায় রামপাল আসছে। তার সঙ্গে আরও তিন সঙ্গী। তাদেরকে নিরস্ত্রই মনে হচ্ছে। তবে রামপালের তিনসঙ্গীর একজন আবার তার মাথার ওপর রাজছত্র ধরে আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মধ্যবিন্দুতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ে ভীম। অপেক্ষা করতে থাকে রামপালের এসে পৌঁছানোর জন্য। রামপাল এগিয়ে আসছে। রাজকীয় পরিচ্ছদে আবৃত রামপালের দেহ। মনে মনে হাসে ভীম। এই যুদ্ধক্ষেত্রেও রাজবেশ! তারপরেই মনে হয়, রামপাল তো আর প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। সে মানব-ব্যূহের মধ্যে অবস্থান নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসবে শুধুমাত্র সৈন্যদের উৎসাহ জোগাতে।

কাছাকাছি এসে পৌঁছানোর পরে ভীম এবং রামপাল মুখোমুখি দাঁড়ায়। কেউ কাউকে অভিবাদন করে না। রামপাল আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের পরিচয় জানায়– আমি রামপাল। পরম সৌগত রাজ-চক্রবর্তী মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তার অবর্তমানে পাল-সাম্রাজ্যের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী।

এরপর সঙ্গী তিনজনকে পরিচয় করিয়ে দেয় রামপাল– আমার দক্ষিণ পাশে রয়েছেন আমার পূজ্য মাতুল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নরপতি মথন দেব। বাম পাশে রয়েছেন তদীয় পুত্র, আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ কাহ্নুর দেব। আর আমার মাথার ওপরে রাজছত্র ধরে আছেন আমাদের বংশানুক্রমিক অঙ্গরক্ষক (দেহরক্ষী) দলের প্রধান নারায়ণ বর্মা।

এবার নিজের ও সঙ্গীদের পরিচয় দেয় ভীম– আমি ভীম। এই বরেন্দির একজন ভূমিপুত্র। বরেন্দির সকল ভূমিপুত্র একত্রিত হয়ে আমাকে তাদের নেতা ও সেবক নির্বাচিত করেছেন। আমার ডান পাশে রয়েছেন বিদ্বানশ্রেষ্ঠ সুপরামর্শক পদ্মনাভ। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৈবর্তজাতির অন্যতম গর্বপুরুষ মল্ল। আর বাম পাশে রয়েছেন যুদ্ধবিশারদ উগ্র।

এবার পরস্পর পরস্পরের সাথে অভিবাদন বিনিময় করে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনার সূত্রপাত করে রামপাল। বলে– ভীম! আমি তোমাকে শেষবারের মতো সুযোগ দিতে চাই বলেই এই আলোচনায় আহ্বান জানিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই মানবে একথা যে বরেন্দ্রী আমার পিতৃ-পিতামহের রাজ্য। পালসম্রাটদের জনক-ভু। এই মহান আর্য-ভূখণ্ড তোমরা জোর করে নিজেদের অধিকারে রেখেছ। বিনা রক্তপাতে তুমি যদি বরেন্দ্রী আমার হাতে প্রত্যর্পণ করো, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। সেইসঙ্গে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কারেও ভূষিত করব। আমি তোমাকে আমার কোনো একটি সামন্ত রাজ্য দান করব। সেইসঙ্গে তোমাকে দেওয়া হবে স্বর্ণ-রৌপ্য-প্রাসাদ-সুন্দরী রমণী। তোমার সহযোগীদের অপরাধও ক্ষমা করা হবে। তাদেরকে যথোচিত পদ দান করতেও আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। শুধু আমি চাই, আর্য-ভূখণ্ড আর্য অধিকারে ফিরে আসুক।

ভীম মৃদু হাসে। বলে– এই বরেন্দি কীভাবে আর্য-ভূখণ্ড হতে পারে? সবাই তো জানে আর্যদের বাসস্থান হচ্ছে আর্যাবর্ত। তুমি কি আর্যাবর্তের ভূগোল ভুলে গেছ রামপাল? তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি। পতঞ্জলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যাবর্তের পরিষ্কার সীমানির্দেশ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রাগ্ আদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাদ্ দক্ষিণেন হিমবন্তম্ উত্তরেণ পারিযাত্রম্।' অর্থাৎ আদর্শের পূর্ব, কালকবনের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ, এবং পারিযাত্রের উত্তর– এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমিই আর্যাবর্ত। তাহলে বরেন্দি কীভাবে আর্যদের বাসভূমি হয়?

এমন উত্তর আশা করেনি রামপাল বা তার সঙ্গীরা কেউ। ভীমের কথার উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে সরাসরি উত্তপ্ত কণ্ঠে রামপাল বলে– মনে রেখো ভীম, আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও জাতিতে ক্ষত্রিয়। আমি পাণ্ডববীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বংশধর। সেই অর্জুন, যিনি শত-সহস্র ম্লেচ্ছ-যবন-অসুর রাজাকে বধ করে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর বানিয়েছিলেন তার ভ্রাতা ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরকে। সেই অর্জুন, যার তুল্য বীর পৃথিবীতে অতীতে জন্মগ্রহণ করেনি, আর ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করবে না। সেই ক্ষত্রিয় শোনিত বইছে আমার শিরা-উপশিরায়। সেই ক্ষত্রিয় শোনিতের ঝলকানিতে তোমরা ভেসে যাবে তৃণবৎ।

ভীমের ঠোঁটের হাসি একটুও ম্লান হয়নি। বলে– আমি ভূমিপুত্র একলব্যের বংশধর। সেই একলব্য, যার কথা মহাভারতে লেখা রয়েছে। পড়েছ নিশ্চয়ই। তবু আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। মহাভারতকার লিখছেন– 'একলব্য দ্রোণের কাছে এলেন, কিন্তু নীচুজাতি বলে দ্রোণ তাকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মৃন্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা করে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন। তাদের একজন অনুচর মৃগয়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হলো এবং তার কৃষ্ণবর্ণ মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বান ছুঁড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তারা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তার কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনোও শিষ্য আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে না। কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করল কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন। একলব্য দ্রোণকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে বললেন, ভগবান, কী দেবো আজ্ঞা করুন। গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নাই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও! এই বাক্য শুনে একলব্য প্রফুলমুখে অকাতরচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দ্রোণকে দিলেন। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন।'

পুরো উদ্ধৃতি শেষ করে ভীম বলে– বুঝতে পেরেছ তো রামপাল, তোমার বংশের পূর্বপুরুষ অর্জুন আমার পূর্বপুরুষ একলব্যের সাথে যুদ্ধে জেতেনি; ছলনায় জিতেছে। ন্যায়যুদ্ধে কখনো কোনো আর্য কোনো ভূমিপুত্রকে পরাজিত করতে পেরেছে এমন কোনো উদাহরণ নেই রামপাল। তুমিও পারবে না।

ভীমের যুক্তিজালে এমনভাবে ধরাশায়ী হতে হবে, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রামপাল। সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বলে– আমি মহান বুদ্ধের অনুসারি। অকারণ রক্তপাত আমার ধর্মে নিষিদ্ধ বলেই আমি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তোমার মতো নীচজাতির লোকের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বিবেচনাবোধ তোমার মতোই নীচ। বেশ, তবে যুদ্ধই হোক! তোমাদের রক্তস্নানে শুদ্ধ করেই আমি আমার জনক-ভূ বরেন্দ্রীর পবিত্রতা ফিরিয়ে আনব!

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে রামপাল ইঙ্গিত করে আলোচনাস্থল ত্যাগ করার। কিন্তু মথন দেব নড়ে না। রামপালকে মনে করিয়ে দেয় যে যুদ্ধ শুরুর যুদ্ধের নিয়মাবলি স্থির করতে হবে।

রামপাল তিক্তস্বরে বলে– আপনিই পাঠ করে শোনান যুদ্ধের নিয়মাবলি। যদি ওরা মেনে চলতে সম্মত হয়, তাহলে সেই নিয়মাবলি মেনেই যুদ্ধ হবে।

মথন দেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়– যেহেতু এটি মুখোমুখি যুদ্ধ, তাই যুদ্ধের কিছু নিয়ম-নীতি মেনে যুদ্ধ করাই প্রকৃত বীরপুরুষদের রীতি। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি কিছু নিয়মের প্রস্তাব করতে পারি।

উগ্র বলে– আমাদের শুনতে আপত্তি নেই। তবে মেনে নেবো কি না, তা নির্ভর করবে ভীমের সিদ্ধান্তের ওপর।

মথন দেব মাথা ঝাঁকিয়ে পড়তে শুরু করে– নিশাকালে কোনো যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ হবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ভীম মাথা ঝাঁকায়– বলে যাও!

মথন দেব পড়তে থাকে– যারা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে আসবে, তাদের হত্যা করা হবে না।

অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে হত্যা করা হবে না।

যারা আহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিতে আসবে, তাদের ওপর অস্ত্রনিক্ষেপ করা হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা ঢোল-মাদল বাজায় তাদের আঘাত করা হবে না।

যারা মৃতদেহ সৎকারের কাজ করবে তাদের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করা হবে না।

দ্বৈরথের জন্য যাকে আহ্বান করা হবে, সে যুদ্ধে যোগদান করবে। দ্বৈরথের সময় রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক যুদ্ধ করবে।

যুদ্ধ করতে করতে কেউ যদি অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাকে হত্যা করা চলবে না।

নিয়মাবলি পাঠ শেষে পালাক্রমে রামপাল এবং ভীমের ওপর ঘুরতে থাকে মথন দেবের দৃষ্টি। ভীম কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে– আমি মেনে নিলাম। আমাদের সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হবে এই নিয়মাবলি।

রামপাল কোনো কথা বলছে না দেখে উগ্র জিজ্ঞেস করে– রামপাল কি নিয়মাবলি মেনে নিতে সম্মত নন? নিয়মাবলির প্রস্তাবগুলি সবই কিন্তু এসেছে আপনাদের দিক থেকেই!

রামপাল একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উগ্রর দিকে। বলে– মেনে নিলাম। তারপর ছত্রধরের জন্য অপেক্ষা না করেই হাঁটতে থাকে নিজের সৈন্যদলের দিকে।

২২. ভীমের প্রার্থনা

পিতৃগণ আমরা আজ তোমাদের সেই হাতের স্পর্শ কামনা করি–

যে হাত মাটির বুক খুঁড়ে সবুজ শস্যশিশুদের পৃথিবীতে এনেছে, আবার জোড়করে স্তব করেছে মৃত্তিকার; যে হাত বনের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে বাসের বসত আর চাষের মাটি; যে হাত বনের শিকার এনে তুলে দিয়েছে শিশুদের মুখের গরাস; যে হাত প্রাচীর তুলে ঘরের নিরাপত্তা দিয়েছে উত্তরপুরুষকে আবার তার জন্য অবারিত করে দিয়েছে দিগন্তের অধিকার; যে হাত রক্তাক্ত হয়েছে হলকর্ষণে; যে হাত রুধিরাক্ত হয়েছে মাটির অন্ধকার রহস্য উন্মোচন করে লৌহ-আকরিক নিষ্কাশনে; যে হাত হাতুড়ির ঘাতে-প্রতিঘাতে কাঁচা লোহাকে দিয়েছে কাস্তের স্বরূপ; যে হাত সুরক্ষা দিয়েছে কৌমের নারী-শিশু-বৃদ্ধদের; যে হাত শিশুদের মাথার চুলে আর কৃষ্ণকালো পৃষ্ঠত্বককে অশেষ স্নেহ বিলিয়েছে স্পর্শের জাদু দিয়ে; যে হাত শৃঙ্খলিত হয়েছে, কিন্তু শৃঙ্খল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙার প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয়নি কোনোদিন; যে হাত অতীতের দিকে আঙুল তুলে মনে করিয়ে দিয়েছে সাম্যের কথা; যে হাত ভবিষ্যতের দিকে আঙুল তুলে বলেছে মুক্তির কথা!

মাতৃগণ আমরা আজ তোমাদের সেই হাতের স্পর্শ কামনা করি–

যে হাত আমাদের শৈশবকে রক্ষা করেছে আর কৈশোরকে দিয়েছে সুরক্ষা; যে হাত ঝিনুকে ঝিনুকে আমাদের মুখে তুলে দিয়েছে প্রাণের স্পন্দন; যে হাত আমাদের হাসি দেখে টেনে নিয়েছে বুকে, আমাদের কান্না শুনে টেনে নিয়েছে বুকে; যে হাত চিরকাল নিভিয়ে এসেছে কৌমপুরুষদের পেটের আগুন; যে হাত তিথি ও পরবে দুয়ারে-আঙিনায় আল্পনা এঁকে স্বাগত জানিয়েছে ওলান ঠাকুরকে; যে হাত সন্তান ও কৌমের মঙ্গলকামনায় বার বার জোড়কর হয়েছে মাতৃদেবীদের উদ্দেশ্যে; যে হাত শুশ্রূষা হয়েছে, হয়েছে আশ্রয় আর অনন্ত ক্লান্তিহরণী; যে হাত অনন্তকালব্যাপী অন্নযোগানি; যে হাত শত্রুহস্তে নিহত পুত্রের শব বুকে নিতে নিতেও আরেক পুত্রকে পাঠিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে; যে হাত কৌমের জীবনকে শ্রীময়ী করেছে চিরকাল; যে হাত ঝড়ের মুখে কৌমের করঞ্জদীপকে ঘিরে রেখে দূর করেছে অন্ধকারের ভীতি; যে হাত নিজের বুক ফেঁড়ে হৃৎপিণ্ড তুলে দিয়েছে সন্তানের মুক্তি-কামনায়; যে হাত অগ্নিশয্যাকে বারংবার পরিণত করেছে পুষ্পশয্যায়!

হে আমার বরেন্দির মাটি ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া রাতের বাতাস!

তুমি তো ধারণ করে আছ আমাদের পূর্বপুরুষের সকল নিশ্বাস। আমাদের পিতৃ-মাতৃগণের শেষ নিশ্বাস মিশে আছে তোমার শরীরে। তুমিই তো সেই নিশ্বাসগুলি আবার বহন করে আনো আমাদের বুকের ভেতরে, দিয়ে যাও বরাভয়, তাদের আশীর্বাদ! হে বায়ুদেবতা তুমি আমাদের বুকের মধ্যে পিতৃগণের সাহসের বরাভয় সঞ্চারিত করো অবিরাম! আমার সাথীদের জানাও, তাদের পিতৃপুরুষ কোনোদিন কাপুরুষ ছিল না। আমার সাথীরা জানুক, তাদের পিতৃপুরুষ ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত হয়নিকো কোনোদিন! আমাদের মাতৃগণের সকল সরব-নীরব প্রার্থনা ধারণ করেছ তুমিই হে বায়ুদেব! তুমি তো জানো গর্ভকালে কী প্রার্থনা জানাতেন তারা দেবতার কাছে। তুমি তো জানোই হে বায়ুদেব, আমাদের মাতৃগণ চাইতেন না কোনো দাসের গর্ভধারিণী হতে! তুমি আমার সাথীদের কাছে বলো তাদের পিতৃ-মাতৃগণের প্রতিজ্ঞা-প্রার্থনার কথা!

হে আমার বরেন্দির মাটি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে শৃঙ্খলমুক্ত রাখার জন্য যে সন্তানরা একত্রিত হয়েছে, মাতা তুমি তাদের পায়ে দাও লৌহস্তম্ভের দৃঢ়তা, শত্রুর সহস্র আঘাতও যেন তাদের টলাতে না পারে একচুলও! তোমার সন্তানের জয় মাগো তোমারই তো জয়, তাদের পরাজয়ে মাগো তোমারই অপমান। সেই অপমান নিয়ে যেন তোমার এই সন্তানকে তোমার বুকে বিচরণ করতে না হয়! হে আমার মৃত্তিকা-মাতৃদেবী! যে তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে, তোমার বুক থেকে পায় মাগো ফসল-আশিস; যে তোমাকে স্তব করে, তোমার বুকে সে পায় মাগো রাতের বিরাম আর দিনের কর্মস্পৃহা; তোমাকে যে নিজমাতা জ্ঞানে ভালোবাসে, তোমার ভূগোল থেকে পায় মাগো নিরাপত্তার বিভব। যারা তোমাকে মা বলে জানে না, সেই দস্যুদলের প্রতিরোধে সাথীরা আমার আজ এখানে সবাই। তাদের অন্তরে তুমি বিরাজিত থেকো গো মা সকল প্রহর!

হে সুপ্তিময় রাত্রি!

আমার সাথীদের দাও বিশ্রামের অকণ্টকিত সুখ। তাদের নিদ্রার ভেতর যেন কেউ বুনতে না পারে দুঃস্বপ্নের বীজ! ঘুমের ঔষধি পেয়ে তারা যেন পরবর্তী প্রত্যুষে জেগে উঠতে পারে ক্লান্তিমুক্ত সিংহের মতো। তাদের হাতের অস্ত্র যেন ঝলসে দিতে পারে সকালের সূর্যের চোখ!

২৩. যুদ্ধের আগের মুহূর্তগুলি

রাত তখনো খুব বেশি হয়নি। নিজের তাঁবুতে বসে আছে পপীপ। সামনে ভূর্জপত্র, খাগের লেখনি, ভুষাকালির পাত্র। মমতামাখানো দৃষ্টিতে লেখার উপকরণগুলির দিকে তাকিয়ে আছে পপীপ। ভীমের ঠিক বাম পাশের তাঁবুতে বসে ভাবছে আগামী প্রত্যুষের কথা। আগামীকাল সূর্যোদয় থেকে শুরু হবে যুদ্ধ। গর্বে বুক ফুলে উঠছে তার। বিকালে ভীম তাকে পাঠিয়েছিল পূর্বদিকে অবস্থান নেওয়া সৈন্যদের কাছে। যুদ্ধের নিয়মাবলি জানিয়ে দেওয়ার জন্য। ভূমিপুত্রযোদ্ধাদের সেগুলি খুব বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছে পপীপ। তার পাশাপাশি সবিস্তারে বর্ণনা করেছে ভীমের সাথে রামপালের তর্কযুদ্ধের কথাও। বলার সময় প্রয়োজনীয় কাব্যরসও মিশিয়ে দিয়েছিল পপীপ। যোদ্ধারা খুব রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছে ভীমের যুক্তির কাছে রামপালের নাকাল হওয়ার বিবরণ। সৈন্যরা এমনিতেই ভীমকে শ্রদ্ধা করে দেবতার মতো। তার বুদ্ধিমত্তার বিবরণ শুনে তারা একেবারে অভিভূত। বিশেষ করে আর্যদের শাস্ত্র দিয়েই যে আর্যদের ঘায়েল করা যায় তা এই প্রথম জানতে পেরেছে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীমের বুদ্ধিমত্তার কারণেই। এখন রামপাল কী করবে? নিজের শাস্ত্র নিজেরই বিপক্ষে যাচ্ছে দেখে কি শাস্ত্র ত্যাগ করে কৈবর্তদের ধর্ম গ্রহণ করবে? বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়েছে যোদ্ধারা। তারপর মুখে গর্বের ছাপ নিয়ে বলেছে– হ্যাঁ। ভীম একটা নেতার মতোন নেতা বটি! এমন নেতার জন্যে জীবন দিয়েও সুখ!

নিজের স্বজাতি হলেও কৈবর্তদের এখনো যেন পুরোপুরি চিনে উঠতে পারেনি পপীপ। কাল সকাল থেকে যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধে কার যে কখন আর কোন পথে মৃত্যু আসবে কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত মনে হয়নি কাউকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বরেন্দির এই প্রান্তে তারা যেন বনভোজনে এসেছে। গল্প করছে, হই-চই করছে, কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কারো অস্ত্রে একটু জং ধরার রং চোখে পড়লে হাসতে হাসতে বলছে, আরিব্বাপরে তোর তরবারিতে তো মরচের বিষ লেগে আছে রে। যাকে মারবি, সে ব্যাটা যদি তখনকার মতো বেঁচেও যায়, তাহলেও এই মরচের বিষে বেচারা পচা ঘা হয়ে নির্ঘাৎ মারা যাবে!

এমনভাবে সে কথাটা বলে, যেন মরে যাওয়ার চেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটার শরীরে পচা ঘা হওয়াই বেশি বিপজ্জনক।

তার কথা শোনামাত্র হো হো হাসির এমন শব্দ ওঠে যে তাঁবু উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

রাতের খাবার নিয়ে এসেছে রাঁধুনি। তাকে নিয়েও রসিকতার অন্ত নেই। কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে– ওরে ও রান্ধুয়া, আমাকে আর এক হাতা ভাত দে। পেটে খিদে নিয়ে মরে গেলে শেষে দুঃখ থেকে যাবে।

আবার হাসি।

পপীপ তাদের জানায় যে রাতে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে নিষেধ করেছে ভীম। ভালো করে ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা ঝরঝরে হবে। সকালে যুদ্ধের সময় সবাই তরতাজা থাকবে। একজন জিজ্ঞেস করে পপীপকে– যুদ্ধ কি খুব সকালে শুরু হবে? একেবারে সূয্যিদেব উঁকি দেবারও আগে?

পপীপ উত্তর দিয়েছে– তা-ও হতে পারে। কেন? খুব সকালে যুদ্ধ শুরু হলে তোমার কোনো অসুবিধা আছে কী?

লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে– খুব সক্কালে যুদ্ধ শুরু হলে আমার একটু অসুবিধাই হবে রে পপীপ। আমার আবার একটু বেলা না উঠলে বাহ্যি হয় না বটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার যে হাসির হররা ছোটে তা শুনে বোধহয় চমকে জেগে উঠবে দুই ক্রোশ দূরে ঝিমুতে থাকা রামপালের সৈন্যশিবিরও।

নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে এইসব কথাই ভাবছে পপীপ। গর্বে ফুলে উঠছে তার বুক। এই হচ্ছে তার স্বজাতি ভূমিপুত্ররা। যাদের কাছে জীবন-মৃত্যু যেন পায়ের ভৃত্য। এমন জাতির মধ্যে জন্মাতে পারাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। ঠোঁটে হাসি নিয়েই খাগের লেখনি হাতে তুলে নেয় সে। পাট করে বিছিয়ে নেয় ভূর্জপত্র। আগে যতগুলি শ্লোক লেখা হয়েছে, সেগুলি সে রেখে এসেছে কুরমির কাছে। সে জানে কুরমি সেগুলি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মতোই আগলে রাখবে। তবু বারংবার পপীপ মনে করিয়ে দিয়েছে কুরমিকে যে ওগুলি এখন কৈবর্ত জাতির সম্পদ। সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে বাকি অংশটুকু লিখে সম্পূর্ণ করবে কাব্যটি। আর যদি ফিরে না আসে তাহলে কুরমিকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে এই শ্লোকগুলিকে। কতদিন? যতদিন না আবার মুক্ত হবে এই মাটি। যতদিন এমন লোককে পাওয়া না যায়, যার হাতে তুলে দিলে ভূমিপুত্রদের হাতে ফিরে যাবে ভূমিপুত্রদের এই গৌরব-কাহিনী।

নিস্তব্ধ হয়ে গেছে ভীমের শিবির। ভীম নিজেও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যোদ্ধারা সকলেই ঘুমাচ্ছে। কারণ রাত্রিকালে যুদ্ধ করা হবে না। যুদ্ধের নিয়মাবলির প্রথম শর্তই এটি। এই জায়গাটি অনেকটা মালভূমির মতোই। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনো জনবসতি নেই, কোনো গ্রাম নেই। মাটি ন্যাড়া, শক্ত, কাঁকড়ময়। বড় বৃক্ষ তেমন চোখে পড়ে না। ছোট ছোট ঝোপ বলতে আছে কিছু কাঁটাগাছ আর তাদের পেটের নিচে কিছু মুথাঘাস। যুদ্ধক্ষেত্ররূপে এই জায়গা নির্বাচন প্রসঙ্গে ভীম বলেছে, এখানে যুদ্ধ হলে ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ এখানে কোনো ফসল ফলে না। তাছাড়া শত্রুশিবির অঞ্চলটি দিগন্তবিস্তৃত হওয়ায়, এবং সেদিকে কোনো বড় বৃক্ষ বা টিলার আড়াল না থাকায় এখানে অনেক দূর থেকে শত্রুর গতিবিধি বুঝতে পারা যাবে। আরেকটি কারণও বলেছে ভীম। সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আকাশ-বাতাস-মাটি সবকিছুই তেতে ওঠে। খুব গরম অনুভূত হয়। আমাদের ভূমিপুত্র-যোদ্ধারা এমন গরম সহ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু রামপাল এবং তার যোদ্ধারা এই গরমে হাঁসফাঁস করবে। তাদের শক্তি অর্ধেক ব্যয়িত হয়ে যাবে এই প্রচণ্ড গরমের সাথে যুদ্ধ করতে করতেই। প্রকৃতি ও জলবায়ুর এই সুবিধাটিকে কাজে লাগানোর জন্যই এই স্থানকে বেছে নেওয়া। মনে মনে ভীমের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করে পপীপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পপীপের হাতের লেখনি এখনো ভূর্জপত্রের বুকে একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। আজ হঠাৎ তার কুরমির কথা মনে পড়ছে। রোজই মনে পড়ে। কিন্তু এখন একটু বেশি মনে পড়ছে। হয়তো সে মনে মনে চাইছে তারা যখন গৌরবময় যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সেই সময় কুরমি তাকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখুক। কিন্তু তা কী সম্ভব! নিজের অসম্ভব কল্পনায় পপীপ নিজেও একটু লজ্জা পেয়ে যায়।

লেখনি হাত থেকে নামিয়ে রেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে শয্যায়। আজ পপীপের ওপর ভর করেছে এক মধুর আলস্য। আজ আর শ্লোক রচনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তারচেয়ে শুয়ে শুয়ে কুরমির কথা ভাবতে ভালো লাগছে। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চোখ বন্ধ করে পপীপ।

২৪. পরাক্রমের দিন

প্রভাতকে ডেকে এনেছে রামপালের বাদকদল। রাতের আলো-অন্ধকার লগ্ন থেকেই তারা বাজিয়ে চলেছে যুদ্ধবাদ্য। তাদের সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে শিবিরের সামনে। সূর্য ওঠেনি এখনো। কিন্তু সকালের কোমল আলোতেও ঝিকমিক করে উঠছে তাদের আকাশমুখো সঙ্গীনগুলি। ভীম বোঝে এ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের শুরু। কৈবর্তযোদ্ধাদের নিজেদের সৈন্য এবং অস্ত্রের প্রাচুর্য দেখিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে রামপালের সেনাপতিরা। ভীমের ঠোঁটে ফুটে ওঠে মৃদুহাসি। এতদিনেও তুমি কৈবর্তদের চিনতে শেখোনি রামপাল! এসব দেখে কৈবর্তযোদ্ধা তো দূরের কথা, কোনো কৈবর্তশিশুর বুকেও একবিন্দু ভয় ঢুকবে না।

নিজের পাশে সহযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পায় ভীম। সকলেই তৈরি যুদ্ধের জন্য। তাদের মুখের দিকে তাকায় ভীম। গর্বে ফুলে ওঠে তার বুক। এই সাথীদের নিয়ে রামপাল আর তার আঠারো মহাসামন্ত কেন, পৃথিবীর সকল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও ভয় পাবে না ভীম।

ভীমের শিবিরের তাঁবুগুলো স্থাপন করা হয়েছে এক সারিতে। অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে। কিন্তু তাদের ঠিক মাঝখানে বিশাল বড় একটি ফাঁকা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছে। রামপালের গুপ্তচররা এই সংবাদ জানিয়েছে তাদের সেনাপতিদের। কিন্তু তারা কেউ বুঝতে পারেনি এমনভাবে তাঁবু স্থাপনের তাৎপর্য কী! কেন ব্যূহের ঠিক মাঝখানে এতবড় একটি ফাঁক! এ কি ভীমের কোনো বড় চাল নাকি কৈবর্তদের চিরাচরিত নির্বুদ্ধিতা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত সেটা নিয়ে ভাবার সময় নেই। কারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রামপালের শিবির থেকে বিপুল বেগে ধূলির ঝড় তুলে যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল এক অশ্বারোহী যোদ্ধা। তার চিৎকার শোনা যাচ্ছে এখান থেকেই। সে আহ্বান জানাচ্ছে দ্বৈরথ যুদ্ধের– আমি মহারাজাধিরাজ রামপালের যোদ্ধা। তোমাদের মধ্যে আছে কোনো বীর যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? যদি থাকে কেউ, আর যদি প্রাণের মায়া কারো না থেকে থাকে, সে আসুক! যুদ্ধ করুক আমার সঙ্গে!

আহ্বান শোনামাত্র হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে ভীমের অশ্বারোহী কয়েকজন যোদ্ধার মধ্যে। সকলেই যেতে চায়। প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার গৌরব কেউ খোয়াতে রাজি নয়। ভীমের জন্য এ এক মধুর সমস্যা। সে একজনকে বেছে দিলে অন্যেরা ভাববে তার শক্তির প্রতি নেতার আস্থা নেই। ভীমকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে মুকেন্দে। সে বাজখাঁই কণ্ঠে চিৎকার করে বলে– চোপ্! কে প্রথম যুদ্ধ করবে তা ঠিক করার আমরা কে! তা ঠিক করবে ওলান ঠাকুর!

এ আবার কেমন কথা! আর ওলান ঠাকুর এখানে আসবেই বা কোত্থেকে! সে তো সবসময় শূন্যে মিলিয়ে রাখে নিজেকে। তাকে কেউ কি দেখেছে কোনোদিন?

এসব প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না মুকেন্দে। সে ঝোলা থেকে বের করে একটি কালো মোরগের পালক। বলে– যুদ্ধযাত্রার সময় পুজো দেওয়া হয়েছে। বলি দেওয়া হয়েছে কালো মোরগ। এই মোরগের পালকই ঠিক করে দেবে কে যাবে প্রথমে যুদ্ধ করতে।

কথা শেষ করে কালো পালকটি বাতাসে ভাসিয়ে দেয় মুকেন্দে। এলোমেলো বাতাসে কিছুক্ষণ এলোমেলো ভাবে ভাসে পালকটি। তারপর হঠাৎ কী হয়, চিলের মতো ছোঁ মেরে এসে সেটি আছড়ে পড়ে বিজুর গায়ে।

বিজু!

ও যে এখনো দুধের শিশু! বয়স বড়জোর পনেরো বা ষোলো বৎসর। সে কীভাবে যুদ্ধ করবে দশাসই এবং প্রশিক্ষিত একজন যোদ্ধার সঙ্গে!

কিন্তু বিজুর কোনো ভাবান্তর নেই। বরং ওলান ঠাকুর তাকে বেছে নেওয়ায় গর্বে এবং খুশিতে আটখানা সে। আনন্দের হাসিতে কালো দুই ঠোঁট ফাঁক হয়ে তার ধবধবে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়েছে। পাছে কোনো কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়ে যায় এই ভয়ে সে ভীমের কাছে আশীর্বাদ নিতে পর্যন্ত আসে না। সটান উঠে বসে ঘোড়ার পিঠে। তরবারি উঁচিয়ে ছুট লাগাতে চায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। মল্ল ছুটে যায় তার দিকে। চেঁচিয়ে বলে– আরে বোকা ঢালটা তো সঙ্গে নিবি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও কাকা! বলে ছোঁ মেরে ঢালটা হাতে তুলে নিয়েই সে ঘোড়া ছোটায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

তাকে দেখে হেসে ওঠে পালসৈন্য। তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আর কাউকে পেল না ভীম। পাঠিয়েছে এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। সে হাসতে হাসতে বলে– যা বাছা মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যা! তা নইলে আমি তোকে মশকের মতো পিষ্ট করব দুই হাতের তালু দিয়েই। অস্ত্রাঘাতের প্রয়োজনই পড়বে না আমার।

তার ভাষা বোঝে না বিজু। তবে লোকটা যে তাকে অবজ্ঞা করছে, হাতের মুদ্রায় মশা টিপে মারার ভঙ্গি করছে সেটা ঠিকই বোঝে সে। তার কৈবর্ত-রক্তে আগুন ধরে যায়। তরবারি উঁচিয়ে তেড়ে গিয়ে আঘাত করে লোকটাকে। তার আঘাত অনায়াসে ঠেকিয়ে দেয় লোকটা। তার চোখের কোণেও ক্রোধের লাল ছিটে জমা হয়েছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে– তোকে সুযোগ দিয়েছিলাম চলে যাওয়ার। তা গ্রহণ করলি না। এবার তবে মর!

প্রচণ্ড বেগে বিজুর মাথার দিকে নেমে আসে আর্যবীরের দুধারী খড়্গ। ঢাল তুলে ঠেকায় বিজু। কিন্তু এতই শক্তি ছিল লোকটার আঘাতের যে ঢালের সঙ্গে খড়্গের আঘাতে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় দুই সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধাদের। আর আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও সেই আঘাতের ধাক্কায় ঘোড়া থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বিজু। তার হাত থেকে ছিটকে অনেকটা দূরে পড়ে গেছে তার তরবারি এবং ঢাল। এমন ভাবে বিজুকে পড়ে যেতে দেখে হায় হায় করে ওঠে কৈবর্তযোদ্ধাদের কেউ কেউ। কেবল মল্ল নির্বিকার। সে নিজহাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বিজুকে। জানে বিজু ঠিকই জিতবে এই অসম দ্বন্দ্বযুদ্ধে।

মাটিতে পড়েই আবার তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় বিজু। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আর্যসৈন্য এবার ঘোড়া হাঁকায় বিজুর শরীর লক্ষ করে। তার ইচ্ছা ঘোড়ার পায়ের তলে পিষে মারবে বিজুকে। প্রশিক্ষিত যুদ্ধের ঘোড়া মুহূর্তে গতি সঞ্চার করতে পারে নিজের দেহে। তীর বেগে ছুটে আসে বিজুর দিকে। দুই সারির সৈন্যরা তখন দেখতে পায় বিজুর শরীরে বিদ্যুতের ঝলক। সাবলিল ভঙ্গিতে আগুয়ান ঘাতক অশ্বের পাশ কাটিয়ে যায় বিজু। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে লক্ষ করে এবার গদা চালিয়েছিল আর্যসৈন্য। মাথা নিচু করে সেই গদার আঘাতও এড়িয়ে যায় বিজু।

গতির গমকে অনেকদূর ছুটে আসার পরে নিজকে থামাতে পারে আর্যসৈন্যের ঘোড়াটি। এই সময়ের মধ্যে নিজের তরবারি হাতে তুলে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছে বিজু। তরবারি হাতে তোলার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার পায়ে ভর করে ছুটন্ত অশ্বের গতি। সে ছুটতে অশ্বারোহী আর্যসৈন্যের দিকে। লোকটা কেবল সামলে নিয়েছে নিজের ঘোড়ার গতিবেগ। মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে ঘোড়ার। এই সময় বিজু পৌঁছে যায় তার একেবারে গায়ের কাছে। চোখের কোণ দিয়ে বিজুকে দেখতে পেয়েছে লোকটা। সে আবার গদা ঘুরিয়ে আঘাত করতে যায় বিজুকে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তার অরক্ষিত শরীরের বাম পাঁজরের অস্থি-র ফাঁক দিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকে গেছে বিজুর তরবারির তীক্ষ্ণ ফলা। তীব্র ব্যথায় মুখটা হা হয়ে গেছে লোকটার। গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। কিন্তু তবুও দমে না প্রচণ্ড বলশালী লোকটা। গদা চালায় বিজুর মাথা লক্ষ করে। এবারও অনায়াসে সেই আঘাত এড়িয়ে যায় বিজু। তারপরে আবার ছুটে এসে তরবারির হাতলটা ধরে। জোরে আরও খানিকটা প্রবেশ করিয়ে দেয় লোকটার পাঁজরের মধ্যে। এই সময় হাত নাড়ায় লোকটা। লক্ষ্যহীন হলেও তার হাতের ঝাপটায় আবার মাটিতে পড়ে যায় বিজু। এবার যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তার হাতে একটা বড়মড় লালমাটির ঢিল। প্রচণ্ড গতিতে সে ঢিলটা ছোঁড়ে লোকটার ঘোড়ার মাথা লক্ষ করে। ঠিক ঘোড়ার ডান চোখে আঘাত করে ঢিলটি। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বদেহের প্রচণ্ড আলোড়নে মাটিতে আছড়ে পড়ে বিশালদেহী লোকটা। দুর্ভাগ্য তার। পড়েছে বাম কাত হয়ে। আর বিজুর তরবারি এবার পুরোটা ঢুকে গেছে তার পাঁজরের মধ্যে। শুয়ে শুয়েই শূন্যে বার দুয়েক হাত আছড়ায় লোকটা। তারপরেই সব শেষ! লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বিজু। পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে চিৎ করে মৃতদেহকে। তারপর তার বুকের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে আকাশের দিকে দুই হাত আর মুখ তুলে চিৎকার করে ওঠে– হা রে রে রে...।

তারপর আহ্বান জানায় রামপালের শিবিরের দিকে তাকিয়ে– আয় এবার কে আসবি!

প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ে কৈবর্তযোদ্ধারা। বিজুর যুদ্ধগুরু মল্লর দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ছে আনন্দে। কিন্তু বেশিক্ষণ আনন্দ করার সুযোগ নেই। রামপালের শিবিরের সামনে ধূলা উড়তে দেখা যায় আবার। এবার একাধিক অশ্বারোহী ছুটে আসছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। এবার নিশ্চয়ই পাঁচজন আসছে। দেরি করে না কৈবর্ত সেনাপতিরাও। আগে থেকেই ঠিক করা আছে। নিজ নিজ অস্ত্র হাতে নিয়ে তৈরি মল্ল, উগ্র, পরভু আর বাল্লু। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়ে দাঁড়ায় বিজুর পাশে।

প্রায় একই সাথে পৌঁছে গেছে রামপালের পাঁচ সৈন্যও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই স্বল্পস্থায়ী হলো এবারের পাঁচজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধও। কয়েকবার মাত্র অস্ত্র চালাচালি। তারপরেই দেখা গেল মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে রামপালের বীরপুঙ্গবরা।

পপীপ যুদ্ধ দেখে আনন্দে আত্মহারা। বুক তো গর্বে ফুলে ফুলে উঠছে প্রতিমুহূর্তেই, একই সাথে ইচ্ছা করছে এখনই খাগের লেখনি নিয়ে লিখতে বসবে বীররসাত্মক শ্লোকগুচ্ছ। তার ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে তাঁবুর ভেতরে। কিন্তু তা করতে গেলে যদি যুদ্ধের এই মহাকাব্যের কোনো অংশ দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হয়! এমন দৃশ্য দেখার জন্য যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে রাজি যে কোনো কৈবর্ত।

ওদিকে রামপাল বোধহয় ক্রোধে অস্থির। তার ক্রোধের কারণেই কি না রণভেরী বেজে ওঠে আরও অনেক তীব্রতায়। পারলে আকাশও কানে আঙুল দিয়ে এই শব্দের তীব্রতা থেকে বাঁচতে চায়। ভীম বুঝে ফেলে, এবার শুরু হতে যাচ্ছে সর্বাত্মক যুদ্ধ। নিজের যোদ্ধাদের দিকে ইঙ্গিত করে সে।

রামপালের শিবির থেকে অশ্বের হ্রেসারব ভেসে আসছে যুদ্ধবাদনের শব্দের পাশাপাশি। তার পুরো অশ্বারোহী বাহিনী এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে। তারা আকাশের দিকে তুলে রেখেছে তাদের তরবারি-বল্লমের ফলাগুলো। তারপর ধূলিঝড় দেখতে পায় ভীম। অগ্রসর হচ্ছে রামপালের সৈন্যদল। নিজের যোদ্ধাদের সামনে এগুনোর ইঙ্গিত করে সে। উল্লাসে ফেটে পড়ে কৈবর্তযোদ্ধারা। যুদ্ধের উন্মাদনায় আর সব অনুভূতি তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের কাছে। সবাই ছুটতে শুরু করে। সেই অবস্থাতেও ভীম একবার তাকায় পপীপের দিকে। কিন্তু পপীপকেও একই ভঙ্গিতে এবং অনুভূতিতে আচ্ছন্ন দেখতে পায় সে। মনে মনে হাসে। কৈবর্ত-রক্ত ডাক দিয়েছে। কবি পপীপ এখন আড়ালে চলে গেছে। বেরিয়ে এসেছে কৈবর্তভূমির মুক্তিযোদ্ধা পপীপ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নরক ভেঙ্গে পড়ে গঙ্গাতীরের যুদ্ধক্ষেত্রে। দুইটি মানব-সমুদ্রের ঢেউ যেন বাড়ি খায় পরস্পরের গায়ে। অস্ত্রের গায়ে অস্ত্রের ঘর্ষণে যে ঝন ঝন শব্দ ওঠে তা হাজার মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার শব্দের চাইতেও তীব্র। প্রতিপক্ষকে হত্যা করার নেশায় মেতে ওঠো হাজার হাজার মানুষ। মানুষ হত্যা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই কারোই। লুপ্ত হয়ে গেছে অন্য সকল অনুভূতি। সহানুভূতির বোধ, বন্ধুত্বের বোধ, বাৎসল্যের বোধ, দয়া-মায়া-করুণার বোধ, এমনকি নিজের শরীরে অন্যের অস্ত্রাঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ব্যথা-বেদনার বোধও যেন বিলুপ্ত হয়েছে যুযুধান মানুষগুলোর মন থেকে। হত্যা আর মৃত্যুর উৎসবে মেতে উঠেছে প্রত্যেকে। এমনকি পপীপও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে একটু জড়তা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে জড়তার চাইতে নিজের জন্য সর্বনাশা আর কিছুই হতে পারে না। তার ফল ভাগ করতে হয়েছে তাকে। এক আর্যসৈন্যের বল্লমের খোঁচা খেতে খেতে বেঁচে গেছে সে আরেক সতীর্থের কৃপায়। তার দিকে ধেয়ে আসা বল্লমটিকে সেই কৈবর্তযোদ্ধা নিজের ঢাল দিয়ে ঠেকিয়ে না দিলে এতক্ষণ হয়তো মাটিতে গড়াগড়ি যেত পপীপের আহত বা নিহত শরীর। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে শুধরে নিয়েছে সে। এ-ও যেন শ্লোক রচনার মতোই একটি আরব্ধ কার্য। কখনো কখনো যেমন শ্লোকের প্রথম অক্ষরটি লিখতে অনেকটা সময় কেটে যায়। আবার প্রাথমিক জড়তা কেটে যাবার পরে যেমন মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ের পথ বেয়ে লেখনীতে নেমে আসতে থাকে অবিরল শব্দ-শ্লোকের ধারা, এখানেও তেমনই ঘটছে। প্রাথমিক জড়তার পরে শত্রনিধনে মেতে উঠেছে পপীপ। মাতৃভূমির মুক্তিকাব্য রচনা করে চলেছে অস্ত্র হাতে। চিৎকার-আর্তনাদে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। আশপাশের দশগাঁয়ের কোনো গাছে কোনো পাখি বোধহয় তিষ্টাতে পারছে না কোনো গাছের ডালে। ভয় পেয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে দূরে ভীতিহীন আশ্রয়ের আশায়। এখানে মানুষ মরছে, আহত হচ্ছে, আর্তনাদ করছে, গালাগালি করছে, ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে হয়তো নিজেরই সতীর্থ যোদ্ধার আহত শরীরে বা মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে, আবার উঠছে, ফিরেও দেখছে না কার শরীরের সাথে পা বেধে হোঁচট খেয়েছিল সে। প্রত্যেকের শরীর রক্তে মাখামাখি। কারো শরীর নিজের রক্তে। কারো শরীর অন্যের রক্তে। কিন্তু এই উন্মাদনা-উন্মত্ততার মধ্যেও পপীপ খেয়াল না করে পারে না যে, যে সে যেখানেই যাচ্ছে, তাকে ছায়ার মতো ঘিরে রাখছে চারজন সুদক্ষ কৈবর্তযোদ্ধা। পপীপের শরীরে যাতে কোনো আঘাত না লাগে, সেদিকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে যে আর্যসৈন্যের দিকে তেড়ে যাচ্ছে, তারাও অন্যদের ফেলে সেই শত্রুকেই ঘায়েল করতে সহযোগিতা করছে পপীপকে। এ নিশ্চয়ই ভীমের ব্যবস্থা। কবিকে যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে হারাতে না হয়, তার জন্য বাড়তি সতর্কতা নিয়েই রেখেছে সে। মনে মনে আপ্লুত না হয়ে পারে না পপীপ। বুকটা ফুলে ওঠে আনন্দে। তাকে এত মূল্যবান মনে করে ভীম এবং তার স্বজাতির মানুষরা!

সকালের সূর্য কখন যে মাথার ওপর উঠে এসেছে, এবং তারপরে সূর্য ডোবার দিকে অনেকখানিই এগিয়ে গেছে কেউ লক্ষই করেনি। লক্ষ করার কথাও নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যে এসে গেছে, তা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। মুখোমুখি যুদ্ধে কৈবর্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ক্রমশ। রামপালের সৈন্যদের ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সূর্যের অস্তহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারালো ফলার মতো রৌদ্রবর্ষণ তাদের জলতৃষ্ণা আর বাড়তি ক্লান্তির কারণ। অন্যদিকে এই সূর্যের নিচেই মাঠে-ঘাটে শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত কৈবর্তদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই রৌদ্রের প্রখরতায়। তাছাড়া ভাড়া করা সৈন্যদের চাইতে যারা নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে, তাদের মনোবল একটু হলেও বেশি থাকবেই। এই বাড়তি মনোবলই কৈবর্তদের অস্ত্রের স্বল্পতা পুষিয়ে দিয়ে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিচ্ছে আজকের যুদ্ধে। কিন্তু রামপালের সেনাপতিরা অনেক বেশি ধূরন্ধর। তারা বুঝে ফেলেছে, পদাতিক সৈন্যদের দিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধে হাড়ানো কঠিন হবে কৈবর্তযোদ্ধাদের। কাহ্নুর দেব এবার কৌশল পরিবর্তন করে। নিজেদের সৈন্যসংখ্যা কমার কোনো লক্ষণ দেখলেই সে বাড়তি সৈন্য পাঠাচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। এবার আর কোনো পদাতিক না পাঠিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাতে থাকে সে। অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছুটে আসছে। ভীম তার এক পার্শ্বচরকে বলে চিৎকার করে– ভল্লকে বলো তার বাহিনী আনতে। ছুট লাগাও ঝমঝম!

কিন্তু ভল্লকে সংবাদ বা আদেশ পাঠানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আগে থেকেই যে পরিকল্পনা করা ছিল তা ভল্লকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। সে এতক্ষণ নিজেদের শিবিরের পেছনের টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করছিল নিবিড় মনোযোগের সাথে। রামপালের অশ্বারোহী যোদ্ধাদের এগিয়ে আসতে দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল আর্যসৈন্যরা। এবার কী হবে অসুর কৈবর্তদের! অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হবে ওরা কেমন করে? ওদের অশ্ব রয়েছে বড়জোর দুই কুড়ি বা তিন কুড়ি। তা দিয়ে সহস্র অশ্বারোহীর মুখোমুখি হতে গেলে উড়ে যাবে ওরা তৃণবৎ। নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনীকে কাছে আসতে দেখে উদ্যম বেড়ে যায় রামপালের সৈন্যদের। তারা নিশ্চিত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে এবার। রামপালের তাঁবুতে রামপাল, মথন দেব, কাহ্নুর দেবরাও এখন সেই একই স্বপ্ন দেখছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে মেঘ-গর্জনের শব্দ ওঠে কৈবর্ত-শিবির থেকে। বিশাল কালো মেঘের একটি দঙ্গল ছুটে আসছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। গাঁক গাঁক শব্দে ছুটে আসা কালো মেঘের দলটিকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে হা হয়ে যায় প্রত্যেকের মুখ। মহিষ! মহিষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসছে কৈবর্তরা! এ-ও কি সম্ভব? পৃথিবীর কোনো যুদ্ধবিশারদ কি কোনোদিন কল্পনাও করতে পেরেছে যে মহিষারোহী বাহিনী তৈরি করে যুদ্ধ সম্ভব? আজ ভীমের নেতৃত্বে সেটাই করে দেখাচ্ছে কৈবর্তরা। আরেকটু কাছে আসতেই দেখা যায় প্রত্যেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিষের পিঠে বল্লম বা তরবারি হাতে বসে আছে কৈবর্তযোদ্ধা। কোনো লাগান বা সাজসজ্জা নেই মহিষের। পিঠের ওপর বসে থাকা মানুষগুলো ধরে থাকবে এমন কোনো দড়ি পর্যন্ত নেই। কিন্তু তারা মহিষের পিঠে বসে আছে এমন অনায়াস ভঙ্গিতে যেন তারা বসে আছে কোনো আরামদায়ক পত্রোর্ণদুকূলের (মিহি কাপড়) বিছানো আসনে। অশ্বের গতিবেগ মহিষের চাইতে অনেক বেশি হতে পারে। কিন্তু মহিষের একরোখা শক্তি কোথায় পাবে অশ্ব!

হতচকিত আর্যসৈন্যদের একেবারে গায়ের ওপর উঠে পড়ে ভল্লর মহিষারোহী বাহিনী। মহিষের বিশাল শরীরের ধাক্কায় ছিটকে পড়তে থাকে মানুষ, ঘোড়া। তাদের চোখা শিং-এর সঙ্গে বিঁধে আকাশে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে দেখা যায় অনেক আর্যসৈন্যকে। হা রে রে রে... । খুশিতে আকাশমুখো আনন্দের চিৎকার ছুঁড়ে দিচ্ছে কৈবর্তযোদ্ধারা। আবার মেতে উঠছে শত্রুসংহারে। মনে হচ্ছে আজ তারা অজেয়। রক্তের নেশা সঞ্চালিত হয়ে গেছে যেন তাদের অস্ত্রেও। আসুক! রামপালের সব পদাতিক, সব অশ্বারোহী, সব ধনুর্ধর আসুক! আসুক তার হস্তিবাহিনী! আসুক কাহ্নুর দেব! আসুক রামপাল নিজেও! আজ কেউ রক্ষা পাবে না কৈবর্তযোদ্ধাদের বিক্রম থেকে।

কিন্তু হঠাৎ সূর্যটা আকাশের এক কোণে গা ঢাকা দিয়ে ফেলায় তেমে গেল প্রত্যেকের হাতের অস্ত্র। সূর্য ডুবে গেছে। আজ আর যুদ্ধ হবে না। হতাশ হয়ে আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেদের শিবিরের দিকে ফিরে চলে ভীম আর তার কৈবর্তযোদ্ধার দল।

২৫. অন্ধকারের শেষলিপি

নিজেদের অনেক সহযোদ্ধাকে হারিয়েছে তারা আজকের যুদ্ধে। আহতের সংখ্যাও অনেক। তবু আজ কৈবর্তশিবিরে আনন্দের রাত। আজকের যুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় হয়েছে তাদের। আজ তারা প্রত্যেকেই বুঝে গেছে, রামপাল আর তার সঙ্গী আঠারো মহাসামন্তের অযুত সৈন্য মুখোমুখি যুদ্ধে কোনোদিনও পরাজিত করতে পারবে না কৈবর্তদের। নিজের সাথীদের আহত-নিহত হওয়াতে মনে বড় কষ্ট পেয়েছে ভীম। প্রত্যেক সাথীর মৃত্যুকে মনে হয়েছে নিজের সত্তারই একটি অংশের মৃত্যু। কিন্তু তাই বলে নিজেদের যোদ্ধার সংখ্যা কমে যাওয়ায় একটুও হতাশ নয় ভীম। বার বার প্রমাণিত হয়েছে, সংখ্যার চাইতে বীরত্ব এবং ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করার অনুভূতি যাদের রয়েছে, যুদ্ধে জয় হয় তাদেরই। তাছাড়া নিহত যোদ্ধাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা প্রাচীরকে পাহারা দিচ্ছে রাজবংশী যোদ্ধারা। তারা কাল প্রভাতেই এসে যোগ দেবে যুদ্ধে।

নিজের তাঁবুতে প্রদীপ নিভতে দেয়নি পপীপ। সারাদিনের যুদ্ধে সে ক্লান্ত। কিন্তু তাই বলে শ্লোক রচনার কাজটি ফেলে রাখতে সম্মত নয় কিছুতেই। বরং সারাদিনের যুদ্ধক্লান্তি তার তুচ্ছ হয়ে গেছে ভীম এবং তার সাথীদের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা নিজের চোখে দেখতে পারার সৌভাগ্যে। তার লেখনির মুখ থেকে শ্লোক ঝরছে অবিরল। লিখতে লিখতেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে ওঠে পপীপের। সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা মনে হয়। মহাকবি নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে আসেননি। এলে দেখতে পেতেন, যাদের তিনি রাক্ষস, অসুর, বয়াংসী বলে তুচ্ছ করে কাব্য লিখেছেন, সেই কৈবর্তরা আজ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের এক মহাকাব্য রচনা করেছে। মনে মনে কুরমিকে স্মরণ করে সে। তোমার কবি জয় নিয়ে ফিরে যাবে তোমার কাছে।

চারদিকে নিশুতি। অল্প কয়েকজন প্রহরী ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। পপীপের ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু কাল প্রত্যুষেই তো আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। কিছুটা ঘুমিয়ে না নিলে দেহ পরিপূর্ণ সতেজতা ফিরে পাবে না। আর যুদ্ধক্ষেত্রে সতেজ শরীরের যে কী মূল্য, আজকের যুদ্ধে তা বুঝতে পেরেছে সে।

ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে ফেলে পপীপ। নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দেয় শক্ত বিছানাতে। কুরমির মুখ ভাবতে ভাবতে অপেক্ষা করে ঘুমের।

হঠাৎ-ই ঘুম ভেঙে যায়।

চোখ বন্ধ রেখেও পপীপ টের পায় হঠাৎ করেই বাইরের অন্ধকার রাত আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে পপীপ। বুঝতে পারে না কী ঘটেছে। সে কি গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল? টেরই পায়নি কখন সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপর? কিন্তু তাহলে তো এতক্ষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। আর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে ডাকবে না– এমনটি তো হতেই পারে না। এরপর কানে আসতে থাকে প্রচণ্ড মরণচিৎকার, ক্রুদ্ধ হাঁক-ডাক, ঘোড়ার মুহুর্মুহু হ্রেসারব আর খুরের শব্দ।

চোখ ডলতে ডলতে তাঁবুর বাইরে এসে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে মুহূর্তে মৃত্যুযন্ত্রণার মতো কষ্টে আক্রান্ত হয় পপীপ। যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব পাশ জুড়ে ভূমিপুত্রযোদ্ধাদের শিবির স্থাপন করা হয়েছে অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে। ভীমের ইচ্ছা, সকালে যুদ্ধ শুরুর সময় তার বাহিনী অর্ধচন্দ্রাকৃতিব্যূহ রচনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত্রুকে প্রতিরোধ করবে। প্রত্যুষে ব্যূহ রচনায় সুবিধা হবে মনে করে এভাবেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতির শিবিরের দুই অগ্রবর্তী সূচিমুখের তাঁবুগুলি ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁবুগুলিতে। ঘুমের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মরছে ভূমিপুত্রসেনারা। যারা বিহ্বল ঘুমমাখা চোখে বেরিয়ে আসছে তাঁবু থেকে, তাদের মুণ্ড মুহূর্তে ধর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে রামপালের সৈন্যরা।

এমন বীভৎস দৃশ্য দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে পপীপ। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে ভীমের কথা। ভীমকে এই সংবাদ জানানো প্রয়োজন। ভীমের তাঁবুর দিকে ছুটে যায় সে। দেখতে পায় ভীম তার তাঁবুর বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। ক্রোধে জ্বলছে দুই চোখ। আবার নিজের সাথীদের এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে ক্ষণে ক্ষণে বেদনায় সজল হয়েও উঠছে সেই দুই চোখের পাতা। সেই অশ্রুজলেও আগুনের আভা। চিৎকার করে যেন নিজেকেই নিজের কথা শোনাচ্ছে ভীম– হায় আমি কী বোকা! আমাকে পিতৃব্য দিব্যোক আর পিতা রুদোক বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, সাপ-হায়েনা আর পালরাজা-অমাত্যদের বিশ্বাস করতে নেই। আমি সেই কথা মনে রাখিনি। বীরের ধর্ম পালন করে ন্যায়যুদ্ধ করবে রামপাল এমনটাই আশা করেছিলাম। হায় আমি শৃগালের কাছে সততা প্রত্যাশা করেছিলাম!

পপীপ কাছে গিয়ে দেখতে পায় মল্ল এবং উগ্র এসে দাঁড়িয়েছে ভীমের পাশে। তারা ইতোমধ্যেই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পেরেছে। তারা চিৎকার করে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুমন্ত সৈন্যদের ডেকে তুলছে। হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বলছে। পপীপ সামনে তাকিয়ে দেখতে পায়, ভীমকে লক্ষ করে ছুটে আসছে রামপালের কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। তাদের সামনের সারির লোকদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সেই মশালের আলো পড়েছে তাদের চোখে-মুখে। মনে হচ্ছে মানুষ নয়, হাজার হাজার পিশাচ ছুটে আসছে ভীমের দিকে। কয়েক সহস্র অশ্বারোহীর পেছনে ছুটে আসছে আরও কয়েক সহস্র পদাতিক। তারা আসছে ভীমকে সহচরসহ পৃথিবী থেকে নির্মূল করার উন্মত্ত বাসনা নিয়ে। মল্ল দেখতে পায়, আগুয়ান অশ্বারোহীদের একেবারে মাঝখানে রয়েছে কাহ্নুর দেব। সেই-ই তাহলে এই মধ্যরাত্রির বর্বর-কাপুরুষোচিত আক্রমণের হোতা। মল্ল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যুদ্ধে হার-জিত যাই হোক ঐ বর্বর নরপিশাচকে যমালয়ে না পাঠিয়ে আমি মরব না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীমের দুই পাশে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েকশত ভূমিপুত্রযোদ্ধা। ভীম চিৎকার করে বলে– বল্লম তুলে নাও হাতে সবাই। স্থির নিষ্কম্প হাতে বল্লম ধরে লক্ষ্য স্থির করো ছুটে আসা ঘোড়াগুলোর সামনের দুই পায়ের মাঝখানে ঠিক হৃৎপিণ্ডের সোজাসুজি।

অযুত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে পারছে ভীমের মাত্র কয়েকশত যোদ্ধা। পপীপ সর্বশক্তিতে হাতে বল্লম ধরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে ছুটে আসা অশ্বারোহীর দিকে। ঘোড়াগুলো ছুটে আসছে। ওরা কেউ-ই প্রতিরোধ আশা করছে না। যেভাবে দুই পার্শ্বব্যূহের ঘুমে অচেতন ভূমিপুত্রযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে, সেই একইভাবে ভীম এবং তার সহচরদেরও হত্যা করা যাবে ভেবে তারা নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে। পপীপ একদৃষ্টিতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে তার দিকে ছুটে আসা ঘোড়াটির সামনের দুই পায়ের মাঝখানের বুকের দিকে। কোনো পড়ন্ত ফল যেভাবে চাকুর ডগায় গেঁথে যায়, ঠিক সেইভাবে তার বল্লমের ডগায় এসে বুক পেতে দেয় ঘোড়াটি। পপীপকে কিছুই করতে হয় না। ঘোড়াটি নিজেই যেন নিজের বুকে গেঁথে নেয় বল্লমের ফলা। তারপরেই যেন নরক ভেঙে পড়ে পপীপদের চারপাশে।

তার প্রায় গায়ের উপরেই পড়েছে ঘোড়াটি। অশ্বারোহী ছিঠকে পড়েছে শক্তমাটিতে। মট করে একটা শব্দ হয়। বোধহয় ঘাড় ভেঙে গেছে লোকটার। তার দিকে তাকিয়ে আর সময় নষ্ট করে না পপীপ। তরবারি হাতে মুখোমুখি হয় কাছে এসে পড়া পদাতিক সৈন্যটির। লোকটা ছুটে আসছে নিজের অস্ত্র বাগিয়ে। পপীপও সাঁৎ করে এগিয়ে একেবারে কাছে ভিড়ে যায় লোকটার। এত দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালন করবে পপীপ তা ভাবতে পারেনি লোকটা। তার বুকের ডানপাশটিকে একেবারে অরক্ষিত পেয়ে যায় পপীপ। নির্দ্বিধায় হাতের তরবারি আমূল ঢুকিয়ে দেয় লোকটার ডানবুকের মধ্যে। তারপর আর সচেতনভাবে কিছু করার কথা মনে থাকে না পপীপের। খাগের লেখনির কথা ভুলে গিয়ে অস্ত্রহাতে শত্রুনিধনে মত্ত হয়ে পড়ে কবি।

মল্ল তার খড়্গ চালাচ্ছে এমন তীব্র শক্তির সাথে যে যার সাথেই সংঘর্ষ ঘটছে সেই খড়্গের, সেখান থেকেই ছুটছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। চারজন-পাঁচজন করে শত্রুসৈন্য একসাথে ঘিরে ধরছে তাকে। কিন্তু মল্ল যেন আজ অজেয়। চারজন শত্রুকে মেরে ফেলতে তার যেন চারটি নিমেষেরও প্রয়োজন হচ্ছে না। তার সমস্ত শরীর শত্রুসৈন্যের রক্তে রঞ্জিত। তাকে দেখে মনে হচ্ছে মহাকাল রক্ত মেখে নেমে এসেছে এই যুদ্ধক্ষেত্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উগ্র সবসময় চেষ্টা করছে ভীমের পাশে থাকতে। চেষ্টা করছে নিজের দেহকে ভীমের বর্মরূপে ব্যবহার করতে। শত্রুর অস্ত্র যাতে ভীমের শরীরকে স্পর্শ করতে না পারে, সেইজন্য একহাতে তরবারি, আরেকহাতে বর্ম নিয়ে ঠেকিয়ে চলেছে শত্রুসৈন্যদের। কিন্তু ভীমের যেন কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দুইহাতে দুই তরবারি চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি পড়লে যেমন শব্দ হয়, ভীমের তরবারির আঘাতে শত্রুসৈন্যের মুণ্ড মাটিতে গড়িয়ে পড়ে সেই রকম শব্দ হচ্ছে।

মল্ল হঠাৎ ছুটে আসে পপীপের কাছে। পপীপ তখন যুদ্ধ করছে বিশালদেহী এক আর্যসৈন্যের সাথে। মল্ল চরম অবহেলায় একবার তার হাতের খড়্গ উপর-নিচ করে। বিশালদেহী লোকটা যেন দুই টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মল্ল হ্যাঁচকা টানে পপীপকে সরিয়ে নিয়ে আসে একটা তাঁবুর আড়ালে। সেখান থেকে কাহ্নুর দেবকে দেখিয়ে বলে– ঐ দ্যাখ! ঐ যে শত শত দেহরক্ষীর মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু ঘোড়ায় চেপে সৈন্যদের পরিচালনা করছে যে লোকটা, সে হচ্ছে কাহ্নুর দেব। বীরের ধর্ম ভুলে আমাদেরকে ঘুমের মধ্যে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ঐ শুয়োর-সন্তানের। কেননা সেই-ই হচ্ছে রামপালের প্রধান সেনাপতি। আমি যাচ্ছি কাহ্নুরকে নরকে পাঠাতে। তুই এখানে না থেকে ভীমের কাছাকাছি চলে যা। আর বেশিক্ষণ যুদ্ধ চলবে না। বুঝতেই পারছিস, বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানোর মতো যোদ্ধা আমাদের বেঁচে নেই। ঘুমের মধ্যেই প্রায় সকলকে হত্যা করেছে নরপশুর দল। তুই ভীমের পাশে থাকিস। অন্তত তুই বেঁচে থাকতে যেন ভীমের গায়ে কোনো অস্ত্র আঘাত না করতে পারে!

কথা শেষ করেই কাহ্নুর দেবকে লক্ষ করে ছোটে মল্ল। পপীপ ভীমের কাছে যাওয়ার কথা ভুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এক অলৌকিক যোদ্ধাকে। খড়্গ এখন পিঠের সাথে ঝুলিয়ে নিয়েছে মল্ল। তার দুই হাতে দুইটি ছোট আকারের তরবারি। সে এঁকেবেঁকে ছুটছে কাহ্নুর দেবের ঘোড়া লক্ষ করে। প্রথমে এভাবে তার ছুটে যাওয়াকে লক্ষই করেনি শত্রুপক্ষের কেউ। কিন্তু অনেক কাছে চলে যাওয়ার পরে কাহ্নুর দেবকে বেষ্টন করে রাখা দেহরক্ষীদলের চারজনের দৃষ্টি পড়েছে মল্লর উপর। তারাও তীব্রগতিতে ছুটে আসা মল্লর মনোভাব বুঝতে পারেনি। ইতস্তত করছে কী করবে। আবার এত এত সৈন্যের প্রতিরোধ ভেদ করে লোকটা কীভাবে এতদূর এল ভেবে পাচ্ছে না তারা। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবনার অবকাশ যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। সেই ভুলেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো তাদের জীবন দিয়ে। তারা মল্লকে থামানোর উদ্যোগ করার আগেই ঝলসে ওঠে মল্লর দুই হাতের তরবারি। মুহূর্তে ধরাশায়ী হয় তারা। আর মল্ল পেয়ে যায় কাহ্নর দেবের কাছে পৌঁছে যাওয়ার খোলা পথ। কাহ্নর দেব হাতে একটি তরবারি ধরে রেখেছে বটে, কিন্তু এটিকে তার ব্যবহার করতে হবে এমনটি একবারও ভাবেনি। হঠাৎ মল্ল তার সামনে যমদূতের মতো উপস্থিত হয়ে পড়ায় সে এতই অবাক হয়ে যায় যে তার নিজের হাতে যে অস্ত্র আছে, সেটি তার মনেই থাকে না। মল্ল তার দিকে তাকিয়ে বীভৎস একটা হাসি হাসে। তারপর সাঁই করে একহাতের তরবারি চালায় কাহ্নর দেবের পেট লক্ষ করে। পেট ফুটো হয়ে ঢুকে যায় তরবারি, আর কাহ্নর দেব ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মল্ল বলে– কাপুরুষ! রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গীদের হত্যা করেছিস তুই। ভেবেছিস পার পেয়ে যাবি! যদি আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোর পরিবারকে পেতাম তাহলে নরকে পাঠাতাম সবাইকে। আজ তুই একাই যা নরকে!

কথা শেষ হতে না হতেই মল্লর তরবারি পুরোপুরি ঢুকে যায় কাহ্নর দেবের বুকে। তাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় গলাকাটা মুরগির মতো ঝটপটাতে দেখে খুশিতে অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছা করে মল্লর। সে হাসার জন্য ঠোঁট ফাঁকও করতে যায়। কিন্তু চারপাশ থেকে ইতোমধ্যে তার বুকে-পেটে ঢুকে পড়েছে কয়েকটি ধারালো অস্ত্রের ফলা। মুহূর্তে তীক্ষ্ণ-তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে মল্লর সমস্ত স্নায়ু বেয়ে। সে উবু হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। তার দেহের ওপর তখনো উপর্যুপরি অস্ত্রাঘাত করা হচ্ছে। কিন্তু সেসবের আঘাতে আর কোনো কষ্টই টের পাচ্ছে না মল্ল। কারণ তার মনে হচ্ছে ঊর্ণাবতী মাটিতে বসে নরম কোমল কোলের উপর তুলে নিয়েছে তার মাথাটি।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অসম যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভীম এবং ভীমের পক্ষের কোনো যোদ্ধা আর বেঁচে নেই। ভীম, উগ্র আর পপীপের দেহে এত তীর বিঁধেছে যে তাদের মাটিতে পড়ে থাকা দেহকে তিনটি বিশাল সজারু বলে মনে হচ্ছে।

বিজয়ী রামপাল যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে এসেছে প্রিয় হাতি বাদল-এর পিঠে চড়ে। মাহুত তাকে নিয়ে এসেছে ভীমের ভূতলশায়ী দেহের কাছে। ভীমের মৃতদেহ নিজ চোখে দেখার আগে পূর্ণ বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না রামপাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীমের শরবিদ্ধ দেহের পাশে এসে বাদলকে দাঁড় করায় মাহুত। রামপাল নামে না হাতির পিঠ থেকে। একজন সৈন্যকে আদেশ করে ভীমের উবু হয়ে পড়ে থাকা দেহটিকে চিৎ করে দিতে। সৈন্যটি রাজার আদেশ পালন করে। রামপাল আদেশ করে, ভীমের একেবারে মুখের কাছে মশাল নিয়ে যেতে। যাতে সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় ভীমের মৃতমুখ। সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারে নিজের দুই চক্ষুর।

মশাল আনা হয়। রামপাল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ভীমের মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হয়, মশালের তীব্র আলোয় একবার নড়ে উঠেছে ভীমের চোখের পাতা। অবিশ্বাসে দুই চোখ বড় বড় হয়ে যায় রামপাল এবং তার সঙ্গীদের। তারা ভালো করে নিশ্চিত হতে চায়, যা দেখেছে তা তাদের চোখের ভুল। তাই তারা আরও কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু না! তাদের চোখ ভুল দেখেনি। কারণ এবার আস্তে আস্তে পুরোপুরি খুলে যায় ভীমের দুই চোখের পাতা। রামপাল আশ্চর্য হয়ে বলে– তুই এখনো মরিসনি! এখনো বেঁচে আছিস!

ভীমের মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো আশ্চর্য সুন্দর হাসি। তারপরেই সেই মুখে ফুটে ওঠে তীব্র ঘৃণা। খুব কষ্টে ঠোঁট নাড়াতে পারে ভীম। রামপালের দিকে তাকিয়ে বলে– তুই বলেছিলি না যে তুই অর্জুনের বংশধর?

বিহ্বল রামপালের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উত্তরটা বেরিয়ে আসে– হ্যাঁ বলেছিলাম।

ঠিকই বলেছিলি। তুই আসলেই অর্জুনের বংশধর।

একথার পিঠে কী বলবে বুঝে পায় না রামপাল। ভীম আবার বলে– অর্জুন আসলে কে জানিস?

পাণ্ডুর পুত্র।

না। অনেক কষ্ট হলেও মাথা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে অস্বীকৃতি জানায় ভীম– অর্জুন আসলে পাণ্ডুর বীর্যে জন্ম নেয়নি। তার মা কুন্তি নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, অর্জুনের জন্ম হয়েছিল ইন্দ্রের বীর্যে। অর্জুন আসলে জারজ সন্তান।

একথার কী উত্তর দেবে রামপাল! সে কাঁপতে থাকে ক্রোধে। ভীম সেই রকম কষ্ট করেই বলতে থাকে– জারজ অর্জুনের বংশধর তুই। তোদের জন্মের ঠিক নেই। তাই তোদের মুখের কথারও কোনো ঠিক নেই। তুই আসলেই অর্জুনের বংশধর। এই কথাটা জানানোর জন্যই এখনো বেঁচে রয়েছি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রোধে কাঁপছে রামপাল– না। তুই এখনো বেঁচে আছিস আমার হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নরকে যাবি বলে!

মাহুতকে ইঙ্গিত করতেই সে পরিচালনা করে বাদলকে। হাতিকে বহুবার এই কাজে ব্যবহার করেছে রামপাল। পায়ের নিচে কোনো মানবশরীরকে থেঁতলে যেতে দেখলে রামপালের মতো তার হাতিও আনন্দিত হয়। মাহুতের ইঙ্গিতমাত্র বাদলের বিশাল পায়ের নিচে থেঁতলে যায় ভীমের শরীর।

ক্রোধে তখনো কাঁপছে রামপালের সমস্ত শরীর। মন এমন এক তিক্ততায় পরিপূর্ণ, যে তিক্ততা এর আগে কোনোদিন অনুভব করেনি সে। মনে হচ্ছে যুদ্ধে সে জয়ী হতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তাকে হারিয়ে দিয়েছে ভীম। সেই অতিরিক্ত ক্রোধ আরও বিষ উগড়ে দেয় তার মুখ থেকে। সে নির্দেশ দেয়– ভীম বা কোনো কৈবর্তযোদ্ধার মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না! ওগুলো এখানেই পড়ে থাকবে শৃগাল-কুকুর-শকুনের খাদ্য হবার জন্য।

২৬. অশেষ পর্বের সূচনা

সেই প্রতারণাপূর্ণ যুদ্ধের রাতের পরের সারাটি দিনও কেটে গেছে। এখন পরবর্তী রাত্রি নেমে এসেছে। রামপালের প্রহরীরা কাউকে ঘেঁষতে দেয়নি মৃতদেহগুলোর কাছে। প্রহরীদের নিজেদেরও অস্বস্তি হচ্ছে। মৃতদেহগুলোতে পচন শুরু হয়েছে। দুর্গন্ধে তিষ্টানো দায়। গন্ধ ভুলবার জন্য তারা আরও বেশি বেশি করে সোমরস পান করতে থাকে।

হঠাৎ মনে হয় একটি মশালের শিখা এগিয়ে আসছে এদিকে। প্রহরীরা চোখ কচলায়। তারা ভুল দেখছে না তো! তারপরে দেখা যায়, একটির পেছনে একটি– এইভাবে শত শত মশালের শিখা এগিয়ে আসছে এই দিকেই। একেবারে কাছে এসে পড়ায় প্রহরী বাধা দিতে এগিয়ে যায়– সাবধান! আর এগিয়ো না! রাজার নিষেধ আছে।

কিন্তু মশালগুলো নিষ্কম্পভাবেই এগিয়ে আসতে থাকে। প্রহরীরা এবার কোষমুক্ত করে অস্ত্র– আর এগিয়ো না বলছি! তোমরা যেই হও, ফিরে যাও!

কিন্তু মশালের এগিয়ে আসা বন্ধ হয় না। আগুয়ান মানুষগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে স্তম্ভিত প্রহরীরা দেখতে পায় মশাল নিয়ে এগিয়ে আসছে একের পর এক নারী। সকলের সামনে হেঁটে আসছে যে নারী, সে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নরলোকের কোনো অধিবাসিনী নাকি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে এখানে! এত রূপবতী কোনো নারীকে তো কোনোদিন চোখে দেখেনি প্রহরীরা। তাদের অস্ত্রধরা হাত স্থানু হয়ে যায়। তারা সেই বিষাদের প্রতিমূর্তি অপরূপা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারী প্রহরীদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। পেছনে শত শত নারীকে নিয়ে বধ্যভূমিতে প্রবেশ করে মশাল হাতে। তারা প্রতিটি ভূমিপুত্রের মৃতদেহের কাছে যায়, আর বিলাপের সুর তোলে আকাশে-বাতাসে। প্রহরীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সচকিত হয়ে দেখদে পায় রামপালের নিষেধাজ্ঞার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে চারদিক থেকে মানুষ আসছে ভূমিপুত্রদের এই বধ্যভূমির দিকে।

আসছে নারী।

আসছে বৃদ্ধ।

আসছে প্রৌঢ়।

আসছে শিশু।

তারা বিলাপ করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এগিয়ে আসছে।

প্রহরীরা এমন পরিস্থিতিতে পড়ে সম্পূর্ণ হতবাক। তারা জানে না এখন তাদের কী করা উচিত। তাই কিছুই না করে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। আর আসতে দেখে বিলাপরত মানুষের মিছিল।

আসছে কৈবর্ত নারী-পুরুষ।

আসছে ভিল নারী-পুরুষ।

আসছে রাজবংশী নারী-পুরুষ।

আসছে শবর নারী-পুরুষ।

এমনকি আসছে আর্যবংশীয় শত শত নারী-পুরুষও।

তারা বিলাপ করে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে। কিন্তু সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কান্নাভেজা বিলাপ ধীরে ধীরে একটি অন্য সমন্বিত ভাষায় রূপ নিতে থাকে। সেই ভাষা কৈবর্ত বুঝতে পারছে। ভিল-শবর-রাজবংশীরাও বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে হিন্দু ধর্মীরাও, যারা এখন আর আর্য বলে নিজেদের পৃথক করে রাখে না। যারা মনে করে শত শত বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষ আর্যাবর্ত থেকে এসেছিলেন বটে; কিন্তু এখন আর্যাবর্ত তাদের অনেক অনেক অতীত জীবনের স্মৃতি। তারা মনে করে এই গৌড়-বরেন্দ্রী-পুণ্ড্রবর্ধনই তাদের পিতৃভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং মাতৃভূমি। তাদের ভাগ্য এই মাটির ভূমিপুত্রদের ভাগ্যের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। তারা সবাই অনায়াসে বুঝতে পারে এই নতুন সমন্বয়ের ভাষা। কিন্তু কেউ জানে না এই ভাষার নাম কী!

তারা জানবে অবশ্য আরও অনেক অনেক বছর পরে। যখন কবি ভুসুকু আর্তনাদ করবে 'আজি ভুসুকু বাঙালি ভইলা' বলে। তখন সবাই জানবে এই ভাষার নাম বাংলাভাষা।

আর্তনাদ এবং বিলাপমুখর নারী-পুরুষ তাদের প্রিয়জনদের সৎকারের জন্য চিতা সাজায়। হাজার হাজার বীরকে তোলা হয় অভিন্ন চিতায়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সেই চিতা। সেই প্রায় অলৌকিক বিশাল চিতা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ঊর্ধ্বপানে উঠছে তো উঠছেই। উঠতে উঠতে একসময় বোধহয় সেই ধোঁয়া হিমালয়ের চাইতেও উঁচুতে উঠে এক জায়গায় কুণ্ডলি পাকাতে থাকে। কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে ধোঁয়া রূপ নেয় মুষ্টিবদ্ধ একটি হাতের, যে হাত আরও উঁচুতে উঠে চলেছে। মুষ্টিবদ্ধ সেই হাতের ঊর্ধ্বারোহণের যেন কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আকাশের সীমা কে দেখেছে কবে! এই হাত কী তবে আজ আকাশ অতিক্রম করবে! সেই মুষ্টিবদ্ধ হাত এতই উঁচুতে ওঠে যে তাকে দেখা যায় আর্যাবর্ত থেকে, তামিল থেকে, সাগরপারের সিন্ধু-গান্ধার থেকে। সেই ধোঁয়ার ভাস্কর্য পৃথিবীকে জানাচ্ছে– আবার আমি আসব! হাজার বছর পরে হলেও আসব! এই জাতির মুক্তি হয়ে ফিরে আসব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~